চিরঞ্জীব সেন

সাহিত্য প্রকা
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৩৮

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি
প্রচ্ছদ : প্রদোষ কান্তি বর্মণ
মুদ্রাকর : প্রফুল্লকুমার বক্সী, জয়দুর্গা প্রেস, ৫/১, রাজা
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Roll Corner
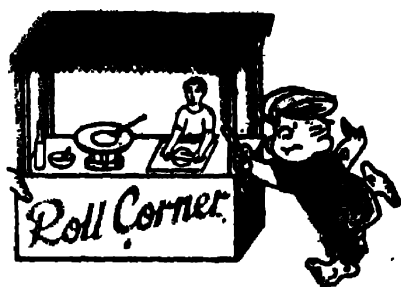
খবরটা এখনও চাপা আছে। এদেশে এবং বিদেশে কোনো পত্রিকাতে ছাপা হয় নি বা ছাপতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভারতে অবস্থিত কয়েকটি বিদেশী দূতাবাস খবরটি টের পেয়েছে। তারা কেউ কেউ দিল্লিতে প্রতিরক্ষা দফতরে খোঁজ নিয়েছে, ভারত কি কোনো নতুন অস্ত্র বানিয়েছে নাকি ?

ভারত সরকারের জবাব তারা বিশ্বাস করে নি কারণ বিস্ফোরণটা তো ঘটানো হয়েছে ভারতরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপে। প্রতিরক্ষা দফতর অবশ্যই বলেছে যে তারা এ বিষয়ে কিছু জানে না। অজ্ঞাত কোনো চক্র এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ভারত সরকার তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিদেশীরা যদি ভারতের এই অনুসন্ধান কাজে সাহায্য করে তাহলে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্বয়ং রামদাস শেঠীর ওপর চাপ দিচ্ছেন, বলছেন অবস্থা খুবই জরুরী, অবিলম্বে কিছু করতেই হবে। সি বি আই প্রতিরক্ষা দফতরের সব রকম সাহায্য পাবে। কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে অবিলম্বে তা জানতে হবে কারণ দেশের সামনে প্রচণ্ড এক সংকট উপস্থিত।

রামদাস শেঠী জিজ্ঞাসা করেন অবস্থা এত জরুরী কেন ? কি সংকট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আশংকা করছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন যে ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রিডম ফাইটারস বা সংক্ষেপে 'ইফ' নামে একটি দল ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

চিঠি পাঠিয়েছে ? ডাকে ? না দূত মারফত ? কি চিঠি ?

আরে সেটাও একটা রহস্য। চিঠিখানা যে রাষ্ট্রপতি ভবনে কে কখন দিয়ে গেল কেউ বলতে পারছে না। লাল রঙের খামের ওপরে সাদা কালি দিয়ে রাষ্ট্রপতির নাম লেখা। চিঠির কাগজখানাও লাল। খামের ও চিঠির কাগজ ভারতে তৈরি নয়, বিদেশী কাগজ।

চিঠিখানা কোথায় পাওয়া গেল ? শেঠী জিজ্ঞাসা করেন।

রাষ্ট্রপতি পরিবারের সকলকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করছেন। বাবুর্চি ট্রে করে রাষ্ট্রপতির জন্যে কি একটা খাবার এনে টেবিলে রেখে ট্রে তুলে নিতেই দেখা গেল টেবিলের ওপর একখানা লাল খাম পড়ে রয়েছে।

সকলে অবাক। বাবুর্চিও অবাক। সে কিছুই জানে না। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাকে জেরা করেছেন। সে কিছু বলতে পারছে না। তবে লোকটি বৃদ্ধ এবং বিশ্বাসযোগ্য। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

চিঠিতে কি লেখা আছে? আমাকে দয়া করে বলবেন? শেঠী অনুরোধ করেন।

বলার কি আছে? চিঠিখানা তুমি পড়েই দেখ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চিঠিখানা রামদাস শেঠীর হাতে তুলে দিলেন।

রামদাস চিঠি পড়ল। 'ইফ' চক্র বৃথা ভয় দেখায় নি। ওরা পাগলও নয়, ওরা যে ভয় দেখিয়েছে তা যে ওরা কার্যকর করতে পারে তার প্রমাণ তো সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডে দেখিয়ে দিয়েছে অতএব তাদের যেন অবিশ্বাস না করা হয়।

'ইফ' চক্র লিখেছে যে তারা আপাততঃ দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনটি বোমা রেখেছে যেগুলি তারা দূর থেকে বিশেষ মাপের বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে বোমাগুলি ফাটাতে পারে। সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডে তারাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

তারা একটা নির্দিষ্ট তারিখ দিয়েছে। সেই তারিখের মধ্যে যেন বিশাখাপত্তনম বন্দরের বিশেষ একটি জায়গায় চারটি প্যাকিংকেসে ভরে মোট এক টন সোনা রেখে দেওয়া হয়।

বিশাখাপত্তনমে ঐ দিন রাত্রি দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত কার্ফু জারি করতে হবে। ইফ-এর লোক ঐ সোনা উঠিয়ে আনবে কিন্তু কোনোও রকম ভাবে বাধা দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা বন্দর উড়িয়ে দেবে।

পরিশিষ্টে তারা লিখেছে কয়েকটি দেশ ও জাতি এখনও নির্যাতিত। তাদের মুক্তি দেবার জন্যে ওরা অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তুলছে। প্রাপ্ত অর্থ থেকে ওরা অ্যাটম বোমা ও নিউক্লিয়র রকেট তৈরি করবে এবং যে বোমা তারা উদ্ভাবন করেছে সেই বোমা তারা আরও তৈরি করবে।

ভারতে কৃতকার্য হবার পর ওরা যাবে আমেরিকায়। এইভাবে অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলে অস্ত্র নির্মাণ করে ওরা পৃথিবীর দলিত, নিপীড়িত ও শোষিত জাতি ও দেশগুলি মুক্ত করবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এদের উদ্দেশ্য হয়তো সৎ কিন্তু সেজন্য কি অন্য কোনো উপায় ছিল না? যাইহোক একটন সোনা দেবার মতো ক্ষমতা এখন ভারতের নেই। 'ইফ' চক্র এখনি খুঁজে বার করা দরকার।

রামদাস শেঠী গুরুত্ব বুঝলেন কিন্তু কোথায় তিনি কাজ আরম্ভ করবেন? সেইদিন সন্ধ্যা ছটায় আকাশবাণীর সংবাদে শুনলেন যে দক্ষিণ প্রশান্তসাগরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারণ কিছু জানা যায় নি।

রামদাস শেঠী বুঝল এ নিশ্চয় 'ইফ' চক্রের কাজ। কিন্তু তিনি কি করবেন কিছুই তো বুঝতে পারছেন না।

রাত্রে শুতে যাবার সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ক্যাপ্টেন জগদীশ চৌধুরীর কথা। জগদীশ একদা মিলিটারিতে ইনটেলিজেন্স অফিসার ছিল। এ বিষয়ে সে বিদেশে ট্রেনিং নিয়েছে। নানা বিদ্যায় জগদীশ পারদর্শী। ছোরা পিস্তল চালাতে যেমন দক্ষ তেমনি বকসিং ও ক্যারাটেতেও।

এছাড়া সাংকেতিক ভাষায় বার্তা প্রেরণ করতে ও গুপ্তচরদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিও সে জানে। কয়েকটি ভাষা জানে, মোটরগাড়ি ও প্লেন চালাতেও শিখেছে।

লম্বা চওড়া সুপুরুষ চেহারা জগদীশের, সর্বত্র সে জনপ্রিয়। কিন্তু সেই করিৎকর্মা ক্যাপটেন এখন কোথায়?

রাত্রি তখন এগারোটা। রামদাস তাঁর একান্ত সচিবকে ফোন করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জগদীশকে তো দিল্লিতে দেখছি না, সে কোথায় ?

সচিব বলল, ক্যাপটেন জগদীশ তো স্যার ছুটি নিয়ে জব্বলপুরে তাঁর দাদার কাছে গেছেন ?

ঠিকানা রেখে গেছে ?

হ্যাঁ স্যার, দাদার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর রেখে গেছেন।

বেশ, টেলিফোন নম্বরটা আমাকে বল

সে তো স্যার আমার কাছে নেই, অফিসে আছে

তাহলে তুমি অফিসে যেয়ে ফোন নম্বরটা বার করে আমাকে জানিয়ে দাও, আমি অপেক্ষা করছি, দিস ইজ ভেরি আর্জেণ্ট।

এত রাত্রে স্যার ক্যাপটেন চৌধুরীকে ঘুম থেকে তুলবেন ?

বললুম ব্যাপারটা খুবই জরুরী, জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত তুমি আর দেরি কোরো না, বল তো আমি তোমার অফিসে যেতে পারি ?

না স্যার আপনাকে আসতে হবে না, আমি এখনি যাচ্ছি।

জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে জগদীশ চৌধুরীর আর্মি অফিসার দাদার কোয়ার্টারে যখন ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল তখন রাত্রি দেড়টা। দাদা ফোন ধরে যখন ভাইকে ডেকে দিলেন তখনই ভাই বলল—

বুঝেছি আমাকে বোধহয় কাল সকালেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।

ফোন যখন দিল্লি থেকে তখন জগদীশ বুঝতেই পেরেছিল আর ডি ছাড়া আর কেউ ফোন করছে না, তাই সে ফোন ধরেই বলল

বলুন মিঃ শেঠী, আমি কাল সকালের আগে এখান থেকে স্টার্ট করতে পারব না, বেলা ন'টার আগে এখান থেকে প্লেন পাওয়া যাবে না, ব্যাপারটা কি স্যার ?

টেলিফোনে বলতে পারব না। ঠিক আছে তুমি কাল ফার্স্ট-

ফ্লাইট মিস কোরো না। তোমার দাদাকে বিরক্ত করলুম, আমার হয়ে তুমি মাপ চেয়ে নিয়ো।

রামদাস শেঠী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গেলেন। যাক জগদীশকে পাওয়া গেছে। এই বিপদ থেকে যদি কেউ দেশকে বাঁচাতে পারে তো জগদীশ।

রামদাস শেঠীও দক্ষ অফিসার। তাঁর নামটা অবশ্য পুরনো ধরণের কিন্তু মনে প্রাণে কাজে কর্মে তিনি অত্যন্ত আধুনিক। বিদেশে লেখাপড়া শিখেছেন। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। দেশী-বিদেশী অনেকগুলো ভাষা জানেন। পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। তাঁর নিজের বিভাগের কাজকর্ম তাঁর নখদর্পণে।

বয়স প্রায় ষাট হলো কিন্তু প্রতিদিন ভোরে তিনি সঙ্গে তাঁর বক্সার কুকুরটি নিয়ে এখনও চার মাইল হাঁটেন। নিয়মনিষ্ঠ, ঘড়ি ধরে কাজ করেন। নেশার মধ্যে কেবল চা ও কফি।

পরদিন সকালে জগদীশ যথাসময়ে দিল্লি পৌঁছল। সফদরজং এরোড্রোমে তার জন্যে আর ডি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

জগদীশ আর ডি-এর অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আর ডি বললেন, জগদীশ সামনে ভীষণ বিপদ। বোসো, কিছু খাবে?

না, আমি এয়ারপোর্ট কাফেটারিয়াতে খেয়ে এসেছি।

বেশ তাহলে ঘটনাটা শোনো, বলে রামদাস শেঠী সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডে বিস্ফোরণের ঘটনা ও লাল চিঠির কথা বললেন।

রামদাস শেঠী যখন জগদীশকে সেন্টিনেল আইল্যাণ্ড সংক্রান্ত ঘটনা বলছিলেন ঠিক সেই সময়ে সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে ঠিক ইকোয়েটরের ওপরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কাছে একটি জাহাজ থামল।

জাহাজটি বড় নয়, লম্বা ধরণের, অ্যাটমিক শক্তিতে চলে, খুব দ্রুতগামী। জাহাজে এমন কোনো পতাকা নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে জাহাজটি কোন দেশের। যে পতাকাটি উড়ছে তার

এক দিকের রং লাল, অপর দিকের রং কালো। তবে জাহাজের গায়ে একটা নাম লেখা আছে, 'রেড ড্রাগন'।

জাহাজটির উচ্চতাও বেশি নয়, জলরেখা থেকে বড়জোর তিরিশ ফুট। প্রশস্ত ডেক রং ধবধবে সাদা। এই জাহাজটিকে কোনো বন্দরে ভিড়তে দেখা যায় নি। তবে এমন একখানা জাহাজ যে সমুদ্রে ভাসছে তা অনেক জাহাজের নাবিকরা দেখেছে এবং বেশ কয়েকটি বন্দরে নাবিক মহলে জাহাজটি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

দ্বীপটি নারকেল গাছে ভর্তি। কিছু রবার ও সেগুন গাছও আছে। এই দ্বীপের একটি কুখ্যাতি আছে। দ্বীপের জঙ্গলে বড় বড় পাইথন সাপ ও প্রচুর সংখ্যায় বাঘ আছে। কিছু মানুষ বাস করে তবে তারা দ্বীপের ভেতরে যায় না। নারকেল গাছ আশ্রয় করে তারা বেঁচে আছে।

জাহাজটি থামার পর জাহাজ থেকে একটি নৌকো নামানো হলো। দু'জন লোক নৌকোয় উঠলো। একজনের হাতে একটি স্যুটকেস, অপরজনের হাতে একটি লাইট মেশিন গান।

নৌকোটি দ্বীপের গায়ে ভিড়তে ওরা নৌকো থেকে নামল তারপর নৌকো বেঁধে রেখে ওরা দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করল।

জাহাজের ডেক থেকে একজন লোক চোখে দূরবীন লাগিয়ে ওদের দিকে নজর রাখছে।

প্রায় দু ঘণ্টা পরে ওরা ফিরে এল। ফিরে আসার পর দেখা গেল লোকটির হাতে স্যুটকেসটি নেই। স্যুটকেসটি সে দ্বীপে কোথাও রেখে এসেছে। দুজনে আবার নৌকোয় উঠে জাহাজে ফিরে এল। নৌকোটি জাহাজে তোলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল।

জাহাজটি দ্বীপ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সেই লোকটি কিন্তু চোখ থেকে দূরবীণটি নামায় নি। তার পাশে এসে আর একজন দাঁড়াল এবং ওদের দুজনের পিছনে একজন পায়চারি করতে লাগল।

যার চোখে দূরবীণ তার নাম জিরো। কোন দেশের লোক বোঝা যায় না। মোটা গাবদা গোবদা চেহারা, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, মস্ত বড় মাথা, যেন একটা ভালুক।

তার পাশে এসে যে দাঁড়াল সে লম্বা, দোহারা গড়ন। মুখটাও লম্বা, মাথায় টাক। এ লোকটিও যে কোনো দেশের হতে পারে। নাম জুডাস।

তৃতীয় ব্যক্তি যে পায়চারি করছে তার মাথার চুল ধবধবে সাদা, খাড়া নাক, উজ্জ্বল চোখ। দোহারা গড়ন। লোকটি বিজ্ঞানী, নাম ডক্টর ম্যামলক। ইনি ইংরেজ, জার্মান বা ফরাসি হতে পারেন।

এই তিনজন কোন দেশের মানুষ জানা না গেলেও মনে হয় ওরা ইউরোপেরই মানুষ। জিরো ও জুডাস রুশ হতে পারে তবে ঐ নাম ওদের আসল নাম নয়। ডঃ ম্যামলকও আসল নাম নয়। সবই ছদ্মনাম।

চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে জিরো বলল, জুডাস আর দেরি করে লাভ কি? আমরা তো আইল্যাণ্ডটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি?

জুডাস বলল, হ্যাঁ, দেরি করে লাভ কি?

জিরো তখন ডঃ ম্যামলকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, ডক্টর তুমি কি বল?

ম্যামলক বলল, আমি তো রেডি, বলতে কি কুড়ি মিনিট আগেই আমি রেডি, তোমরা অর্ডার দিলেই হয়।

জুডাস বলল, আমরা অযথা তাড়াহুড়ো করতে চাইনি, এই পেপে, পেপে, শোন।

ইউনিফর্ম পরা একটি ছোকরা দূরে কিছু ঝাড়পোঁছ করছিল, হাতের ঝাড়ন সরিয়ে রেখে সে ছুটে এসে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে বলল ঃ

ইয়েস স্যার?

তুমি ক্যাপটেনকে বলে এস জাহাজ কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে, বিস্ফোরণ হলে আমরা কয়েকটা ফটো তুলব।

কিন্তু স্যার দ্বীপের লোকগুলো সরে যাবার সময় পাবে তো ? পেপে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

কি যে বল পেপে, বড় কাজের জন্যে এবং বৃহদাংশের মঙ্গলের জন্যে কিছু অসভ্য মানুষের প্রাণহানি হলে কিছু যায় আসে না। তুমি যাও, দেরি কোরো না, জুডাস বলল।

পেপে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের গতি কমতে আরম্ভ করল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ থেমে গেল।

জিরোর পায়ের কাছে তার পোষা কুকুর দুটো ঘুর ঘুর করছিল, একটা জার্মান শেফার্ড আর অপরটা ডোবারম্যান পিনসার। জিরো কুকুর দুটোকে এমন ট্রেনিং দিয়েছে যে সে একটি বিশেষ আওয়াজ করলেই কুকুর দুটি যে কোনো ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি কেটে দেবে।

জিরো কুকুর দুটোকে আদর করতে লাগল। ম্যামলক বিরক্ত হয়ে বলল, কি তুমি কুকুর আদর করবে না আমাকে অর্ডার দেবে ?

আই অ্যাম সরি ডক্টর, তুমি তোমার কাজ কর, তবে এইটে তৃতীয় এবং আপাততঃ আমাদের লাস্ট এক্সপেরিমেণ্ট।

ম্যামলকের হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল। ম্যামলক জিপ খুলে ঢাকা সরিয়ে লম্বা মতো একটা যন্ত্র বার করল। যন্ত্রটার পাশে একটা নব ছিল, নখ দিয়ে নবটা সরিয়ে দিতেই একটা চৌকো কাঁচের নিচে ডিস্টাল পদ্ধতি কতকগুলো লাল বিন্দু জ্বলতে নিবতে লাগল।

ম্যামলক একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পরে বাকি দু'জনকে বলল, এই হল আমার ইলেকট্রনিক স্টাইলাস, এ আমার সঙ্গে কথা বলে। তোমরা বললেই আমি ট্রিগার টিপব।

জুডাস কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে গুনতে আরম্ভ করল, নাইন, এইট, সেভেন—টু-ওয়ান !

এক সেকেণ্ড পরেই ম্যামলক তার ট্রিগার টিপে ধরল। কিছুই ঘটলো না। জিরো আওয়ারের তিরিশ সেকেণ্ড বাকি। তিরিশ সেকেণ্ড পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বীপে বোমা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা দ্বীপটা জ্বলে উঠল।

জিরো বলল, গুড ম্যামলক, গুড ওয়ার্ক।

জুডাস বলল, আমাদের ম্যামলক কিন্তু ওস্তাদ লোক। কেমন একটা বোমা বানিয়েছে দেখ, একটা স্যুটকেস ; খুললেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না, আরে স্যুটকেসটাই তো বোমা ! কোনো কাস্টমস অফিসারের সাধ্য নেই যে সন্দেহ করতে পারে, বলিহারি ম্যামলক !

রামদাস শেঠীকে জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, কোনো সূত্র কিংবা কোনো নাম কি কোনো সংকেত ? আমরা কোথায় আরম্ভ করব ?

আজ সকালে অফিসে আসবার আগেই আমি এই লাল চিঠি ও খাম আমাদের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম। তারা চিঠিখানা আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নিচে ফেলে মাত্র তিনটি নাম উদ্ধার করতে পেরেছে, জুডাস, জিরো এবং ম্যামলক। চিঠি যেখানে শেষ হয়েছে তার নিচে খুব ছোট অক্ষরে নাম তিনটে লেখা আছে, স্বাক্ষর নয়, টাইপ করাও নয়, ছাপা অক্ষর।

এরা কারা বলে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন ? তিনটে নামই তো ছদ্মনাম বলে মনে হচ্ছে।

আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে প্রথম দুটো নাম সম্বন্ধে আমার কাছে কিছু তথ্য আছে। প্রায় দু বছর আগে রাশিয়ান এমব্যাসির ইনফরমেশন ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন সোভিয়েট সরকার য়ুরি নোজেংকোকে পলিটব্যুরো থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার সোভিয়েট বিরোধী নীতির জন্যে। লোকটি বিপজ্জনক। পরদিনই সে মসকো

তথা সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অদৃশ্য। যাবার সময় সে রেড আর্মির কর্ণেল গরস্কিকে নিয়ে গেছে।

তারপর ?

ইনফরমেশন অফিসার আমাকে সতর্ক করে বলেন যে ঐ দু'জন লোক ভারতে প্রবেশ করে স্যাবোটাজ করতে পারে। তারা অবশ্যি ভারতে এসেছিল কিনা বলতে পারি না তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে ঐ দু'জন লোকই হলো জুডাস ও জিরো এবং ওরাই ঐ চিঠি লিখেছে ও সেন্টিনেল দ্বীপে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

আর ম্যামলক ?

তার বিষয় কিছু জানি না, কাউকে জুটিয়ে নিয়েছে। এই হলো পরিস্থিতি, কি যে করব আমি বুঝতে পারছি না, এখন তোমার ওপর ভরসা জগদীশ।

জগদীশ বলল, কিন্তু আর ডি কিছু একটা সূত্র তো চাই, কিন্তু ওরা টাকাপয়সা পাচ্ছে কোথায় ?

তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, রাশিয়ার ইনফরমেশন অফিসার আমাকে বলেছিলেন যে ওরা দু'জন আগেই নাকি কিভাবে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা হস্তগত করেছিল কিভাবে তারা সেই সোনা পাচার করেছিল তা তারা বলে নি।

তাহলে আর ডি আমার কাজ হবে এই তিনজনকে থামান অথচ আপাততঃ আমরা অন্ধকার ঘরে সোনামুখী ছুঁচ খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটা কিছু সূত্র তো চাই।

হ্যাঁ, একটা সূত্র তোমাকে দিতে পারি, আজই সকালে আমি একটা টেলিফোন পেয়েছি। বম্বেতে তারাপুর অ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যান্টে আমাদের একজন এজেন্ট আছে। সে কেরাণীর কাজ করে কিন্তু তার আসল কাজ হল কর্মীদের ওপর নজর রাখা। ওর নাম মেরি ডিসুজা, গোয়ার মেয়ে, এক সময়ে ভাল সাঁতারু ছিল, জাতীয় প্রতিযোগিতায় অনেক মেডেল পেয়েছে, ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার

কাটতে গিয়েছিল কিন্তু তিন মাইল বাকি থাকতে তার পায়ে এমন খিল ধরে যে তাকে জল থেকে তুলে নিতে হয়।

তারপর কি বলুন আর ডি, মেরি আপনাকে ফোনে কি বলল ?

মেরি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ শেঠী সেন্টিলেন আইল্যাণ্ডে একটা প্রচণ্ড এক্সপ্লোশন হয়েছে সে বিষয়ে আপনি কি কিছু জানেন ? আমি বললুম, জানি কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

মেরি বলল, আমি একটা কাজে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারে গিয়েছিলুম, সেখানে বাগানে হু'জন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, তা মিঃ শেঠী এই বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারি। কিন্তু মেরি আমাকে বলে সে টেলিফোনে কিছু বলতে পারবে না। সে আরও বলল যে ঐ বিজ্ঞানী হু'জনকেও সে কিছু বলে নি।

তাহলে মেরি ডিসুজা হলো আমাদের একমাত্র সূত্র, তার কাছে আমাকে যেতে হবে, জগদীশ বলে।

নিশ্চয়, তুমি তাহলে তৈরি হয়ে কাল সকালেই চলে যাও, কারণ ওরা আমাদের মাত্র দশ দিন সময় দিয়েছে তার মধ্যে বিশাখা-পত্তনমে সোনা পৌঁছে না দিলে ওরা প্রথমে কলকাতা উড়িয়ে দেবে বলেছে। রাষ্ট্রপতি আমাকে বলেছে এক টন সোনা দেবার প্রশ্ন ওঠে না কারণ সোনা আমাদের নেই।

জগদীশ বলল, বিপদ তো আমাদের একার নয়, যে কোনো দেশে এই বিপদ আসতে পারে। ভারত সরকার 'ইফ' চক্রের চিঠির নকল রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রমুখ দেশকে পাঠিয়ে দেবে, আজই মন্ত্রীসভার বৈঠক বসবে।

তাহলে আমি এখন উঠি।

বেশ এই কাগজগুলো তোমার কাছে রাখ, এই লাল চিঠি সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে, মেরির ঠিকানা আছে এবং আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, তুমি যাবার আগে আমাদের সূর্যনারায়ণের সঙ্গে একবার দেখা করে যাও, সে তোমাকে একটা বিশেষ ধরণের বেল্ট এবং একটা

মুখোশ দেবে, সেগুলো তোমার কাজে লাগতে পারে। কয়েকটা গুলি দেবে, সেই গুলি যদি মাটিতে ফেলতে পার তাহলে সেগুলি ফেটে যে গ্যাস বেরোবে সে গ্যাস উপস্থিত লোকেদের বেহুঁশ করে দেবে কিন্তু তুমি ঐ মুখোশটা মুখে লাগিয়ে নিলে তোমার কিছু হবে না।

মুখোশ মানে গ্যাস মাস্ক ?

না, রুমালের মতো, মুখে ফেললে ওটা মুখে আটকে যাবে আর বেল্ট থেকে নাকি গুলি বেরোবে বিশেষ একটি জায়গায় চাপ দিলে।

ধন্যবাদ, বেশ আমি সূর্যনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি, আমি বাড়িতেই থাকব, ইতিমধ্যে আমাকে আপনার দরকার হলে ফোন করবেন।

তাই করব।

মেরি ডিসুজা বেশ চৌকশ মেয়ে, পড়াশোনা আছে, দুনিয়ার নানা খবর রাখে। এখন তার বয়স বোধহয় তিরিশ হবে বা তার কাছাকাছি কিন্তু এখনও বেশ স্লিম ফিগার, এককালে ভাল অ্যাথলিট এবং সাঁতারু ছিল তা তার নড়াচড়া চলাফেরা দেখেই বোঝা যায়।

জগদীশ সঙ্গে এনেছিল আর ডি-এর চিঠি এছাড়া ওর নিজের আইডেনটিটি কার্ড ওকে মেরির কাছে চিনিয়ে দিল। মেরি এবার মুখ খুলল কিন্তু তার আগে জগদীশকে একটু বাজিয়ে নিল।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চের বাগানে দু'জন বিজ্ঞানী কি আলোচনা করছিল ? যা তুমি টেলিফোনে বল নি ?

ওরা বিশেষ কিছু আলোচনা করে নি। ওরা আলোচনা করছিল যে সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অ্যাটমিক বিস্ফোরক নয়, কয়েকটা দাঁতভাঙা রসায়ণের নাম করছিলেন।

তুমি সেই বিজ্ঞানী দু'জনকে চেনো ?

না, আমি চিনি না তবে দেখলে চিনতে পারব। আমি তো

ওখানে চাকরি করি না, অফিসের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে যেতে হয় তবে যে কথাটা আর ডি-কে বলি নি সেটা হল এই যে আমাদের অরাপুর প্ল্যান্টে একটা মেসিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই মেসিন মেরামত করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে একজন কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার আনানো হয়েছিল, তার নাম ডক্টর মরিস এম লক।

কি নাম বললে ?

মরিস এম লক, কেন ?

পরে বলছি।

লকের গিটার বাজাবার শখ ছিল। রোজ সন্ধ্যার সময় সে তার ঘরের বারান্দায় বসে গিটার বাজাত। আমারও গিটারের খুব শখ, বাজাতেও পারি, মেরামত করতে পারি। এই সূত্রেই আমার সঙ্গে লকের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন সে আমাকে একটা ক্লাবে নিয়ে যায়, সেখানে আমরা যখন ড্রিংক করছিলুম তখন সে আমাকে বলে যে সে নাকি দারুণ একটা প্লাস্টিক বোমা তৈরি করেছে, তার প্রচণ্ড শক্তি অথচ বোমাটা দেখলে একটা স্যুটকেস বলে মনে হবে, অবশ্য ইচ্ছে করলে অন্য আকারও দেওয়া যায়। বোমাটার আর একটা সুবিধে এই যে দূর থেকে বিশেষ মাপের বেতার তরঙ্গের সাহায্যে বোমাটা ফাটানো যায়। লক আমাকে আরও বলে তার এই আবিষ্কারের বিষয় সে তার সরকারকে বলে নি, বলে কি হবে ? তারা তো ফরমূলা জেনে নিয়ে তাকে বন্দী করে রাখবে তার চেয়ে ওটা অন্য দেশকে বেচে দেবে। লকের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, দু'দিন পরে সে ইংলণ্ডে ফিরে যায়। সেন্টিনেল আইল্যাণ্ডে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে আমার মনে হয় সেটা ঐ লক আবিষ্কৃত বোমা।

জগদীশ বলল, আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা তুমি ঐ মরিস লকের কোনো খবর রাখ ?

না, কেন ? সে কোথায় আমি জানি না।

তাহলে শোনো। জগদীশ তখন সেন্টিনেল দ্বীপে বিস্ফোরণ ও

লাল খামে লাল চিঠির কথা বলে যে তিনটে নাম পাওয়া গিয়েছে সে তিনটে নাম বলল।

মেরি বলল, তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে মরিস এম লকই হলো ঐ ডক্টর ম্যামলক ?

আমার তাই বিশ্বাস, সে নিশ্চয় দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ঐ বোমার ফরমুলা জিরো ও জুডাসদের 'ইফ' চক্রকে বিক্রি করেছে এবং তাদের দলে ভিড়েছে, তোমার এখানে এত মোটর-সাইকেলে করে যাওয়া-আসা করছে কারা ?

মেরি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বলল, তিনজন মোটর-সাইক্লিস্টকে দেখছি, একটা গাড়িতে দু'জন আর একটাতে একজন, মোট তিনজন।

ওদের কখনও তুমি এ পাড়ায় দেখ নি ? জগদীশ উৎকণ্ঠিত। সে বলে, তুমি কাল রামদাস শেঠীকে ফোন করেছিলে, নিশ্চয় কেউ লাইনে আড়ি পেতেছিল। আমার বিশ্বাস ওদের পরবর্তী টার্গেট বম্বে, সেজন্যে ওরা এখানে গুপ্তচর পাঠিয়েছে। ওরা ট্যুরিস্ট সেজে মোটর সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার ভাল মনে হচ্ছে না। আমি তোমাকে এখানে একা রেখে যেতে পারি না, তুমি আমার সঙ্গে এখনি চল।

কোথায় যাব ?

লোনাভালায় সি বি আই-এর একটা বাংলো আছে। আমরা সেখানে যাব। বাইরে একটা গাড়ি দেখছিলুম, ওটা কি তোমার ?

আমার ঠিক নয়, দাদার, দাদা চাকরি নিয়ে কুয়েত চলে গেছে, আমার কাছে গাড়িটা রেখে গেছে, আমি চালাই, মাঝে মাঝে ভাড়া খাটাই।

জগদীশ বলে, গুড, তোমার কিছু জিনিস গুছিয়ে নাও, আমরা এখনি রওনা দেব, সন্ধ্যার সময় পৌঁছে যাব।

মেরি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নেয়। জগদীশ তার মেসিন পিস্তলটা

পরীক্ষা করে নেয়, এছাড়া ওর সঙ্গে আরও একটা লুগার পিস্তল ও ছোরা আছে, সেগুলো সব ঠিকঠাক করে রাখে।

মেরি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আসে।

গাড়িতে উঠে জগদীশ মেরিকে বলে তুমি গাড়ি চালাও, আমি পিছনের সিটে বসব, পিস্তল চালাতে পার ?

পারি বই কি, মেরি বলে—

তাহলে এটা কাছে রাখ, মোটর-সাইক্লিস্টরা কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, আমাদের ঠিক ফলো করবে। তুমি যে দিল্লিতে মিঃ শেঠীকে ফোন করেছ তা ওরা আড়ি পেতে ঠিক জেনে নিয়েছে এবং আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ওপর নজর রাখছে, আমার পরিচয়ও ওরা নিশ্চয় সংগ্রহ করেছে। জুডাস আর জিরো দুটো লোকই যেমন পাজী তেমনি বুদ্ধিতে তুখোড়।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী···

মিঃ চৌধুরী নয়, জগদীশ—

বেশ জগদীশ আমরা যে যাচ্ছি তা ওরা তো আমাদের রাস্তায় অ্যাটাক করতে পারে ?

পারে নয় করবেই, আমিও রেডি, ওদের সঙ্গে আছে হয়তো রিভলভার, কিন্তু আমার মেসিন পিস্তলের রেঞ্জ অনেক বেশি। আমি 'অফেন্স ইজ দি বেস্ট ফর্ম অফ ডিফেন্স' এই নীতিতে বিশ্বাস করি, নাও এখন চল, জোরে গাড়ি চালাবে।

জগদীশের অনুমানই ঠিক। এক মাইল যেতে না যেতেই পিছনে ভট্‌ ভট্‌ আওয়াজ শোনা গেল।

জগদীশ বলল, মেরি গাড়ির স্পিড কমাও, তিরিশ মাইল।

মেরি গাড়ির স্পিড কমালো। জগদীশ গাড়ির পিছনে দেখল দুটো কালো রঙের মোটর সাইকেল, বোধহয় 'বুলেট'। যে গাড়িতে দু'জন সেই গাড়ির পিলিয়নের লোকটির হাতে একটা রিভলভার কিন্তু এখনও ওরা যে দূরত্বে রয়েছে সেখান থেকে গুলি এসে গাড়িতে পৌঁছবে না।

মেরি আর একটু স্পিড কমাও। মেরি আর একটু স্পিড কমালো এবং অনুসরণকারীরা স্পিড বাড়ালো। জগদীশ আর অপেক্ষা করল না। তার মেসিন পিস্তল খুব জোরালো, রেঞ্জও অনেকখানি। জগদীশ গুলি চালাল। পরপর তিনটে। অব্যর্থ লক্ষ্য। তিনটে লোকই পড়ল।

মেরি গাড়ির স্পিড বাড়াও, তিনটে মরেছে কিনা জানি না তবে ঘায়েল হয়েছে, তিনজনে তিনদিকে ছিটকে পড়েছে।

মেরি গাড়ির স্পিড বাড়াবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখে নিল তারপর বলল, তুমি দেখছি ক্র্যাক শট।

মেরি গাড়ির স্পিড বাড়ালো।

লোনাভালায় পৌঁছে জগদীশ বলল, ক্ষিধে পেয়েছে, চল কিছু খাওয়া যাক।

একটা রেস্তরাঁয় খাওয়া সেরে ওরা সি বি আই বাংলোয় এল। একজন চৌকিদার ছিল। সে জগদীশকে চিনত কারণ জগদীশ আগেও এখানে কয়েকবার এসেছে।

ঘরে ঢুকে জগদীশ প্রথমে দেখল টেলিফোন ঠিক আছে কি না।

জগদীশ প্রথমে টেলিফোন করল বম্বের সি বি আই হেড কোয়ার্টারে। লোনাভালার পথে দুটো মোটর সাইকেল আর তিনটে বডি পড়ে থাকতে পারে, তার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

জগদীশ পরে জানতে পেরেছিল সেখানে কোনো মোটর সাইকেল বা বডি পুলিশ পায় নি তবে রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ এবং অন্য কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা গিয়েছিল যে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সি বি আই-এর টেলিফোনগুলোতে আড়ি পাতা যায় না, সেজন্যে বিশেষ যন্ত্র বসানো আছে।

জগদীশ এবার ফোন করল, দিল্লিতে রামদাস শেঠীকে এবং কি ঘটেছে তার একটা রিপোর্ট দিল।

জগদীশ বলল, তাহলে লাল চিঠি পাঠিয়ে ওরা আমাদের ধাপ্পা দেয় নি, দে মিন বিজনেস।

আর ডি-কে জগদীশ মরিস. ম্যামলকের কথাটাও বলল। আর ডি-ও সন্দেহ করলেন এই লোকই ম্যামলক। আর ডি বললেন ঃ

তুমি মেরিকে নিয়ে কাল সকালে দিল্লি চলে এস, এখানে কাজ আছে। সম্ভবতঃ একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, তুমি এলে বলব।

পরদিন কিন্তু মর্ণিং ফ্লাইটে ওদের দিল্লি যাওয়া সম্ভব হল না কারণ মেরি বলল ছুটির ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাকে একবার অফিসে যেতেই হবে কারণ তার কাছে চাবি আছে এবং একখানা চার্ট তার বসকে দিয়ে আসতে হবে।

জগদীশ আবার দিল্লিকে টেলিফোনে জানিয়ে দিল। ওরা মর্ণিং ফ্লাইটে যেতে পারছে না, চেষ্টা করছে বিকেলে পৌঁছতে। রামদাস তখন অফিসে ছিল না। অবশ্য আর ডি অফিসে ফিরে মেসেজ ঠিক পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যার একটু আগে জগদীশ ও মেরি দিল্লি পৌঁছল। সফদরজং-এ নেমেই জগদীশ আর ডি-কে ফোন. করে দিল ওরা এখান থেকেই অফিসে যাচ্ছে।

অফিসে পৌঁছতেই রামদাস শেঠী জগদীশকে বলল, তুমি যখন লোনাভালায় ছিলে তখন বম্বে পোর্টে একটা লোক ধরা পড়েছে। লোকটা বালার্ড পিয়ারে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরা ফেরা করছিল কিন্তু সে আমাদের সিকিউরিটি গার্ডদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। আমরা তো ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ার সমস্ত পোর্ট ও এয়ারপোর্টকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি তাই এরা প্রথমে আমাদের বেতার বার্তা পাঠায়। আমরা তৎক্ষণাৎ বলি ওকে পাঠিয়ে দাও।

ইতিমধ্যে একটা ফোন এসে গেল। ফোনে কথা বলে আর ডি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, লোকটাকে কালই দিল্লি আনা হয়েছে, ওর নাম যোসেফ পেরেজ, ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, ওর হাতে একটা স্যুটকেস ছিল বললেন না ?

হ্যাঁ, প্লাস্টিকের স্যুটকেস, ইতিমধ্যে মেরি ডিসুজা মরিস লকের যে স্যুটকেস বোমার কথা তোমাকে বলেছিল তা তো আমরা শুনেছি তখন আমাদের সন্দেহ হলো লোকটার যে প্লাস্টিকের স্যুটকেসটা রয়েছে সেটা বোমা হতে পারে, বোমাটা বম্বেতে কোথাও রাখবার জন্যে যোসেফকে ওরা বম্বে পাঠিয়েছিল। যাইহোক আমরা যোসেফকে আটকে রেখে স্যুটকেসটা এক্সপার্টদের হাতে দিলুম।

জগদীশ বাধা দিয়ে বলল, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে যে বোমাগুলো ওরা বন্দর শহরে রাখবে এবং জাহাজ থেকে রিমোট কণ্ট্রোলের সাহায্যে বোমা পাঠাবে। দিল্লি আর চণ্ডীগড়ে ওরা বোমা রাখে নি, এরপর ওরা বোমা রাখবে কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনমে যদি না ইতিমধ্যে আমরা ওদের ধরে ফেলি, এবার বলুন আপনি কি বলছিলেন।

তোমার অনুমান ঠিক হতে পারে, হ্যাঁ তারপর আমাদের এক্সপার্টরা স্যুটকেসের ভেতরে প্রথমেই একটা মাইক্রো-ইলেকট্রিক ডিটোনেটর দেখতে পায় এবং সেটা বার করে নিয়েছে কিন্তু ভেতরে বিস্ফোরক পদার্থ কি আছে বা তা কি করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে তা এখনও তারা খুঁজে পায় নি তবে এখনও তারা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, যোসেফ পেরেজ কিছু বলেছে ?

বিশেষ কিছু বলে নি, বোধহয় বেশি কিছু জানেও না, তুমি তার সঙ্গে কথা বলতে পার, দাঁড়াও তাকে এখানে আনাচ্ছি।

রামদাস শেঠী একটা বোতাম টিপে ইন্টারকমে কাউকে বললেন,

যোসেফ পেরেজকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

এক মিনিট পরে দু'জন গোর্খা দু'দিক দিয়ে দু'হাত ধরে যোসেফ পেরেজকে নিয়ে এল।

গোর্খাদের রামদাস বলল, ওকে ছেড়ে দাও, তোমরা যাও, ডাকলে আবার আসবে। যোসেফ পেরেজ ঐ চেয়ারটায় বোসো, এই নাও সিগারেট খাও।

জগদীশ ওকে সিগারেট ও দেশলাই দিল। যোসেফ সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ সে ভীষণ গম্ভীর হয়েছিল, এখন মুখের রেখাগুলো একটু কোমল হলো।

জগদীশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ঐ জাহাজে মানে 'রেড ড্রাগন' জাহাজের একজন সেলর তাই না?

হ্যাঁ, আমি একজন সামান্য সেলর।

তুমি হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে বম্বেতে কি করে এলে আর ওখানে ঘোরা ফেরা করছিলে কেন? তোমার জাহাজ তো বম্বেতে আসে নি।

না আসে নি, জাহাজখানা ইণ্ডিয়া কোস্ট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে থাকতে আমাকে একটা অ্যারেবিয়ান ঢাউতে তুলে দেওয়া হয়, আমি তাইতে চেপে বম্বে এসেছি। জাহাজে বস্ আমাকে বলল স্যুটকেসটা বম্বে বন্দরে একটা কোনো লুকনো জায়গায় রেখে দিতে। আমি লুকনো জায়গা খোঁজবার সময় ধরা পড়ে গেলুম।

তোমার বসের নাম কি?

নাম জানি না।

দেখতে কেমন?

তাকে দেখতে একটা ভালুকের মতো, আর একজন ছোট বস্ আছে, সে কিন্তু বড় বস্ অপেক্ষা মাথায় লম্বা।

ওদের দু'জনের নাম কি জিরো এবং জুডাস?

হতে পারে আমি জানি না।

তুমি আবার জাহাজে ফিরে যেতে কি করে?

জাহাজটা বম্বে বন্দরে আসবে তার আগে গোয়া বন্দরে আসবে কিন্তু নাম পালটে আসছে, নতুন নাম 'গ্রেট বেয়ার', ওরা বলবে গ্রেট

বেরার একটা ট্যুরিস্ট কাম প্লেজার শিপ, গোয়া থেকে স্টার্ট করে বম্বে, কলম্বো, সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবে। অনুমতি পেলে ব্যাংকক এবং সায়গন পর্যন্ত যাবে এবং তারপর আবার গোয়া ফিরে আসবে।

তুমি তো বললে ঐ জাহাজের একজন সেলর, জাহাজটা কি নতুন না পুরনো? কিসে চলে? ডিজেলে না স্টিমে?

জাহাজ খানা নতুন, সাউথ আমেরিকায় ব্রেজিলের স্যান্টস বন্দরে তৈরি হয়েছে, স্টিমে বা ডিজেলে চলে না, কিসে চলে আমি জানি না, একটা ঘেরা জায়গা আছে তার ভেতরে নাকি মোটর আছে, সেই মোটর নাকি জাহাজ চালায়।

বেশ, আচ্ছা যোসেফ তোমার ঐ দু'জন বসের সঙ্গে আর কেউ ঘুরে বেড়ায় না?

আপনি ঠিক ধরেছেন, একজন লোক হাতে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার মাথার সব চুল সাদা।

মেরি ফিসফিস করে বলল, মরিস লক।

জগদীশ বলল, ম্যামলক।

যোসেফকে জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, তুমি যা বললে তা কি সত্যি কথা বললে?

আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি তাহলে আমার মা বেশ্যা।

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যদি একটাও মিথ্যা কথা বলে থাক তাহলে আমরা তোমার দুটো হাত কেটে সমুদ্রে ফেলে দেব।

যোসেফ ভয় পেয়ে গেল, সে বলল, আমি মিথ্যা বলি নি স্যার।

রামদাস আবার বোতাম টিপে বলল, গার্ড দু'জনকে পাঠিয়ে দাও, যোসেফকে নিয়ে যাবে।

গার্ডরা এসে যোসেফকে নিয়ে যাবার পর রামদাস শেঠী জগদীশকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইফ'-চক্র তো জাহাজ নিয়ে বেড়াতে বেরোবে বলছে তবে ওরা বোমা ফাটাবে কি করে? তোমার কি মনে হয় জগদীশ?

এর মধ্যে দু'টো ব্যাপার থাকতে পারে আর ডি, একটা ব্যাপার

হলো যে ওরা মনে করছে যে ওদের জাহাজে এমন কিছু ধনী মানুষ উঠতে পারে যে তাদের বা তার কাছ থেকে ওরা মোটা মুক্তিপণ দাবি করবে আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল যে যে বন্দরে ওরা বোমা ফাটাতে চায় সেই বন্দর থেকে ওরা দূরে থাকতে চায় যাতে কেউ জাহাজ-খানাকে সন্দেহ করতে না পারে তবে বেতার যন্ত্র মারফত বোমা ফাটাবার লোককে ওরা আগেই মোতায়েন রাখবে।

আমার মনে হয় তোমার দ্বিতীয় মন্তব্যটাই ঠিক। যোসেফ আমাদের বলেছে যে স্যুটকেস নিয়ে ওরা মোট ছ'জনকে ভারতে পাঠিয়েছে।

তাহলে এবার আমরা কি করব? যাদের ওরা বোমা দিয়ে ভারতে পাঠিয়েছে এবং যারা বোমা ফাটাবে তাদের খুঁজে বেড়াবো?

সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে আর তোমরা দু'জন এক কাজ কর, স্বামী-স্ত্রী সেজে তোমরা ঐ জাহাজে উঠে পড়, আমার মনে হয় তোমরা ঐ ত্রিমূর্তির দেখা পাবে এবং দেখা পেলে তুমি তোমার বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে তাদের মোকাবিলা করবে।

তাহলে আমাদের আবার বম্বে ফিরে যেতে হবে, জাহাজের ওঠবার টিকিট কোথায় কিনব?

ওরা খবরের কাগজে নিশ্চয় বিজ্ঞাপন দেবে।

জাহাজ কলম্বোর দিকে এগিয়ে চলেছে। জগদীশ ও মেরি মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস করিম আনোয়ার নামে জাহাজে উঠেছে।

গোয়া থেকে জাহাজ ছাড়ার পর চার দিন পার হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ত্রিমূর্তির কাউকে দেখা যায় নি। জাহাজে প্রায় দু'শো যাত্রী আছে। জগদীশ ও মেরি তাদের প্রত্যেককে ভাল করে নজর করছে কিন্তু এখনও ত্রিমূর্তির কাউকে দেখা যায় নি।

জগদীশ চিন্তিত। ওরা কি জাহাজে নেই? কলম্বোতে বা তার

আগে ওদের দর্শন না পেলে জগদীশ ঠিক করেছে ও কলম্বোতে নেমে যাবে। তারপর ও মেরিকে দিল্লি পাঠিয়ে নিজে কলকাতা যাবে।

ওদের প্রথম টার্গেট কলকাতা অতএব তিন মূর্তি নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতার কোনো হোটেলে আড্ডা নিয়েছে মনে হয়।

জাহাজ কলম্বো বন্দরে থামল। তখন সকাল সাতটা। জাহাজ আবার ছাড়বে রাত্রে।

অনেক যাত্রী জাহাজ থেকে নামল, তারা শহর দেখবে, কিছু সওদা করবে। মেরিও নামল, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বিকেলে ফিরবে।

জগদীশ একা জাহাজে রইল। এই সুযোগে সে সমস্ত জাহাজটা ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখল। সন্দেহজনক কিছুই তার চোখে পড়ল না কিন্তু যোসেফ যা বলেছে তাতে তো মনে হয় এই জাহাজটা 'ইফ'চক্রের ঘাঁটি কিন্তু এখনও তো তিন নেতার একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। এদিকে সময়ও তো আর বেশি নেই। দশ দিনের মধ্যে পাঁচ দিন পার হয়ে গেল।

কলম্বো শহর ঘুরে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মেরি বিকেলে ফিরে এল। জগদীশ সিড়ির কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেখতে লাগল। আরে? ঐ লোকটা কে? জিরোর চেহারার সঙ্গে তো মিলে যাচ্ছে। এ নিশ্চয় জিরো। জিরো না হয়ে যায় না।

জগদীশের অনুমান ঠিক তবে জগদীশ অনুমান করছিল যে জিরোর হাতেও বুঝি তেমন একটা স্যুটকেস থাকবে যেমন স্যুটকেস যোসেফের হাতে দেখা গিয়েছিল।

জগদীশ মেরিকে খবরটা দিয়ে বলল, জিরোকে তো দেখা গেল আর দু'জন কোথায়? তুমিও একটু নজর রেখো।

মেরি বলল, ওরা জাহাজে নাও থাকতে পারে, ওরা হয়তো কলকাতার কাছে বোমা ফাটাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তা হতে পারে। কিন্তু শোনো মেরি এবার আমার লড়াই

আরম্ভ হলো, খুব বিপদ আশংকা করছি, গুলি চলবে, তুমি আমার কাছে থেকো না বরঞ্চ নিজের কেবিনে থাকবে।

তাই হবে।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় জাহাজ ছাড়ল। জগদীশ চারদিকে নজর রেখেছে। মিনিট পনেরো যাওয়ার পর সব জাহাজকে একটা জায়গায় থামতে হয়। এই জাহাজও থামল।

জগদীশ একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ থামার সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটা মোটর লঞ্চ জাহাজের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। এই জাহাজ থেকে একজন একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিল। লঞ্চের একজন সেই দড়িতে একটা স্যুটকেস বেঁধে দিল। যোসেফ স্যুটকেসের যে রকম বিবরণ দিয়েছিল এই স্যুটকেসটা দেখতে সেইরকম। তাহলে কি কলম্বোতে কোথাও এই স্যুটকেস তৈরি হয়?

পর পর তিনটে স্যুটকেস উঠল। মোটর লঞ্চটা চলে গেল। এই জাহাজখানাও নড়েচড়ে উঠল, এবার ছাড়বে।

জগদীশ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরে স্যুটকেসগুলো পর পর সাজিয়ে রাখা আছে। সেখানে জিরো দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে।

জগদীশ তার রিভলভারটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে জিরোর দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু মাত্র তিন পা যাবার পরই তার মাথার পিছন দিকে কেউ জোরে আঘাত করল। সেই এক ঘায়েই জগদীশ অজ্ঞান।

নাকটা সড়সড় করছে। নাকটা চুলকোবার জন্যে জগদীশ হাত তুলতে গেল কিন্তু হাত নড়ল না। চোখ খুলল। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে মনে পড়তে লাগল কি ঘটেছে।

জাহাজে একটা ছোট কেবিনে একটা সরু বাংকে জগদীশ পড়ে রয়েছে। পা এবং হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। সাধারণ দড়ি দিয়ে

নয়, আঠা লাগানো মোটা ফিতে অনেক পাক জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেবিনের ওধারের বাংকে আমারই মতো হাত পা বাঁধা অবস্থায় মেরি পড়ে রয়েছে। তার পরণে একটা পাতলা পাজামা ও গায়ে সুতি ব্লাউজ।

কেবিনের সামনের দিক থেকে মোটা গলায় কে একজন বলল, এই যে জগদীশবাবু আপনি জেগে উঠেছেন, গুড।

জগদীশ চিনতে ভুল করল না, একটা চেয়ারে বসে রয়েছে জিরো। জিরো একটু হেসে বলল, যদিও আমাদের যাত্রী তালিকায় তোমাদের নাম লেখা আছে মিঃ ও মিসেস করিম আনোয়ার তবুও আমি তোমাদের চিনতে ভুল করিনি।

দরজার কাছে একটা টুলের ওপর একজন ছোকরা বসে রয়েছে। জগদীশ দেখল তার হাতে তারই পিস্তলটা রয়েছে আর তার ছোরাখানা জিরোর কোমরের বেল্টে গোঁজা রয়েছে।

কি দেখছ মিঃ জগদীশ? হ্যাঁ তোমার দুটো অস্ত্রই হাত পালটেছে। তোমার সঙ্গিনীকে আমরা তোমার পাশে শুইয়ে রেখেছি, দেখতে পাচ্ছ বোধহয়।

জগদীশ বলল, তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না, আমার নাম করিম আনোয়ার।

জিরো হো হো করে হেসে উঠে দরজার সামনে পিস্তল হাতে বসা ছোকরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, পেপে মিঃ জগদীশ কি বলছে হে? বলছে ও নাকি করিম আনোয়ার, তাহলে তুমি বোধহয় মোরারজী দেশাই।

হাসি থামিয়ে জিরো বলল, না মিঃ জগদীশ আমরা জানি, তোমার সঙ্গিনী যখন বম্বে থেকে দিল্লিতে রামদাস শেঠীকে ফোন করেছিল এবং রামদাস বলল একজন এজেন্ট পাঠাচ্ছে আমরা তো তখন থেকেই জানি, তুমি বম্বে আসছ, তোমাকে অনেক দিন থেকেই চিনি।

ঠিক আছে মিঃ জিরো, এবার বল তুমি কি চাও?

যাক তুমি আমার নামটাও জেনে গেছ। আমি আপাততঃ জানতে চাই তুমি আমাদের বিষয় কতটা জান। আমরা যে জাহাজ নিয়ে গোয়া আসব এসব তুমি বোধহয় যোসেফ পেরেজের কাছ থেকে জানতে পেরেছ। তাকে তোমরা ব্যালার্ড পিয়ারে গ্রেফতার করেছ তা আমরা দেখেছি।

জগদীশ ভাবল ওদের কিছু বলা যাক এবং এই সুযোগে দেখা যাক কোনোভাবে বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি না। জগদীশ বলল, বেশি জানি না তবে এইটুকু জানি যে তুমি এবং জুডাস হলে ইফ-চক্রের মাথা আর ডঃ ম্যামলক নামে একজন বিজ্ঞানী তোমাদের বোমা তৈরি করে দিচ্ছে যার সাহায্যে তোমরা শহর উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

বেশ ভাল। এবার তোমাদের সি বি আই সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বল তো? অবিশ্যি আমরা যখন ক্ষমতা দখল করব তখন তোমাদের সবকিছু ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করব। আমি শুধু জানতে চাই যে তোমরা আমাদের পেছনে 'কোথায় কোথায় এবং কতজন গুপ্তচর নিযুক্ত করেছ।

জগদীশ কিছু বলল না। তার মাথাটা টন টন করে উঠল।

জিরো মিনিটখানেক অপেক্ষা করে বলল, জগদীশ আমার ধৈর্য কিছু কম কিন্তু আমি যে কোনো লোকের মুখ দিয়ে কথা বলাতে পারি তবে আমার মনে হয় তুমি অপেক্ষা ঐ মেয়েটাকে দিয়ে কথা বলানো সহজ হবে।

জগদীশ বলল, ও আমাদের বিষয় কিছু জানে না। ওকে শুধু আমাকে সাহায্য করবার জন্যে আমার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

দেখাই যাক না, মেয়েটা যদি কিছু না বলে তখন তোমাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমাকে সুযোগ দেওয়ার আগে তুমি নিজেই কথা বলবে।

জিরো যেন হঠাৎ ক্ষেপে গেল। সে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে এসে তার কর্কশ হাত দিয়ে জগদীশের মুখের ওপর সজোরে কয়েকটা চপেটাঘাত করল, জগদীশের ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

এমন চড় খাওয়া জগদীশদের অভ্যাস আছে। সে চুপ করে পড়ে রইল। সে তখন ভাবছে সূর্যনারায়ণ তার কোমরে যে একটা বেল্ট পরিয়ে দিয়েছে যার বিশেষ স্থানে হাত পড়লে বুঝি ভেতর থেকে গুলি বেরিয়ে আসে তা ওরা ওর রিভলভার ও ছোরা বার করবার সময় কি বেল্টে ওদের হাত পড়ে নি? এখন বেল্টটা তার হাওয়াই সার্টে ঢাকা পড়ে আছে। জিরো যদি তার কোমরের বেল্টে একবার হাত দেয়। কিন্তু জগদীশ সেরকম কোনো আশা দেখতে পেল না।

জিরো মেরির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি গো মেয়ে কিছু বলবে নাকি?

মেরি চুপ করে রইল।

কি কথা বলবে না? বটে? জিরো যেন রেগে গেল, বলল, না তোমাকে মারব না তবে কথা বলাবার অন্য উপায় আছে, বলে জিরো মেরির ব্লাউজটা জোরে টেনে ছিঁড়ে দিল। মেরির বুক উন্মুক্ত হয়ে গেল।

জিরো তার কর্কশ হাত দিয়ে মেরির বুক সজোরে মর্দন করতে করতে বলল, কি? এবার কথা বলবে?

জগদীশ যা বলেছে তার বেশি আমি কিছুই জানি না?

জান না? দেখি তুমি কতক্ষণ কথা না বলে থাক? জিরো এবার মেরির পা-জামার দড়ি খুলতে লাগল। সে ভেবেছিল যে মেরিকে নগ্ন করতে গেলেই জগদীশ মুখ খুলবে কিন্তু জগদীশ চুপ করে রইল।

জিরো মেরির পা-জামার কোমরের দড়ি সবে খুলেছে আর ঠিক সেই সময়ে কেবিনের বন্ধ দরজায় কে আঘাত করল।

জিরো বিরক্ত হয়ে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে বলল, কে? কি চাই।

দরজা খুলে একজন সেলর জিরোকে স্যালুট করে বলল, আপনার একটা রেডিও মেসেজ এসেছে? জেনারেল জুডাস ডাকছেন, জরুরী।

চল, যাচ্ছি।

সেলর চলে গেল। পেপেকে জিরো বলল, ভাল করে নজর রাখবি, লোকটা ভীষণ ধূর্ত।

ঠিক আছে স্যার।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে জিরো কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের দলে থাকলেও পেপে ওদের মতো নিষ্ঠুর নয়। সিঙ্গাপুরের কাছে দ্বীপে বোমা ফাটাবার আগে পেপে দ্বীপ যাত্রীদের জন্যে শংকা প্রকাশ করেছিল। বয়সও তার বেশি নয়, কুড়ি বছরও হয় নি।

মেরি কাঁদতে লাগল। কেন কাঁদছে জগদীশ বুঝতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে মেরি বলল, পেপে ভাই লোকটা আমার ওপর অত্যাচার করবে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে?

দেখব কি না বলতে পারি না তবে আমি তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারব না, পেপে বলল।

জগদীশ বুঝল মেরি কেন কাঁদছে। পেপের সহানুভূতি আদায় করে যদি কিছু করা যায়।

টেবিলে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা দেশলাই ছিল। জিরো ফেলে গেছে। জগদীশ সেইদিকে মেরির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মেরি জগদীশের ইঙ্গিত বুঝল। মেরি তখন বলছে,

পেপে তুমি তো ওদের মতো নও, তুমি কি আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে দিতে পারতে?

আমাকে কিছু বলা বৃথা মিস, আমি কিছু করতে পারব না।

বেশ, সামান্য একটু অনুগ্রহ কর, জিরো তো এখনি এসে আমার ওপর অত্যাচার করবে যা করেছে তাতেই আমার বুকে কালসিটে পড়ে গেছে, তুমি তার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে দাও।

রাশিয়ান সিগারেট খাবে তো ?

আমার কাছে এখন সব সিগারেট সমান।

পেপে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে মেরির ঠোঁটে লাগিয়ে দিল। ইতিমধ্যে জগদীশ দুই হাঁটু মুড়ে, পিঠটা পিছনে উঠিয়ে প্রস্তুত।

জগদীশ ভেবেছিল পেপে বোধহয় মেরির পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা মাঝে মাঝে মেরির ঠোঁট থেকে তুলে নেবে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দেবে।

তাই জগদীশ ভাবছিল সে কি করে পেপেকে আঘাত করবে। পেপে নিজেই তার সুযোগ করে দিল।

পেপে সিগারেটটা মেরির ঠোঁটে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজের সিটে ফিরে যাবার জন্যে যেই পিছন ফিরেছে আর জগদীশ অমনি জোড় পা দিয়ে পেপের পিছনে সজোরে আঘাত করল।

জগদীশদের এসব শিখতে হয়। হাত পা বাঁধা অবস্থায় কি করে আত্মরক্ষা করা যায় বা শত্রুকে আঘাত করা যায়।

জগদীশের গায়ে জোরও বেশ, ব্যায়াম করা শক্ত সমর্থ মজবুত শরীর। সেই মজবুত শরীরের জোড় পায়ের লাথি পেপে সহ্য করতে পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ বাংক থেকে নেমে মেরির বাংকে পিছন ঠেকিয়ে বসে দেখল পেপে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মেরি সিগারেটটা ফেলে দাও। শোনো, আমার বুক পকেটে দাড়ি কামানো ব্লেড আছে। আমি অমন সব সময়ে রাখি, প্রায়ই কাজে লাগে। তুমি পিছন ফিরে তোমার বাঁধা হাত দিয়ে ওটা কোনো রকমে বার করে আমার বাঁধন কাট। খুব সাবধান দেখো যেন ব্লেড হাত ফসকে পড়ে না যায়।

মেরি কাজের মেয়ে এবং মেয়ে বলে তার বাঁধনটাও বোধহয় আলগা করে বাঁধা হয়েছিল। মেরি জগদীশকে বন্ধন মুক্ত করল।

জগদীশ হাত খোলা পেয়ে পায়ের অ্যাডেসিভ টেপ অতি দ্রুত খুলে মেরিকেও বন্ধন মুক্ত করতে না করতেই বাইরে ভারী পায়ের শব্দ। নি॰ য় জিরো আসছে। জগদীশ প্রস্তুত। যতদূর সম্ভব নিজেকে আড়াল ॰রে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খুলে জিরো ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তার থুতনির নিচে খুব জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। জিরো পড়ে গেল। জগদীশ তাকে টেনে এনে পেপের পাশে শুইয়ে দিয়ে দুজনেরই শরীরে কোথায় যেন আঙুল দিয়ে জোরে টিপে দিল। মেরিকে বলল, এখন অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত, ওদের জ্ঞান তার আগে ফিরবে না। এখন চল।

কেবিনের বাইরে বেরিয়ে দেখল সামনে কেউ নেই। মেরির ব্লাউজ জিরো ছিঁড়ে দিয়েছে, ছেঁড়া ব্লাউজ দিয়ে কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে জগদীশকে অনুসরণ করতে লাগল।

নিচের ডেকে লাইফ বোট, লাইফ জ্যাকেটে এবং রবার বোট আছে। জগদীশ আগেই তা দেখে রেখেছিল।

ওরা দুজনে খুব সতর্কতার সঙ্গে নিচের ডেকে নেমে এল। কেবিন থেকে বেরোবার সময় জগদীশ পেপের হাত থেকে পড়ে যাওয়া তারই রিভলভার এবং জিরোর কোমর থেকে নিজের ছোরাখানা আনতে ভোলে নি।

ডিনারের সময় হয়েছে, বেশির ভাগ নাবিক জাহাজের ক্যান্টিন হলে ঢুকেছে।

জগদীশ রবার বোট খুলে নিল। মেরিকে বলল আমি রেলিং ডিঙিয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও ঝাঁপ দেবে।

রবার বোটটা আগে জলে ফেলে দিয়ে জগদীশ ঝাঁপ দিল। কিন্তু কোনো অজানা কারণে রবার বোটখানা ছিটকে দূরে সরে গেল।

সেটা ধরবার জন্যে জগদীশ সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগল। মেরি জলে ঝাঁপ দিয়েছে কিনা জগদীশ তা টের পায় নি, সমুদ্র ও

জাহাজের আওয়াজের জন্যে মেরির জলে পড়ার আওয়াজ পায় নি। তাছাড়া ওর মন তখন ছিল বোটখানা ধরার দিকে এবং সে ধরে নিয়েছিল যে মেরি ঠিক ঝাঁপ দিয়েছে এবং তাকে অনুসরণ করছে।

প্রায় পনেরো মিনিট চেষ্টার পর জগদীশ বোটখানা ধরে তার ওপর যখন চড়ে তখন ধারে কাছে কোথাও মেরিকে দেখতে পেল না।

জগদীশ জানে মেরি খুব ভাল সাঁতারু। সে ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কেটেছে। তাকে যখন দেখা যাচ্ছে না তখন সে নিশ্চয় ধরা পড়ে গেছে, জলে ঝাঁপ দিতে পারে নি।

একটু পরে জগদীশ ভাবল তাই বা কি করে হবে? মেরিকে যদি ওরা ধরেই ফেলে তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় তারও খোঁজ হত এবং এতক্ষণে দু'চারটে গুলি ছুটত কিংবা ওরা জাহাজ থামিয়ে জলে বোট নামিয়ে ওর খোঁজ করত। তাহলে মেরি গেল কোথায়? না, মেরিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

তবুও জগদীশ স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অনেকক্ষণ ধরে মেরিকে খুঁজল। মেরিকে পাওয়া গেল না। জগদীশ হতাশ হল।

সমুদ্রে বুঝি জোয়ার এল। জোয়ারের স্রোতে হালকা ও ছোট রবার বোটখানা আয়ত্বে রাখা যাচ্ছে না। বোটখানা জোয়ারের টানে উপকূলের দিকে ভেসে চলল। জগদীশ ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগল। নৌকা কোথায় তাকে নিয়ে যায় কে জানে?

বেশ খানিকটা স্রোতে ভেসে যাওয়ার পর জগদীশ লক্ষ্য করল মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ সমুদ্র থেকে মাথা তুলে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝল যে সে সিংহল উপকূল থেকে বেশি দূরে নেই।

রবার বোট তাকে সিংহল বা শ্রীলংকার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নামিয়ে দেয় কে জানে?

জগদীশের ভাগ্য ভাল। একটা বেশ বড় ঢেউ রবার বোট সমেত তাকে বালির ওপর ফেলে দিল। অনেক পরিশ্রম করে সে

বোটখানা উদ্ধার করে বালির ওপর দাঁড়াল। এটা সমুদ্রের বেলাভূমি।

জল থেকে বেশ খানিকটা সরে গিয়ে সে বসে হাঁফাতে লাগল। জামা প্যান্ট সব ভিজে গেছে। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় সে তাতে দেখল যে সে আপাততঃ নিরাপদ স্থানেই নেমেছে। এখানে বালি অর্থাৎ সমুদ্রের বিচ বেশ চওড়া তারপরই তীরে রয়েছে নারকেল গাছের ঘন সারি।

এখন কিছু করার নেই। সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। জগদীশ বিচের ওপর হাঁটতে লাগল দু'দিকেই। তার মতো জোয়ারের টানে মেরি যদি ভেসে এসে থাকে! দু'দিকে মিলিয়ে সে প্রায় এক মাইল করে হাঁটল কিন্তু মেরি দূরের কথা একটাও জন-প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। এর বেশি আর যাওয়া গেল না, একদিকে ঘোর জঙ্গল আর একদিকে খাড়া পাথর যার ওপর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। সূর্য উঠতে বেশি দেরি নেই। কিন্তু ভাল করে আলো ফুটতে না ফুটতে অনেক লোকের গলা শোনা গেল। তারা যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। এরা কারা? কোথায় যাবে?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ কিছু লোক বেলাভূমিতে জড়ো হল। রাত্রের অন্ধকারে জগদীশ দেখতে পায় নি। এখন দেখল বালির ওপর কয়েকটা নৌকো এবং ডিঙি বাঁধবার উপযোগী কাষ্ঠখণ্ড, জাল ও দড়ি বালির ওপর ছিটিয়ে পড়ে আছে।

জগদীশ নিশ্চিন্ত হল। এরা মাছধরা জেলে। দড়ি দিয়ে ডিঙি বেঁধে জাল নিয়ে সমুদ্রে ভাসবে। ভারত ও শ্রীলংকার উপকূলে এদের সর্বত্র দেখা যায়।

আলো ফুটছে, চারদিক বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। জেলেদের মধ্যে তাকে একজন দেখতে পেল। ওরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে

কথা বলাবলি করল তারপর দু'তিনজন ওর দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগল।

তাদের ভাষা জগদীশ বুঝতে পারল না, অনুমান করল ওরা নিশ্চয় ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে। ওরাও জগদীশের ভাষা বুঝল না।

তখন ঐ তিনজন জেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলে কাকে চিৎকার করে ডাকল। পনেরো ষোলো বছরের একটা ছেলে ছুটে এল। তাকে ওরা কি বলল।

ছেলেটা জগদীশকে ইসারা করে ওর সঙ্গে যেতে বলল। জগদীশ বলল ওরা ওকে কাছে কোনো গ্রামে পাঠাতে চায় সেখানে কেউ হয়তো ওর ভাষা বুঝবে, সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। লোকগুলো খারাপ নয়। ছেলেটার সঙ্গে যাওয়া যাক।

ছেলেটা এগিয়ে চলল। জগদীশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। নারকেল গাছের ঘন সারির মধ্যে সরু পথ ধরে ওরা চলল। গ্রাম বেশি দূরে নয়। কয়েকটা কুকুর নতুন লোক দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

মোটামুটি একটা ইটের বাড়ির সামনে এসে ছেলেটা দাঁড়াল তারপর কাকে ডাকল।

মিনিট দুই পরে সাদা লুঙ্গি পরা খালি গায়ে একজন আধবয়সী পুরুষ বেরিয়ে আসতেই ছেলেটি তাকে কিছু বলে চলে গেল।

জগদীশ বলল, গুড মর্ণিং, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পার ?

হ্যাঁ, পারি, তুমি কে ? কী করে এখানে এলে ?

উচ্চারণ শুনে জগদীশ বুঝল লোকটি বেশ ভালই ইংরেজি জানে। জগদীশ বলল, সে ভারত সরকারের একজন অফিসার। তারপর কিছু সত্যমিথ্যা মিশিয়ে একটা কাহিনী বলল।

লোকটি তার কথা কিছু বিশ্বাস করল, কিছু হয়তো বিশ্বাস করল না। জগদীশ নিকটবর্তী শহরের নাম জিজ্ঞাসা করল কারণ সেখান থেকে কলম্বো যেতে চায়। কলম্বোতে ভারতের হাই কমিশনার

থাকে। সেখানে অবশ্যই এবং যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া দরকার। রামদাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

নিকটবর্তী শহর হল হামবানটোটা, বেশি দূর নয়, দু'মাইল হবে। জগদীশ তখনই যেতে প্রস্তুত কিন্তু লোকটি তাকে কফি এবং কিছু খাবার না খাইয়ে ছাড়ল না।

লোকটি বলল, সে হামবানটোটায় ইস্কুল মাষ্টারী করে এবং এখানে তার ছোটখাটো একটা মাছের ব্যবসা আছে। রোজ সাইকেলে করে শহরে যায়।

লোকটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জগদীশ শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটি তাকে বলে দিয়েছিল হামবানটোটা থেকে বাসে কলম্বো যাওয়া যায় কিন্তু পথে দু'বার বাস বদলাতে হয় এবং প্রথম বাসে গেলেও কলম্বো পৌছাতে বেলা তিনটে বাজবে।

লোকটি তাকে বলে দিয়েছিল শহরে সবরকম সাহায্য পাওয়া যাবে। দরকার হলে জয়রমণের সঙ্গে সে দেখা করতে পারে। জয়রমণের ঠিকানাও জানিয়ে দিল।

আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে জগদীশ বিদায় নিল। হাতে সময় নেই। দেখা যাক যদি টেলিফোনের সুযোগ পাওয়া যায়। অন্ততঃ কলম্বোতে হাই কমিশনের সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

হামবানটোটা নেহাত বড় শহর নয়। জয়রমণকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না। শহরে প্রবেশ করে বেশ বড় একটা বাড়ি দেখা গেল। বাড়িটা একটা লজিং হাউস। এই লজিং হাউসের নিচে যে রেস্তরা আছে সেখানে জয়রমণকে পাওয়া যাবে।

জয়রমণকে পেতে দেরি হল না। ভাল ইংরেজি জানে। ম্যাড্রাসে অনেক দিন ছিল। তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও অসুবিধে নেই কারণ লোকটির স্বভাবই হল পরোপকার করা।

জগদীশের ক্ষিধে পেয়েছিল। আগে সে কিছু খেয়ে নিল তারপর স্নান করা দরকার। লজিং হাউসে আপাততঃ একখানা ঘর নিল।

জয়রমণ বলল পোস্টঅফিস থেকে কলম্বোতে ট্রাংক টেলিফোন করা যাবে। হাই কমিশন অফিস ন'টার আগে খুলবে না। ইতিমধ্যে স্নান সেরে নেওয়া যাক।

লজিং হাউসের ঘরে ঢুকে জগদীশ আগে জামা ও প্যান্টের গুপ্ত পকেটগুলো দেখে নিল। টাকা পয়সা সব ঠিক আছে। জরুরী দরকারের জন্যে কয়েক কুঁচি সোনা সঙ্গে থাকে।

আপাতত এখানে কিছু খরচ আছে, যেতে হবে, টেলিফোন করতে হবে, একটা জামা প্যান্ট কেনাও দরকার। জয়রমণের মারফত কিছু সোনা বিক্রি করতে হবে কারণ তার কাছে যে টাকা আছে তা এখানে চলবে না।

জগদীশ আবার জয়রমণের কাছে ফিরে এল। তাকে তার সমস্যার কথা বলল। সোনা থাকলে আর টাকার ভাবনা কি? জয়রমণ সব ব্যবস্থা করে দিল। এক প্রস্থ জামা প্যান্ট ও দু একটা টুকিটাকি জিনিসও কিনে দিল।

জগদীশ নিজের ঘরে স্নান সেরে ঠিক আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। তারপর একটু যোগ ব্যায়াম করে দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে নিচে নামল।

লজিং হাউসে যে রেঁস্তরাটি রয়েছে তার লাগোয়া একটা কফি কর্ণারও রয়েছে। জয়রমণকে কফি কর্ণারে প্রায় সব সময়েই পাওয়া যায়। জয়রমণ আসলে দারচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, গোলমরিচ ও ভ্যানিলা ব্যবসায়ীদের একজন বড় দালাল।

টেলিফোন করবার জন্যে জয়রমণ ওকে পোস্টঅফিসে নিয়ে গেল। জগদীশ জিজ্ঞাসা করল এখান থেকে সে দিল্লির সঙ্গে কথা বলতে পারবে কি না।

না, দিল্লির সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়, পোস্টমাস্টার বললেন যে তিনি কলম্বোর সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে দিতে পারেন তবে ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে ইণ্টারন্যাশনাল লাইন মারফত দিল্লির সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকতে পারে।

তাহলে সেইরকম কোনো লাইন যদি থাকে তাহলে সেই লাইনের সঙ্গে এখানকার লাইন কি যোগ করে দেওয়া যায়? ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী বলেই এত কথা বলছি।

পোস্টমাস্টার বললেন, আমি ঠিক জানি না, সম্ভব হলে কলম্বো সেটা পারে। আপনি যদি কলম্বো যান তাহলে পৃথিবীর যে কোনো রাজধানীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

ঠিক আছে আগে আমি এখানে চেষ্টা করে দেখি নাহলে কলম্বো যেতেই হবে, হাতে আমার সময় খুব অল্প।

জগদীশ ভেবে দেখল সে ইতিমধ্যে একটা কাজ করতে পারে। কলম্বো হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে তাদের মারফত রামদাসকে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে এখানে একটা ট্যাকসি ভাড়া করে কলম্বো চলে যেতে পারে।

এছাড়া তার মনে হয়েছে কলম্বোতে ইফ-চক্রের একটা বড় রকম ঘাঁটি আছে। ঐ বোমা হয়তো কলম্বোর কাছে কোথাও তৈরি হয় অথবা ওখানে জমা রাখা হয় এবং সেখান থেকে বিলি করা হয়। সে নিজেই তো দেখল কলম্বো বন্দরেই লঞ্চ থেকে 'রেড ড্রাগন' জাহাজে বোমা তোলা হল।

কলম্বোর সঙ্গে টেলিফোনে যুক্ত হতে বেশি সময় লাগল না। ভাগ্যক্রমে যে লোকটি টেলিফোন ধরেছিল সেই লোকটি দিল্লিতে সি বি আই অফিসে একদা জগদীশের সঙ্গে কাজ করেছিল। ফলে কাজ অনেক সহজ হল।

রামদাসের উদ্দেশ্যে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে জগদীশ বলল যে সে এখনি একটা ট্যাকসি নিয়ে কলম্বো যাত্রা করছে।

রিপোর্টে জগদীশ জানিয়ে দিল সে এখন কোথায় আছে, কিভাবে এল এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে কলম্বো পৌঁছচ্ছে, সেখান থেকে রামদাসের সঙ্গে কথা বলবে। রিপোর্টে সে বলল, তার বিশ্বাস কলম্বোতে ইফ-এর একটা চক্র আছে। জিরো বোধহয় বেশির ভাগ সময়

এখানেই থাকে। পরিশেষে বলল, মেরি ডিসুজার এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। কলম্বো হাই কমিশনকে যেন বলে দেওয়া হয় তাকে কিছু টাকা দেবার জন্যে। কলম্বো পৌঁছে সে আর ডি-এর উত্তর অপেক্ষা করছে।

জয়রমণ কফি কর্ণারে বসেই একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দিল। জগদীশ জয়রমণকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তখনই রওনা দিল। গাড়িও ভাল, ড্রাইভারও ভাল। সে তামিল মিশ্রিত সিংহলী ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না।

উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ দিয়ে সে দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ জোরেই যাচ্ছিল কিন্তু আধাআধি পথে একটা গঞ্জের কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ি থেকে নেমে বনেট তুলে কি দেখল। তারপর এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে জগদীশকে ইসারায় বুঝিয়ে দিল গাড়ি আর যাবে না।

সে কি? জগদীশ হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু ড্রাইভার ইঙ্গিতে বলল, তুমি গাড়িতে অপেক্ষা কর আমি এখনি অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জগদীশকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে ড্রাইভার কোথায় চলে গেল কিন্তু পনেরো মিনিট পরে সে আর একখানা গাড়ি নিয়ে হাজির। গাড়ির চেহারা দেখে মনে হল গাড়ি ভাল এবং ড্রাইভার ইংরেজি জানে। জগদীশ খুশি হল, যাক দু'চারটে কথা বলা যাবে।

জগদীশ নতুন গাড়িতে উঠল। এই গাড়ির ড্রাইভার খুব কথা বলে, কথায় যেন খই ফুটছে। মাইল দশ যাবার পর বলল, এখানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আজ ভোরে বুঝি সমুদ্রে কয়েকজন জেলে যখন ট্রলার নিয়ে মাছ ধরছিল তখন তারা একজন লেডিকে উদ্ধার করেছে। লেডি বোধহয় ইণ্ডিয়ান, কোমরে লাইফবেল্ট লাগানো ছিল কিন্তু তার দেহে কোনো বস্ত্র ছিল না বললেই চলে। জেলেরা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে আনে কিন্তু সে সুস্থ হবার

আগেই তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে যায়। অথচ মজা যে কাল কোনো স্টিমার বা জাহাজডুবি হয় নি।

ড্রাইভারের কথাগুলো শোনবার সময় উত্তেজনায় জগদীশের বুক ঢিব ঢিব করছিল। এ নিশ্চয় মেরি। জগদীশ জিজ্ঞাসা করল— ড্রাইভার তুমি এই খবর কোথায় কার কাছে শুনেছ?

ঐ লঞ্চের সারেঙ আমাকে বলেছে।

তুমি আমাকে সেই সারেঙের কাছে নিয়ে যেতে পার?

এখনই যাবেন? আমার যে এখনও খাওয়া হয় নি, একটু দেরি হবে।

তাহলে তুমি আমাকে কলম্বো নিয়ে চল আগে, সেখানে আমি আমার কাজ সারি ইতিমধ্যে তুমি লাঞ্চ করে নেবে তারপর আমাকে তুমি সেই সারেঙের কাছে নিয়ে যাবে।

ড্রাইভার রাজি হল।

কলম্বো জগদীশের অপরিচিত নয়। সে আগেও। এ শহরে দু-একবার এসেছে। ভারতীয় হাই কমিশনে জগদীশ তার পরিচিত বন্ধুর কাছে গেল। দিল্লি থেকে তার মেসেজ এসে গেছে, আর ডি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, কলম্বো পৌঁছে জগদীশ যেন তাঁকে টেলিফোন করে, তিনি তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই প্রায়োরিটি লাইন মারফত কলম্বো দিল্লি যোগাযোগ হয়ে গেল। আর ডি বললেন, তোমার টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তুমি ওখানে খোঁজ করলেই পাবে। আরও একটা ব্যবস্থা করেছি, ওখানে ডলি নামে আমাদের একজন লোক আছে। তাকে আমি আগেই ফোন করেছি। সে তোমার জন্যে হাই-কমিশনের লাউঞ্জে ওয়েট করবে। তার চুলে একটা হলদে গোলাপ দেখতে পাবে।

জগদীশ বলল, মেরির একটা খবর পেয়েছি, তাকে নাকি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু খবর পেয়ে তার স্বামী নাকি তাকে

নিয়ে গেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে সে আবার শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছে। আমি এখান থেকে মেরির খোঁজে যাচ্ছি এবং মেরিকে যদি পাই তাহলে কলম্বোতে ওদের ঘাঁটির সন্ধান পাব।

বেশ চেষ্টা কর তবে হাতে আমাদের সময় নেই।

ডলি স্থানীয় ভাষা জানে তো ?

আসলে সে সিংহলী, ডলি ওর কোড-নেম্ তাহলে তুমি সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়।

অলরাইট আর ডি, লাইন ছাড়ছি।

হাই কমিশনের লাউঞ্জে ডলি এবং তার ট্যাকসির ড্রাইভার দু'জনেই অপেক্ষা করছিল। ট্যাকসি ড্রাইভারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে জগদীশ ডলির সঙ্গে আলাপ করল।

ডলি বেশ জবরদস্ত মেয়ে। পরনে ছেলেদের মতো ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে আস্তিন গোটানো শার্ট। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা হলেও একদিকে ছোট একটি হলদে গোলাপ ক্লিপ দিয়ে আঁটা ছিল।

জগদীশ সংক্ষেপে তার কাহিনী বলে জিজ্ঞাসা করল সে এখন মেরির সন্ধানে যাচ্ছে, ডলি এখনি তার সঙ্গে গেলে ভাল হয় কারণ তার সমস্যা হল স্থানীয় ভাষা।

কলম্বো বন্দর থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের ধারে ছোট একটা গ্রামে নিয়ে গেল। সারেং ঘরেই ছিল। সারেং-এর মুখে চেহারার যে বর্ণনা শুনল তাতে মেয়েটি নিঃসন্দেহে মেরি এবং 'স্বামীর' যে বর্ণনা শুনল তাতে জগদীশ বুঝল লোকটি জিরো ছাড়া আর কেউ নয়। সে কথা অবশ্য ওদের বলল না।

সারেংকে জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটিকে তার 'স্বামী' কোথায় নিয়ে গেছে জান ?

জানি বৈকি, পাইরেটস আইল্যাণ্ডে।

সে কতদূর ?

বেশি দূর নয়, দ্বীপটা নাকি এক কালে বোম্বেটেদের আস্তানা ছিল, ওখানে ঐ স্বামীর একটা আড্ডা আছে বলে আমরা জানি। ঐ স্বামীকে আমরা এখানে মাঝে মাঝে দেখি তবে নামটাম বা কোনো পরিচয় জানি না, কোন দেশের লোক তাও জানি না।

তুমি আমাদের ঐ দ্বীপে নিয়ে যেতে পার?

আমি পারি না, আমার অন্য কাজ আছে।

তাহলে আমাকে একটা মোটর বোটের ব্যবস্থা করে দিতে পার?

তা পারি।

তাহলে তাড়াতাড়ি কর কিন্তু মোটর বোট আমি একা চালিয়ে নিয়ে যাব, রাজি?

ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সারেংটি জগদীশকে আরও একটি খবর দিল। কলম্বো হারবারের কাছে আমিনস কিচেন নামে একটা ভোজনালয় আছে। সেই কিচেনের মালিক স্বয়ং আমিনের সঙ্গে ঐ 'স্বামীর' যোগাযোগ আছে। সে তো মাঝে মাঝে ওর কাছে যায়।

খবরটা শুনে জগদীশের চোখে মুখে ঝিলিক খেলে গেল। ডলি তা লক্ষ্য করল। সারেংকে জগদীশ বলল, আমিনকে আমি চিনি, সে এখন কোথায়?

চেনেন? তাহলে তার কাছেই যান না, তার নিজেরই তো লঞ্চ আছে।

জগদীশ অবশ্য ধাপ্পা দিয়েছিল তাই বলল, না তাহলে দেরি হয়ে যাবে, তুমি তোমার মোটর বোটেরই ব্যবস্থা করে দাও।

আপনি যখন আমিনের চেনা লোক তখন তো আর কথাই নেই, আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।

আধ ঘণ্টা পরে সারেং ফিরে এল। মোটর বোট রেডি। একটু দূরে জগদীশ ও ডলিকে সারেং নিয়ে গেল। পাইরেটস আইল্যাণ্ডে

কোন দিকে যেতে হবে তার নিশান। জগদীশ সারেং-এর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তখনি বোট ছেড়ে দিল।

পাইরেটস আইল্যাণ্ডে পৌঁছে জগদীশ ডলিকে বলল, তুমি বোটে আমার জন্যে অপেক্ষা কর, যদি আমি ছু' ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি তাহলে তুমি কলম্বোয় ফিরে যেয়ে দিল্লিতে রামদাস শেঠীকে সব জানাবে।

জগদীশ যেখানে বোট ভিড়িয়ে ছিল সেখানে কোনো জেটি ছিল না কারণ সেটা কোনো ঘাট নয়। সে ইচ্ছে করেই এখানে বোট থামিয়ে ছিল। যেখানে ঘাট আছে সেখানে নামতে গেলে নিশ্চয় ওদের লোকেরা তাকে দেখতে পেত তাই জগদীশ ইচ্ছে করেই ওপথে যায় নি।

যেখানে বোট থামল তার সামনে বেশ খাড়াই, সামনে বড় বড় পাথর। বোট থেকে একটা বড় পাথরের ওপর সে লাফিয়ে নামল।

পাথর বেয়ে বেয়ে জগদীশ ওপরের দিকে উঠতে লাগল। বেশ খানিকটা ওঠবার পর দ্বীপের মাথায় পৌছল। মাথাটা অসমতল, ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ পালায় ভর্তি, এখানে এককালে জলদস্যুরা হয়তো আড্ডা গেড়েছিল কিন্তু বর্তমানে এখানে মানুষ বাস করে বলে তো মনে হয় না।

লঞ্চের সারেং তাকে ধাপ্পা দিল না তো? তবে এসেছে যখন তখন সে না দেখে ফিরবে না। একটা লম্বা গাছ ছিল। জগদীশ সেই গাছটায় উঠল।

পনেরো ফুট আন্দাজ ওঠবার পর একটা ডালে চেপে বসে চারদিক দেখতে লাগল। খুব কাছেই সে দেখতে পেল যা সে খুঁজছে। বেশ বড় একটা শেড। শেডের মাথাটার ওপর এলোমেলো ভাবে ঘোর ও পাতলা সবুজ রং লাগানো রয়েছে যাকে বলে ক্যামুফ্লাজ করা রয়েছে তাই সহজে নজরে পড়ে না। কিন্তু কোনো মানুষ দেখা গেল না।

জগদীশ গাছ থেকে নেমে পড়ে সেই শেডের দিকে চলল। অতি

সতর্কতার সঙ্গে জগদীশ চারদিক ঘুরে দেখল কিন্তু কোথাও কোনো প্রবেশ পথ দেখতে পেল না, তাও কি ক্যামুফ্লাজ করা আছে নাকি ?

চলতে চলতে এক জায়গায় তার নিজের পায়ের আওয়াজ অন্য রকম মনে হল। সে যেন একটা একটা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হাঁটছে। জগদীশ দাঁড়িয়ে পড়ল, পায়ের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। সত্যিই তো সে একটা কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই সহসা তার নজরে পড়ে নি।

এইটেই তাহলে প্রবেশ পথ। এই কাঠখানা তোলবারও ব্যবস্থা আছে কোথাও। বেশি খুঁজতে হলো না। একটা আংটাও পাওয়া গেল। আংটা টেনে তুললে ভেতরে কোথাও যদি ঘণ্টা বেজে ওঠে ?

জগদীশ তবুও আংটা ধরে টান দিল। বোধহয় স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা আছে তাই অতবড় কাঠ সহজেই উঠে এল। কাঠখানা দাঁড় করিয়ে রেখে জগদীশ আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রিভলভারটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে।

না কেউ এল না। সে সাবধানে নেমে পড়ল কিন্তু কাঠখানা নামিয়ে দিল না। ওরা নিজেদের খুব নিরাপদ মনে করছে তাই বুঝি কোনো সংকেতের ব্যবস্থা রাখে নি। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে তারপর লম্বা করিডর।

করিডর ধরে জগদীশ চলল। চার পাঁচ গজ যাবার পর একটা জানালা তার পাশে দরজা। দরজা বন্ধ।

জানালার পাশে জগদীশ দাঁড়াল। সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর! জগদীশ কোথায় ? তোমরা দু'জনে একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়েছ, সে কোথায় ? তুমি নিশ্চয় জান।

আমি তো অনেকবার বলেছি আমি জানি না তবু কেন বার বার একই প্রশ্ন করছ ?

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস না করলে আমি কি করতে পারি ?

পুরুষের কণ্ঠস্বর নিঃসন্দেহে জিরোর এবং নারী কণ্ঠ মেরির। জানালার এক কোণ দিয়ে জগদীশ মুখ বাড়িয়ে দেখল মেরিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, দুই পা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বাঁধা। বুক উন্মুক্ত কারণ ওর জামা তো জিরো ছিঁড়ে দিয়েছিল আর পরণের পাজামা সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে শতচ্ছিন্ন, কতকগুলি ন্যাকড়ার ফালি তার কোমরে জড়িয়ে আছে।

তাহলে তুমি বলবে না? বেশ কি করে কথা বলাতে হয় আমি জানি, বলে জিরো পাশে একটা ঘরে ঢুকে কার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

ইচ্ছে করলেই জগদীশ গুলি করে জিরোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারত কিন্তু ভেতরে কত লোক আছে তা জানা নেই। ধরা পড়ে গেলে দু' জনেরই প্রাণ যাবে। একটু অপেক্ষা করা যাক।

জিরো যার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল তাকে চেনাই দুষ্কর। পেপে। তার মাথার চুলগুলো যেন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাক নেই, সেখানে একটা গর্ত। দেহ থেকে অনেক জায়গায় মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে বোধহয় উত্তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে।

দেখলে তো পেপের কি হাল হয়েছে। তোমারও ঠিক ঐ রকম হাল করব, আগে তোমার ঐ দুই সুপুষ্ট স্তন, তারপর মুখ···বলতে বলতে পেপেকে ধাক্কা দিল। পেপে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেল কোনো রকমে। আশ্চর্য যে ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে।

জগদীশ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, কাছেই একটা উনুন জ্বলছিল। উনুনে সত্যিই একটা সাঁড়াশি গরম করতে দেওয়া হয়েছিল। তার হাতলে তাপ নিরোধক কোনো বস্তু লাগানো আছে।

জিরো সেটা যখন তুলে আনল তখন তার ডগা ঘোর লাল। দেহে স্পর্শ করালেই মাংস উঠে আসবে, কোমল স্তনের তো কথাই নেই। জিরো সাঁড়াশিটা তুলে মেরির বুকের কাছে নিয়ে এল।

মেরি বোধহয় তাপ অনুভব এবং কি ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে চিৎকার করে উঠল।

আর অপেক্ষা করা যায় না, গুলি না করে উপায় নেই কিন্তু জিরো এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে গুলি মেরির গায়েও লেগে যেতে পারে।

জগদীশের চকিতে মনে পড়ল সূর্যনারায়ণ তাকে কয়েকটা গোল বড়ি দিয়েছিল। এবার তার ফল দেখা যাক। সূর্যনারায়ণ বলে দিয়েছিল ঈষৎ চাপ দিয়ে বড়িগুলি মাটিতে ফেলে দিতে।

আর সময় নেই। জগদীশ পকেট থেকে তুটো বড়ি বার করে আঙুল দিয়ে সামান্য টিপে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। আর সেই সঙ্গে সূর্যনারায়ণের দেওয়া সেই রুমাল মুখোশ দিয়ে নিজের মুখে ঢাকা দিল।

ঘরের মেঝেতে পড়ে সেই বড়ি ফেটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্যাস বেরলো। জিরো এবং মেরি তুজনেই ভীষণ কাশতে আরম্ভ করল।

গ্যাসটা সরাসরি জিরোর নাকে বেশ পরিমাণে ঢুকেছিল। তাই শুধু কাশির ধমক নয় হাঁচতে হাঁচতে জিরো ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল। সেই সুযোগে জগদীশ পাশের দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঐ পাশের ঘর থেকেই তুটো লোক বেরিয়ে এল আর তাদের পেছনে পেপে।

জগদীশের রিভলভার ও তাক অত্যন্ত দ্রুত ও অব্যর্থ। প্রথম লোকটি তার পিস্তল তুলতে না তুলতে জগদীশের গুলি তার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

দ্বিতীয় লোকটার গুলি সম্ভবতঃ জগদীশকে বিদ্ধ করত কিন্তু পেপে যেন তার গায়ের ওপর পড়ে গেল, লোকটার লক্ষ্যও ব্যর্থ হল কিন্তু জগদীশের লক্ষ্য ব্যর্থ হল না।

তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ পেপে, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আর লোক আছে?

পেপে ইসারা করে জানাল আর নেই, জিরো অজ্ঞান, তোমরা এখনি পালাও।

পেপে কি কথা বলতে পারে না? তার জিভ কি কেটে নিয়েছে? হতে পারে। ভাববার এখন সময় নেই।

মেরিও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার জ্ঞান ফিরে আসছে। জগদীশ ছোরা দিয়ে বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে কাঁধে তুলে নিল। ডান হাতে রিভলভার নিয়ে যখন বেরোবার উপক্রম করছে তখন পেপে তাকে অন্য একটা সহজ পথ দেখিয়ে দিল।

মেরি জিজ্ঞাসা করল, জগদীশ তুমি কি করে জানলে আমি এখানে আছি? কি করে তুমি এই জায়গাটার সন্ধান পেলে?

সে সব পরে হবে, তুমি বরঞ্চ পিছনে নজর রাখ শয়তানটা আসছে কিনা। আমার দুঃখ হচ্ছে পেপের জন্যে। শয়তানটা পেপেকে মেরে ফেলবে।

কয়েক পা যেতে না যেতে মেরি চিৎকার করে উঠল, জিরো!

জগদীশের কাঁধে ভারি বোঝা। উচিত ছিল তখনি মাটিতে শুয়ে পড়া। ভীষণ বিপদ। শেষ রক্ষা বুঝি হল না। তবুও জগদীশ হঠাৎ একটু বেঁকে মেরিকে নামিয়ে দিয়েই বলল শুয়ে পড়।

জিরো গুলি ছুঁড়েছে কিন্তু জগদীশ নিক্ষিপ্ত গ্যাস থেকে জিরো তখনও মুক্ত হয় নি তাই তার লক্ষ্য ব্যর্থ হল। ততক্ষণে জগদীশও একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়েছে। রিভলভার হাতে জিরো তারই দিকে উন্মত্তের মতো ছুটে আসছিল। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়বার সুযোগ পেল না তার আগেই জগদীশের গুলি বুকে বিঁধল। পয়লা নম্বর শত্রু শেষ।

মেরি তুমি একটু বোসো; আমি একবার ভেতরটা দেখে আসি আর পেপেকেও দেখে আসি।

জগদীশ যা আশংকা করেছিল ঠিক তাই। পেপের লাশ পড়ে আছে। তার মাথায় গুলি।

মাত্র চারটে ঘর কিন্তু ঘরগুলোতে কোনো কাগজপত্র বা যন্ত্রপাতি কিছু পাওয়া গেল না। তবে ঘরগুলো নানারকম ফারনিচার দিয়ে সাজানো এবং কাবার্ড ভর্তি খাবার ও বোতল বোতল মদ রয়েছে।

জগদীশ অনুমান করল এটা তাহলে ওদের লুকিয়ে থাকবার আড্ডা। একটা হুইস্কির ফ্লাস্ক জগদীশ পকেটে পুরলো। একটা ঘরে একটা পোর্টেবল ট্রান্সমিটার ছিল। জগদীশ সেটা বিকল করে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই অপারেশন শেষ।

বাইরে এসে হুইস্কির বোতল খুলে মেরিকে একটু খাইয়ে দিল এবং নিজেও একটু খেল। বাকিটা সে ডলিকে উপহার দেবে।

মেরি বলল সে এবার হাঁটতে পারবে, ভাগ্যিস এখানে তৃতীয় কোনো মানুষ নেই নইলে এইরকম উলঙ্গ অবস্থায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

মেরির অবস্থা বুঝতে পেরে জগদীশ তার শার্টটা খুলে মেরিকে দিল। পাথর বেয়ে মেরিকে নিয়ে সাবধানে জগদীশ নিচে নেমে এল। ডলি অবশ্য অপেক্ষা করছিল। জগদীশ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হুইস্কির বোতলটা হাতে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার উপহার।

মেরি খুবই অসুস্থ। সমুদ্রের জলে অনেকক্ষণ ভেসেছে তারপর জিরোর উৎপীড়ন। মাঝে মাঝে কাঁপছে। অবিলম্বে ওর চিকিৎসার দরকার।

কলম্বো ফিরে ডলিকে জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, তোমার ভাল নার্সিংহোম জানা আছে? মেরিকে সেখানে ভর্তি করতে হবে।

ডলি তো কলম্বোরই মেয়ে। ভাল নার্সিংহোমের ঠিকানা তার জানা আছে। সারেং ওদের জন্যে ঘাটে অপেক্ষা করছিল। তার মোটর-বোট তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো, ভাড়াও মিটিয়ে দেওয়া হলো।

মেরিকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়ে জগদীশ হাইকমিশনে ফোন করে অবস্থা জানিয়ে বলল, নার্সিংহোমে যেন অবিলম্বে সিকিউরিটি গার্ড পাঠান হয়। মেরি পুনরায় অপহৃতা হবার সম্ভাবনা আছে।

নার্সিংহোমের কাজ মিটিয়ে বাইরে এসে ডলিকে বলল, এবার আমার শেষ পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হবে, তার আগে চল কিছু খেয়ে নি।

খাওয়া শেষ করে ডলি জিজ্ঞাসা করল, তোমার শেষ পর্যায়ের কাজটা কি?

দু'জন দুষমন এখনও বাকি আছে, তাদের শেষ করতে হবে, আশা করছি তাদের একটা জায়গাতেই পাব অথচ হাতে বেশি সময় নেই।

তাদের তুমি পাবে কোথায়?

সেইটে হচ্ছে সমস্যা, তুমি আমিনস কিচেন চেনো? সারেং আমিনের নাম করছিল? তার সঙ্গে দুষমনদের যোগাযোগ আছে।

চিনি তো কিন্তু সেখানে যেতে আমার ভয় করে? মাতাল সেলারদের আড্ডা। মেয়ে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঠিক আছে তুমি আমাকে দূর থেকে দেখিয়ে দেবে।

ডলি ঠিকই বলেছিল। আমিনস কিচেনে ঢুকতে না ঢুকতে জগদীশ টের পেয়ে গেল।

বাইরে থেকে মনে হলো বুঝি সে মাছের বাজারে এসে পড়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখল নানা দেশের নানা জাতের নাবিকের ভিড়।

নাবিকের সংখ্যাই বেশি কিন্তু কিছু লোক রয়েছে তারা অন্য পেশার ও ভিন্ন টাইপের। এরা কেউ হলো দালাল, কেউ চোরা চালানকারী আর কেউ স্রেফ গুণ্ডা।

জায়গাটা ভাল নয়। অর্ধবৃত্তাকার একটা কাউন্টারের ওধার থেকে একজন আধাবয়সী লোক গেলাসে মদ ভর্তি করে হাতে হাতে দিচ্ছিল।

লোকটার গায়ে একটা কালো ডোরাকাটা গেঞ্জি, পরণে লুঙ্গি, গলায় একটা রুমাল বাঁধা, মাথা ভর্তি টাক, গালের একপাশে বেশ লম্বা একটা কাটা দাগ।

নিঃসন্দেহে ছোরার দাগ।

কাউন্টারের সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই লোকটি ভুরু কুঁচকে জগদীশকে একবার দেখল, বুঝল লোকটা মদ খেতে আসেনি, কিছু মতলব আছে।

পুলিসের চর নয়। পুলিসের চরদের সে চেনে। শোনা যাক কি বলে?

জগদীশই প্রথম কথা বলল, আমি আমিন সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

তাকে কি দরকার? তুমি কে? তোমাকে নতুন দেখছি?

হ্যাঁ আমি নতুন। তুমিই কি আমিন সাহেব?

আমিন সাহেবকে বলবার কিছু থাকলে আমাকে বলতে পার?

তুমিই কি আমিন সাহেব?

বললুম তো তাকে কিছু বলবার থাকলে আমাকে বল।

তুমি যে পর্যন্ত না বলছ তুমি আমিন সাহেব কি না ততক্ষণ আমি কিছু বলব না কারণ ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

গোপনীয়? তাহলে এখানে সুবিধে হবে না, এই দিলোয়ার, লোকটাকে বার করে দে তো?

সুবিধে হবে না, যা বলছি তা শোনো নইলে আমিন খুব বিপদে পড়বে।

ততক্ষণে দিলোয়ার এগিয়ে এসেছে। একটা টুলে বসে মদ খাচ্ছিল। গেলাসটা নামিয়ে রেখে আর সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে তড়াক করে উঠে জগদীশের একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

জগদীশ অবশ্য এজন্যে তৈরি ছিল না, একটু বেসামাল হয়ে গেল কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে দিলোয়ারকে ধরে তাকে প্রায় তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই দৃশ্য দেখে একদল নাবিক হো হো করে হেসে উঠল। নাবিকদের হাসি দেখে টাকমাথার মাথায় খুন চেপে গেল। সে কাউন্টারের বাইরে বেরিয়ে এসে কোমর থেকে ফস করে একখানা আট ইঞ্চি চকচকে ছোরা বার করে জগদীশকে আক্রমণ করল।

জগদীশ ঝপ করে তার ছোরা ধরা ডান হাতের তলা বাঁ হাত দিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তার হাতটা সজোরে মুচড়ে দিল। লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, তার হাত থেকে ছোরাখানা পড়ে গেল।

জগদীশ এবার আর একটা প্যাঁচ কসে মেঝেতে দড়াম করে ফেলে দিল। আবার হাসি। এবার হুল্লোড়। কেউ কেউ এগিয়ে এসে জগদীশের পিঠ চাপড়ে দিল, কেউ বা মদের গেলাস এগিয়ে দিল।

লোকটা উঠে বলল, আমিই আমিন, কি বলবে বল।

সেটাতো আগেই স্বীকার করতে পারতে তাহলে তোমাকে এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হত না। কিন্তু এখানে এই হাটের মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

অ, তাই বুঝি। অ্যাই দিলোয়ার তুই কাউন্টারটা দেখ তো। দেখি মস্তানটা কি বলে, এস এদিকে।

কাছেই সিঁড়ি ছিল। সিঁড়ি দিয়ে আমিন এগিয়ে চলল, জগদীশ তাকে অনুসরণ করে চলল।

পর্দা ঠেলে আমিন একটা ঘরে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ। জগদীশ ঘরে ঢুকে দেখল খাটের ওপরে একটা সুন্দরী যুবতী শুয়ে রয়েছে।

আমিন তাকে বলল, এই রোজি তুই এঘর থেকে যাতো, আমরা কথা বলব।

রোজি উঠে জগদীশের দিকে একটু চেয়ে ফিক্ করে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জগদীশকে বসতে বলে আমিন নিজে একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল: কি বলবে বল?

জগদীশ কোনো ভূমিকা না করে বলল: স্যুটকেস কোথায় তৈরি হয়? জিরো আর জুডাসকে তুমি কটা স্যুটকেশ দিয়েছ?

স্যুটকেস? তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না, আমিন আমতা আমতা করে বলল।

বুঝতে পারছ না ? না ? বলতে বলতে জগদীশ উঠে গেল। তারপর আমিনের বুকের সামনে তার গেঞ্জি ধরে তাকে টেনে তুলে তার দুই গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় কসিয়ে দিল।

আঃ ছেড়ে দাও, আমিন বলল, আমি বলতে পারব না।

জগদীশ লক্ষ্য করল আমিন তার ডান হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছে। জগদীশ দ্রুত তার কব্জি চেপে ধরে হাতটা আর একবার মুচড়ে দিয়ে তার প্যাণ্টের পকেট থেকে ছোট একটা কোল্ট রিভলভার তুলে নিল।

আমিনের বুকে ধাক্কা দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। আমিন তখন বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের কব্জি টিপে ধরেছে। তার টাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

জগদীশ আবার বলল, এবার বলবে কি না ?

আমিন নির্বাক। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল।

জগদীশ দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল, রোজি, রোজি।

ডাকতে না ডাকতে শরীরে ঢেউ তুলে হাসতে হাসতে রোজি এসে হাজির। কি বলছ ডার্লিং ?

ব্র্যাণ্ডি আর সামান্য একটু জল নিয়ে এস, আর একটা গেলাস।

রোজি নাচতে নাচতে চলে গেল। একটা ছোট ট্রে করে ব্র্যাণ্ডির বোতল, গেলাস আর জল নিয়ে এল।

জগদীশ বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি আমিনকে খাইয়ে দিল। বোতল গেলাস ইত্যাদি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রোজি অপেক্ষা করছিল। এখন সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে উদ্যত হতে জগদীশ তাকে বলল :

যেও না রোজি, দাঁড়াও, ওগুলো নামিয়ে রেখে বোসো।

রোজি পায়ের ওপর পা তুলে একটা চেয়ারে বসল। জগদীশ আমিনকে বলল।

এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি কি জান বল।

আমিন মুখ গোঁজ করে বসে রইল। জগদীশ তখন এক কাণ্ড

করল। সে হঠাৎ তার সরু ছোরাখানা বার করে রোজিকে এক হাত দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে চেপে ধরে বলল :

আমিন তুমি যদি এখনও কিছু না বল তাহলে আমি ছোরা দিয়ে রোজির মুখ বিকৃত করে দেব, আগে ওর নাক কেটে নেব, আমার এই ছোরায় ক্ষুরের মত ধার।

রোজি কেঁদে উঠল। আমিন বোধহয় এতক্ষণে বিশ্বাস করেছে যে লোকটা সব পারে, ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন নিরাশ হয়ে বলল,

আমি কিছু বললে আমাকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে খুন করাবে। আমি কিছু বলতে ভয় পাই।

কে খুন করাবে ? জিরো ? তাহলে জেনে রাখ সে, তার দু'জন দেহরক্ষী আর পেপে মরেছে। পাইরেট আইল্যাণ্ডে গেলে তুমি এখনও তাদের লাশ দেখতে পাবে। এবার তোমার ভয় নেই তো ?

তুমি যে জিরোর নাম বললে তাকে দেখতে কেমন বল তো ?

জগদীশ জিরোর চেহারার বর্ণনা দিল। আমিন বলল, ওর নাম যে জিরো তা আমি জানতুম না, তোমার কাছে নাম জানলুম, তা দেখ স্যুটকেস কোথায় তৈরি হয় তা আমি জানি না। শহরতলীতে ডেভিড নামে হেলিকপ্টারের একটা পাইলট থাকে। সে আমাকে টেলিফোনে খবর দিলে আমি তার বাড়িতে যাই। সে আমাকে স্যুটকেস দিলে আমি সেটা আমার লঞ্চে তার রেড ড্রাগন বা গ্রেট বেয়ার জাহাজে তুলে দিয়ে আসি। ডেভিড পাইলট চালিয়ে জঙ্গলে পাহারের মধ্যে কোথাও যায়, সেখান থেকে স্যুটকেস এনে আমাকে দেয়।

স্যুটকেসে কি থাকে তুমি জান ?

জানি, কিছুই থাকে না, হালকা, আমি একটা খুলে দেখেছিলুম।

তুমি ক'টা স্যুটকেস পাচার করেছ ?

আমি তো ছ'টা স্যুটকেস পাচার করেছি।

রোজি তুমি যাও, আমিন তুমি আমাকে এখনি ডেভিডের কাছে নিয়ে চল, বাইরে আমার জিপ আছে, আমার সঙ্গে একটি মেয়েও যাবে।

এখনি ?

এখনি, দেখলে তো আমি চট করে রেগে যাই, ওঠ।

আমিন আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না। সে গলা থেকে রুমাল আর ডোরাকাটা গেঞ্জি খুলে একটা নীল রঙের টি শার্ট পরল আর একটা পরচুলা দিয়ে টাক ঢেকে নিয়ে বলল, চল।

বাইরে জিপে ডলি অপেক্ষা করছিল। আমিনকে নিয়ে জগদীশ পিছনের সিটে বসল। ডলিকে বলল, জিপ চালাতে। আমিনের নির্দেশমতো জিপ চলতে লাগল।

প্রায় কুড়ি মাইল যাবার পর রবার গাছের একটা জঙ্গলের ধারে জিপ থামল। সামনে একটা ছোট একতলা বাড়ি।

আমিন গাড়ি থেকে আগে নামল। জগদীশ তাকে অনুসরণ করল। ডলি গাড়িতে বসে রইল।

বাড়ির সামনে যেয়ে আমিন ডেভিড, ডেভিড বলে দু'বার ডাকতেই দরজা খুলে বেশ জোয়ান একজন লোক বেরিয়ে এল। পরণে শুধু একটি শর্ট প্যান্ট। জিজ্ঞাসা করল :

কি খবর ডেভিড ? হঠাৎ ?

ইনি কি বলবেন শোন ?

জগদীশ বলল, আমি এখনি পাইরেট আইল্যাণ্ড থেকে আসছি। জিরোর ট্রান্সমিটারটা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে জরুরী মেসেজ নিয়ে এখনি জুডাস ও ডঃ ম্যামলকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, হেলিকপটার কোথায় ?

ডেভিড প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে জানে আগন্তুক যেসব নামগুলি উচ্চারণ করল সেই নামগুলো বাইরের কারও জানার কথা নয়। জগদীশের কথা সে বিশ্বাস করল। জিজ্ঞাসা করল :

কখন যাবে ?

ইমিজিয়েটলি, এখনি যাব, তুমি রেডি হয়ে নাও।

এখনি ?

হ্যাঁ।

জিপে ডলি বসেছিল, তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডেভিড জিজ্ঞাসা করল ঃ

ঐ লেডিও যাবে নাকি ?

হ্যাঁ, ডঃ ম্যামলক তো লেডি ভালবাসেন সেইজন্যে ওকে নিয়ে যাচ্ছি, কেন ? তুমি জান না ?

দিল্লি থেকে আসবার সময় রামদাস শেঠী তাকে যে সব কাগজ-পত্তর দিয়েছিল তাতে ভাসা ভাসা ভাবে উল্লেখ ছিল যে জিরো, জুডাস এবং মরিস লক নারীভক্ত।

ডেভিড পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে এল। হাফ প্যাণ্ট আর শার্ট পরে এসেছে সে।

আমিনকে জগদীশ বলল, তুমি বাসে বা ট্যাকসিতে ফিরে যাও আমিন, আমাদের জিপ এখানে থাকবে, কারণ আমরা এখানেই ফিরে আসব। ডেভিড আমরা জিপটা কোথায় রাখব ?

আমিন বলল, এখানে ট্যাকসি পাওয়া যায় না, বাস ধরতে হলে আমাকে দু' মাইল হাঁটতে হবে তার চেয়ে আমি ডেভিডের ঘরে একটু ঘুমিয়ে নিই, তোমরা তো ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে আসবে ?

জগদীশ বলল, আমার কাজ সেখানে পনেরো মিনিট, ডেভিড তোমার যেতে আসতে কত সময় লাগবে ?

আমার টোটাল সময় লাগবে এখান থেকে স্টার্ট করে যাওয়া আসা নিয়ে বড়জোর এক ঘণ্টা, তাহলে চল আমরা জিপে উঠি, যেখানে হেলিকপটার আছে সেখানেই গাড়ি রাঁখবে, আমিন এই নাও আমার ঘরের চাবি নাও।

ওরা সকলে জিপে উঠল। ডেভিডের নির্দেশ অনুসারে ডলি

গাড়ি চালাতে লাগল। গাছের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। পাঁচ মিনিটের রাস্তা পার হতে দশ মিনিট লাগল।

রবার গাছের জঙ্গলের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গায় একটা শেড, তার ভেতরে হেলিকপটার রয়েছে। ডেভিড আসতে আসতে বলছিল যে এই সব রবার গাছ থেকে সামনের বছর থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা হবে, গাছগুলোর এখনও উপযুক্ত বয়স হয় নি।

হেলিকপ্টারে যেতে যেতে জগদীশ পাইলটের সঙ্গে আলাপ জমালো। যোসেফ পেরেজ ধরা পড়েছে এ খবর ডেভিড জানত না। ডেভিডের খবরও নাকি পুলিসের কানে পৌঁছেছে। যে মেয়েটাকে জিরো সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিল তাকে জিরো এখন পাইরেট আইল্যাণ্ডে আটকে রেখেছে। পেপে কড়া সাজা পেয়েছে। তাকে জিরো আটকে রেখেছে, আচ্ছা ডেভিড ওখানে ম্যামলকের স্যুটকেস তৈরির ল্যাবরেটরিতে যে আটজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল তারাই আছে তো ?

মুখ ফসকে ডেভিড বলে ফেলল, আটজনকেন ? দু'জন তো আছে, একজন গেটে আর একজন ডঃ ম্যামলকের ল্যাবরেটরির সামনে।

আর মেয়েগুলো গেল কোথায় ?

একটা মেয়ে আছে বোধহয়।

প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় হেলিকপটার নামল। চারদিকে ঘন অরণ্য। কাছেই বোধহয় একটা বড় ঝর্ণা আছে, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জগদীশ পরে শুনেছিল যে ঐ ঝর্ণা থেকে এই বদমাইসের দল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

ডেভিড অবাক হয়ে গেল ওরা এতসব কাণ্ডকারখারখানা শ্রীলংকা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে কি করে করছে ?

হেলিকপটার জমিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ ডেভিডকে আঘাত করে অজ্ঞান করে দিল। তারপর দুজনে হেলিকপটার থেকে নামল। এদিকে হেলিকপটারের আওয়াজ পেয়ে রাইফেল হাতে কোথা থেকে একজন গার্ড এগিয়ে এসেছে।

সামনে অপরিচিত আগন্তুক, চোখে প্রশ্ন।

জগদীশ বলল, আমরা জিরোর কাছ থেকে আসছি, ডঃ ম্যামলকের জন্যে একটা ব্যাটারি আনতে হয়েছে। তুমি একটু কাছে এস তো ? আমাকে একটু হেলপ কর, এটা নামাতে হবে, ডঃ ম্যামলক ল্যাবরেটরিতে আছে তো ? আর জুডাস ?

হ্যাঁ প্রফেসর ল্যাবরেটরিতে আছেন, জুডাস নেই, সে বুঝি কাল ইণ্ডিয়ার বিশাখাপত্তনমে গেছে।

ও হ্যাঁ, তাও তো বটে, জুডাস তো থাকবার কথা নয়, এই যে এদিকে এস।

গার্ডের মনে কোনো সন্দেহই হলো না। বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবে কারও সঙ্গে কথা বললে, চলাফেরা করলে কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না। অবশ্য সেই সঙ্গে একটু সাহসও দরকার।

ডলি ততক্ষণে নেমে পড়েছে। গার্ড তার রাইফেল নামিয়ে রেখে হেলিকপটারের কাছে এগিয়ে আসতেই জগদীশ অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে শরীরের কোথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে দিল।

ডলি তোমার পোশাকের নিচে তো বিকিনি পরা আছে আমি বুঝতে পারছি। তুমি তোমার পোশাক খুলে' হেলিকপটারে রাখ। তারপর ভেতরটা একটু দেখে এস।

ডলি পোশাকের নিচে সেদিন প্যান্টি আর ব্রা না পরে বিকিনি পরেই এসেছিল কারণ তার মতলব ছিল জগদীশের কাজ সেরে সে সুইমিং ক্লাবে যাবে।

যাইহোক জগদীশের কথা মতো সে পোশাক খুলে শুধু বিকিনি পরে অপেক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে পাইলটকে হেলিকপটার থেকে বার করে তাকে আর গার্ডকে টানতে টানতে নিয়ে যেয়ে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে দিল। আপাততঃ ওদের জ্ঞান হবার আশা নেই।

সামনে বেশ বড় সড় একটা শেড। টালির ছাউনি। দরজা

জানালা দেখা যাচ্ছে। ভেতরে বোধহয় অনেকগুলো ঘর আছে। টালির ছাদ ফুঁড়ে একটা এরিয়াল দেখা যাচ্ছে। এরিয়ালটা নিশ্চয় রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের।

জগদীশ সাহস করে বাড়ির ভেতর ঢুকল। ডলি তো আগেই ঢুকে গেছে। ডলির সাহসেরও প্রশংসা করতে হয়, তবে বিকিনি পরা তন্বী কোনো যুবতীকে কেউ সহসা আঘাত করবে না।

দরজার সামনে লম্বা করিডর, দুধারে পর পর ঘরের সারি। প্রথম দু তিনখানা ঘর শূন্য। পরের ঘরখানা থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে আসছে। দু'জন নারী কথা বলছে।

ভেতরে নারী আছে অতএব ভয় নেই। জগদীশ ঘরের ভেতরে ঢুকে চমকে গেল। একি? এখানে রোজি কি করে এল? কিন্তু জগদীশ তো বোকা নয়। সে বুঝল মেয়েটি নিশ্চয় রোজির যমজ বোন। কর্তাদের খুশি রাখবার জন্যে আমিন বোধহয় মেয়েটিকে উপহার দিয়েছে।

ডলি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করছে। মেয়েটির নাম ডেজি। রোজির বোন ডেজি।

অল্প সময়ের মধ্যেই ডলি কয়েকটা তথ্য জেনে ফেলেছে। এখানে এখন আর মাত্র দু'জন পুরুষ আছে একজন ডঃ ম্যামলক আর অপর জন তার ঘরের সামনে একজন গার্ড। আর এদের পাশের ঘরখানা ম্যামলকের অফিস ঘর।

জগদীশ ডেজি আর ডলিকে বলল ম্যামলকের ঘরের সামনে থেকে গার্ডকে দূরে কোথাও নিয়ে যেয়ে ফস্টিনষ্টি করতে। ইতিমধ্যে জগদীশ ম্যামলকের সঙ্গে মোকাবিলা করবে।

ডেজি বলল, গার্ডকে আমি এখনি যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু তাতে আমার লাভ কি?

জগদীশ তখন তাদের বিপদের কথা সংক্ষেপে বলল। এক্ষেত্রে ডেজি তাকে যদি সাহায্য না করে তাহলে জগদীশ তাকে হত্যা

করতে কুণ্ঠিত হবে না। আর যদি সাহায্য করে তাহলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

ডেজি ভয় পেয়ে গেল। সে তখনি ডলিকে ডেকে নিয়ে গার্ডের ঘরের দিকে গেল।

জগদীশ পাশের ঘরে গেল। এটা সত্যিই একটা অফিস ঘর। টেবিলের ওপর কয়েকটা টাইপ করা কাগজ ও ডায়েরি রয়েছে।

জগদীশ সেগুলো তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল। টাইপ করা একটা মেসেজ দেখতে পেল। এখান থেকে বোধহয় বেতারে বিশাখাপত্তনমে জুডাসকে পাঠান হয়েছে। তাতে লেখা আছে "ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে আর চব্বিশ ঘণ্টা টাইম দাও। জিরোকে মেসেজ পাঠাচ্ছি কিন্তু কোনো উত্তর পাচ্ছি না। ডেভিড এলে জিরোর খোঁজ নিতে পাঠাব। এইজন্যে এই টাইম দরকার কারণ জিরোর কোনো অর্ডার আমি এখনও পাই নি। ম্যামলক।"

মেসেজ পড়ে জগদীশ নিশ্চিন্ত হলো। আরও চব্বিশ ঘণ্টা মানে আগামীকাল।

টেবিলের একধারে চামড়ার কেসে ভরা একটা যন্ত্র দেখতে পেল। কে জানে কি যন্ত্র, নাড়াচাড়া না করাই ভাল। কেসের ওপর কতকগুলি সংখ্যা ও অক্ষর লেখা আছে যেমন জি ২০৭-এম ৩৩৩-২৯। যন্ত্রটাতে অনেকরকম সংখ্যা সাজানো রয়েছে। কে জানে কি যন্ত্র।

জগদীশ কি করে জানবে। এটাই হল সেই মাইক্রো-ইলেট্রনিক স্টাইলাস যার একটি সুইচ সরিয়ে দূরে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে স্যুটকেস বোমা ফাটানো যাবে।

যাইহোক নাড়াচাড়া করে জগদীশ যন্ত্রটা রেখে দিল। আর একটা টেবিলের ওপর একটা সাধারণ রেডিও দেখতে পেল কিন্তু ট্রান্সমিটার কোথাও দেখতে পেল না।

আপাততঃ ম্যামলকের সঙ্গে মোকাবিলা করে আসা যাক তারপর এই ঘর ভাল করে সার্চ করলেই হবে।

ডান হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে জগদীশ ম্যামলকের ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে চলল। ডলি আর ডেজি তখন গার্ডকে একটা গাছতলায় নিয়ে যেয়ে তার সঙ্গে রংতামাসা আরম্ভ করে দিয়েছে। গার্ড সব কিছুর অস্তিত্ব ভুলে গেছে।

ল্যাবরেটরিতে ম্যামলক একটা ডিজিট্যাল যন্ত্রে কতকগুলো সংখ্যার আনাগোনা লক্ষ্য করছিল। জগদীশের কাশির আওয়াজ পেয়ে নব ঘুরিয়ে যন্ত্র বন্ধ করে বলল,

হেলিকপ্টারের আঁওয়াজ পেয়েছিলুম, ভাবলুম বুঝি জিরো এল, ভালই হলো, তাকে আমার খুব দরকার। হেলিকপ্টারে তুমি এলে? তুমি নিশ্চয় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কোনো ঘাতক আমাকে হত্যা করতে এসেছ, তা বেশ তো একটু পরেই হত্যা কোরো।

সামনে উদ্যত- রিভলভার, তার শত্রু, লোকটা ভয় পাচ্ছে না। তাহলে নিশ্চয় কোনো যন্ত্র তার আয়ত্বে আছে যার সাহায্যে সে জগদীশকে বিপদে ফেলতে পারে।

ম্যামলকের পায়ের কাছে কি কোনো সুইচ আছে যেটা টিপে দিলে কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠবে। এবং ঘণ্টা শুনে রাইফেল গার্ড ছুটে আসবে? সে সম্ভাবনা অবশ্য নেই। ঘণ্টা বাজলেও গার্ড ছুটে আসবে না। ঘণ্টা শুনবে কে?

ম্যামলক যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই হাতলওয়ালা একটা বেশ বড় চেয়ার ছিল। চেয়ারের হাতল বেশ মোটা। ম্যামলক সেই চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, দুই হাত হাতলের ওপর রাখল, তারপর বলল,

তুমি যে একদিন আসবে তা আমি অনুমান করেছিলুম।

জগদীশের দৃষ্টি ম্যামলকের দুই হাতের দিকে।

ম্যামলক জিজ্ঞাসা করল,' তা তোমার আগমণের উদ্দেশ্যটা কি?

আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব, জগদীশ উত্তর দিল।

আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ? তা বেশ কিন্তু তুমি কি এই ঘর

থেকে বেরোতে পারবে ? নাকি তুমিই আমার অতিথি হয়েই এই ঘরে থেকে যাবে ?

জগদীশের এইবার সন্দেহ হলো এই ল্যাবরেটরির মধ্যে কোনো যান্ত্রিক কৌশল লুকনো আছে এবং সম্ভবতঃ সেটা চেয়ারের হাতলে কারণ ম্যামলক চেয়ার থেকে একবারও হাত তোলেনি।

ম্যামলক বলল, আর তুমি যদি আমাকে ধরেই ফেল তাহলেও তোমার কোনো কাজ হবে না কারণ তোমাদের ক্যালকাটা আমার আবিষ্কৃত স্যুটকেস বোমার ঘায়ে উড়ে যাবেই।

ভেরি সরি, ডক্টর ম্যামলক তোমার আশা পূর্ণ হবে না কারণ বোমা ফাটাবার তোমার সেই যন্ত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং তোমার ডায়াল করার সাংকেতিক সংখ্যা ও আমরা জেনে ফেলেছি, জি ২০৭-এম ৩৩৩-২৯ এগুলো নিশ্চয় তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

এসব তোমরা হস্তগত করেছ ?

শুধু তাই নয়, জিরো মৃত। তোমারও বেশি দেরি নেই এবং জুডাস যদিও এখন বিশাখাপত্তনমে আছে তাহলেও তার নিষ্কৃতি নেই।

ম্যামলক সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার মুখ লাল হল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

দেখা যাক কে হারে কে জেতে, বলতে বলতে ম্যামলক তার ডান হাত ঘুরিয়ে চেয়ারের হাতলের নিচে কি যেন খুঁজতে লাগল।

জগদীশ চিৎকার করে উঠল, নোড়ো না, হাত সরাও, মাথার ওপর দু' হাত তোলো।

ম্যামলক জগদীশের কথায় কান দিল না। জগদীশ ট্রিগার টিপল। গুলি লাগল ম্যামলকের বুকে। চেয়ারে সে ঢলে পড়ল।

জগদীশ চেয়ারের কাছে এসে দেখল হাতলের নিচে ঠিক টেলিফোনের ডায়ালের মতো ছোট একটা ডায়াল লাগানো রয়েছে এবং সেই ডায়াল থেকে চেয়ারের গা বেয়ে সরু তার মাটির দিকে নেমে গেছে। এটা একটা সিগন্যাল।

গুলির আওয়াজ হয়েছে। গার্ড নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে এবং

এখনি ছুটে আসবে। জগদীশ ল্যাবরেটরির বাইরে এসে দেখল যে গার্ডের বসবার জায়গার পাশে তার রাইফেলটি দেওয়ালে ঠেসানো রয়েছে। জগদীশ রাইফেলটি লুকিয়ে ফেলল। বাকি যা কিছু পরে ফিরে এসে দেখা যেতে পারবে। আপাততঃ কলম্বোয় ফিরে রামদাস শেঠীকে সব খবর জানাতে হবে এবং জুডাসকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

গার্ড গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল এবং সে ল্যাবরেটরিতে আসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু দুই মেয়ে তার দুই হাত ধরে রইল। গার্ডকে তারা বোঝাতে চাইল ওটা গুলির আওয়াজ নয়, অন্য কিছু।

বাড়ির বাইরে এসে জগদীশ ডলির নাম ধরে ডাকল। ডলি আর ডেজি তো এলই, সঙ্গে গার্ড।

জগদীশের হাতে উদ্যত রিভলবার দেখে গার্ড থেমে গেল। তাকে জগদীশ বলল, ঐদিকে ঝোপের মধ্যে তোমার বন্ধুও এই হেলিকপ্টারের পাইলট আছে, তুমি সেখানে যাও। ডলি তুমি হেলিকপ্টারে ওঠো, ডেজি তুমি এখন এখানে থাক, ডেভিড রইল, আমি আমিনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে তোমাকে নিয়ে যাবে, না, আপত্তি কোরো না।

ডলি বলল, না, ওকেও নিয়ে চল নইলে যে তিনটি পুরুষ এখানে থাকবে তারা ওকে নেকড়ের মতো ছিঁড়ে খাবে। জগদীশ অগত্যা রাজি হল।

তাহলে ডেজি ওঠো, আর দেরি করে লাভ কি? জগদীশ বলল।

জগদীশ মনে মনে আনন্দিত, তার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা সে পালন করে দেশকে বাঁচাতে পেরেছে।

ডলি ও ডেজিকে নিয়ে সে হেলিকপটারে উঠল। সে হেলিকপটার চালাতে জানে।

জগদীশদের কাজ কোনদিনই শেষ হয় না। একটা কাজ শেষ হলেই তাদের আর একটা নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। দেখা যাক জগদীশ আবার কোন কাজ নিয়ে মেতে উঠল।

মাত্র দুশো পাঁচ টাকার চেকখানা ব্যাংক থেকে ফেরত এল। জয়শংকর কাপুর বিস্মিত বিরক্ত ও রীতিমতো অপমানিত বোধ করল। তাঁর জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

অপরে তাকে চেক দিয়েছে, 'ফুল কভার নট রিসিভড' মার্কা মারা কাগজ লটকে সে চেক ফেরত এসেছে এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু জয়শংকর কাপুরের সই করা চেক আজ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি।

কলকাতায় আসার পর গ্রীনউড ফার্নিচার কম্পানিকে এই প্রথম চেক। উচ্চপদে আসীন আর্মি অফিসারের চেক নিতে গ্রীনউড ফার্নিচারের আপত্তি হয় নি এবং চেকটা ফেরত আসাতে তারাও কিছু মনে করে নি। ভেবেছিল কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, কারণ এই দুশো পাঁচ টাকা অগ্রিম মাত্র, ফার্নিচার এখনও ডেলিভারি দেওয়া হয় নি।

গ্রীনউড ফার্নিচার কম্পানির কাছ থেকে টেলিফোন পেয়ে জয়শংকর হতবাক। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলল :

—ঠিক আছে মিঃ ম্যানেজার, আমি আমার বেয়ারা দিয়ে এখনি ক্যাশ টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি তার হাতে চেকখানা ফেরত দেবেন।

—আরে মিঃ কাপুর আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি টাকা বরং ব্যাংকেই পাঠিয়ে দেবেন আমরা না হয় পরশুদিন চেকখানা ব্যাংকে পাঠাব। আপনি এ জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু জয়শংকর কাপুর ব্যস্ত না হয়ে পারে নি। সে তখনি ব্যাংকে টেলিফোন করেছে, ম্যানেজারকে বলেছে যে আজই তার

একটা স্টেটমেণ্ট চাই। ব্যাংক থেকে সে নিজে যেমন সই করে টাকা তুলতে পারত তেমনি তার স্ত্রী মেরি কাপুরও টাকা তুলতে পারত।

বেলা তিনটের মধ্যেই স্টেটমেণ্ট এসে গিয়েছিল এবং জয়শংকর বাড়ি ফিরেই স্টেটমেণ্টের সঙ্গে চেক বইয়ের মাথাগুলো মিলিয়ে দেখছিল।

অন্য সব উপলক্ষ্যে মেরি ঠিক ঠিক চেক কেটেছে কিন্তু দুটো মোটা টাকা তোলার কোনো কারণ সে খুঁজে পেল না। একটা হল আট হাজার টাকার আর অপরটা হল সাড়ে সাত হাজার টাকার। নিজের নামেই টাকাটা তুলেছে সে।

কিন্তু কেন?

মেরি এত টাকা তুলে কি করল। জুয়েলারি? তাহলে সে ফেরার পর মেরি নিশ্চয়ই তাকে দেখাত। তাছাড়া মেরির জুয়েলারিতে অত শখ নেই, আছেও যথেষ্ট। তাহলে কি ব্ল্যাকমেল?

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র জয়শংকর কাপুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাতেই সে দ্বিতীয় হয় নি। দ্বিতীয় হয় নি ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষাতেও। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে বেছে নিয়েছিল ফরেন সার্ভিস। ট্রেনিং শেষ হবার পরেই ভারত সরকার তাকে প্রথমে পাঠাল আরজেনটিনায়।

আরজেনটিনা তার খুব ভাল লেগেছিল। রাজধানী ব্যুয়নস আয়ারস ভারী সুন্দর শহর, দূতাবাসটিও ভারী সুন্দর। আরজেনটিনা থেকে কাপুরকে আনা হল প্যারিস, প্যারিস থেকে ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটনে তার পদোন্নতি হল, থার্ড সেক্রেটারি। এত অল্প বয়সে এবং এত দ্রুত নাকি আর কারও উন্নতি হয় নি। দুষ্ট লোকেরা তার সুদর্শন চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা অসাধারণ মেধাকে কোনো কৃতিত্ব দিতে চাইল না। তারা বলল যেহেতু জয়শংকরের

বাবা উমাশংকর কাপুর লোকসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী সেইহেতু জয়শংকরের এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এরকম নেপটিজিম অনেক ক্ষেত্রে হলেও জয়শংকরের ক্ষেত্রে একেবারেই হয় নি। কারণ নিন্দুকেরা উমাশংকর কাপুরকে চেনে না। উমাশংকর কাপুর অত্যন্ত কড়া মানুষ এবং নিজের ছেলের জন্যে কোথাও কোনো অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্যে তিনি কারও দ্বারস্থ কিছুতেই হবেন না।

জয়শংকর কাপুরকে ওয়াশিংটন থেকে আনা হয় লণ্ডনে। লণ্ডনে আসবার আগেই সেনেটর ব্যারি স্টুয়ার্টের মেয়ে মেরি স্টুয়ার্টের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়।

ব্যারি স্টুয়ার্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন ছিলেন। ভারতকে তিনি ভাল বেসেছিলেন। যুদ্ধের পর দেশে ফিরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে পরে সেনেটর নির্বাচিত হন। ভারতের কল্যাণের জন্যে তিনি সেনেটে অনেক লড়াই করেছেন। বিশেষ ডেলিগেশনের প্রতিনিধি হয়ে কয়েকবার ভারতে ঘুরেও গেছেন। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছিল.। নেহরু স্টেটসে গেলে ব্যারি স্টুয়ার্টের সঙ্গে দেখা করতেন।

এ হেন ব্যারি স্টুয়ার্টের ইচ্ছে ছিল তাঁর একটি জামাই যেন ভারতীয় হয়। বড় মেয়েটি বিয়ে করেছে একজন জাপানীকে, সে আছে টোকিওতে, স্বামী ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার, মেজ মেয়ে আছে বার্লিনে, তার স্বামী জার্মান, একটি ছোট কারখানার মালিক। তবুও সে কারখানায় চারশ লোক কাজ করে, আর এখন ছোট জামাই হল জয়শংকর কাপুর।

বার্লিন থেকে ভিয়েনা। জয়শংকর এখানে ফার্স্ট সেক্রেটারি।

ইতিমধ্যে ওদের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ওরা রেখেছে দাদামশাইয়ের নামে, ব্যারি কাপুর।

ভিয়েনায় থাকবার সময় জয়শংকর ভারত সরকারের কাছে এক

রিপোর্ট পাঠায়। ভারত থেকে চোরাপথে গাঁজা কি ভাবে ইয়োরোপে আসছে এবং তার মূল্য পরিশোধ বাবদ ইয়োরোপ থেকে কি ভাবে সোনা তুবাই হয়ে ভারতে যাচ্ছে যার ফলে ভারত হাজার হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে তারই এক বিস্তারিত রিপোর্ট সে পাঠাল। অবশ্য রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ার সিদ্দিকির অনুমতি নিয়েই সে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল।

এই রিপোর্ট পাঠাবার পর জয়শংকরকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান হল। না, জয়শংকরের রিপোর্ট পেয়ে ভারত সরকার তার ওপর বিরক্ত হন নি, বলেন নি যে কে তোমাকে এসব করতে বলেছে ? এ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ? বরঞ্চ বলেছেন যে এই রিপোর্ট সরকারের কাজে লাগবে। এ বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করছেন।

কিন্তু এই রিপোর্টের তিন মাস পরেই জয়শংকরকে নয়া দিল্লীতে ডেকে পাঠান হল।

টপ সিক্রেট দলিল দস্তাবেজ রাখবার জন্যে একটা আরকাইভ স্থাপন করবার জন্যে প্রতিরক্ষা বিভাগ এক প্রস্তাব করেছেন। ভারত সরকার এই রকম একটি আরকাইভের গুরুত্ব বুঝেছেন। এই সব টপ সিক্রেট দলিলপত্র বিভিন্ন মন্ত্রকই রক্ষা করে। সরকার স্থির করলেন যে এই সব টপ সিক্রেটের কাগজপত্র বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছে কাজের সুবিধের জন্যে রাখা থাকলেও একটি কেন্দ্রীয় আরকাইভ স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক টপ সিক্রেট কাগজের একটি করে ফোটোস্ট্যাট কপি এবং একটি করে মাইক্রোফিল্ম এই কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় পাঠাতে হবে।

ক্যাবিনেট স্থির করলেন যে এইরকম একটি মহাফেজখানা অবিলম্বে স্থাপন করা হবে। কিন্তু কে পরিকল্পনা রচনা করবে এবং সেই পরিকল্পনা কে রূপায়িত করবে ?

দক্ষ অফিসাররূপে জয়শংকর তখন খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রথম সারির একজন মন্ত্রী তার নাম প্রস্তাব করল। প্রস্তাব করার

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম গৃহীত হল। একজন একটু ক্ষীণ আপত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জয়শংকরের বৌ বিদেশী। কিন্তু বাকি সকলে সরবে হেসে ওঠায় প্রস্তাবকারী মন্ত্রী নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।

মন্ত্রীরা সরবে হেসে না উঠলে এবং সেই মন্ত্রী মহাশয় নিজেকে গুটিয়ে না নিলে বোধহয় ভাল করতেন। সমস্ত বিষয়টা বিস্তারিত ভাবে বিচার করলে বোধহয় ভাল করতেন।

দিল্লীতে আসবার পর প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বিষয়টি জয়শংকর কাপুরকে বুঝিয়ে দিলেন। বিদেশে জয়শংকর দশ বছরের ওপর কাটিয়েছে। বিদেশে তার আর থাকতে ভাল লাগছিল না কিন্তু ভারতে ফেরার আগ্রহ তার চেয়েও মেরির বেশি। সে ভারতে কয়েকবার বেড়িয়ে গেছে কিন্তু দীর্ঘদিন থাকে নি।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সাব্যস্ত হল যে ঐ কেন্দ্রীয় মহাফেজখানার নাম দেওয়া হবে ন্যাশনাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস বা আদ্যাক্ষর তিনটি নিয়ে সংক্ষেপে ন্যাড।

অপারেশন ন্যাড চালু হল। এ বিষয়ে প্ল্যান রচনা করবার ভার জয়শংকর কাপুরকে দেওয়া হল। টাকাও মঞ্জুর করা হল।

কলকাতার আলিপুরে ভারত সরকার কোনো এক উদ্দেশ্যে আট বিঘা জমির ওপর চারতলা মজবুত একটা বিল্ডিং তৈরি করিয়েছিলেন। যে উদ্দেশ্যে বিল্ডিং করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যের বর্তমানে আর প্রয়োজন না থাকায় এই বিল্ডিং জয়শংকরকে দেওয়া হল।

ভারি সুন্দর বাড়ি। বাড়ির চেয়েও বাগানটি আরও সুন্দর। বাগানটি আগে থাকতেই ছিল। মাঝখানে একটি পুরনো বাড়ি ছিল, সেই পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। দেশ বিদেশের নানারকম গাছ ছিল কম্পাউণ্ড ঘিরে। নানারকম ফুল ফুটত সে সব গাছে, তাছাড়া ছিল নানারকম মরশুমী ফুলের গাছ, টবে পাতাবাহারের গাছই কতরকম।

এই বিল্ডিং-এর হাতার মধ্যেই একধারে ছোট একটি দোতলা আউটহাউস ছিল। এই আউটহাউসেই জয়শংকরের থাকার ব্যবস্থা করা হল। বাড়ির বাইরের ফটকে কালো পাথরের ওপর লেখা হল ন্যাড বিল্ডিং। তার ওপর সুপরিচিত হলদে সাইনবোর্ড যার প্রথম লাইন হল প্রোটেকটেড প্লেস।

দেশবিদেশে কি প্ল্যান ও কি ভাবে এইসব অতি গোপনীয় দলিল ও নক্সা বা ফটোগ্রাফ ও মাইক্রোফিল্ম রক্ষা করা হয় জয়শংকর সেই সবের বিবরণী ও তথ্য সংগ্রহ করল। বাড়িখানি বড়, কিছু কিছু পরিবর্তন করা হল। কর্মী নির্বাচনেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল।

জয়শংকর দিনরাত্রি খেটে নিখুঁত প্ল্যান তৈরি করল। সামান্য কিছু পরিবর্তন করে সেই প্ল্যান সরকার গ্রহণ করলেন। ন্যাড চালু হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সিকিউরিটি বাক্স ভর্তি হয়ে গোপনীয় কাগজপত্র আসতে লাগল। সেগুলি আবার যথাযথভাবে চিহ্নিত ও ইনডেক্স করে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নানারকম যান্ত্রিক কৌশল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোনো চোরের পক্ষে একটুকরো কাগজও অপহরণ করা বিপজ্জনক।

এক বছর হল ন্যাড চালু হয়ে গেছে।

একটা বিশেষ ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে জয়শংকর তিন মাসের জন্যে রাশিয়া গেল। মেরি আর ব্যারি, মা আর ছেলে আলিপুরেই থাকবে। জয়শংকরের মাইনে ব্যাংকে জমা দেওয়া হবে। অফিস থেকেই ব্যাংকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বেতন ছাড়া জয়শংকরের নিজস্ব টাকাও ব্যাংকে জমা ছিল। ব্যাংকে ওদের দুজনের নামেই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। ওরা দুজনে পৃথক পৃথকভাবে টাকা তুলতে পারত।

রাশিয়া থেকে জয়শংকর ফিরে এল। ঠিক তিন মাসের মাথায় হয় নি, আরও কয়েকদিন লেগে গেল। ফেরবার পথে ওকে দিল্লীতে

নামতে হয়েছিল। রিপোর্ট দিতে ও কিছু পরামর্শ করতে দিল্লীতে কয়েকদিন থেকে যেতে হল।

বাড়ি ফিরে মেরির ব্যবহার জয়শংকরের ভাল বলে মনে হল না। কেমন যেন ছাড় ছাড় ভাব। জয়শংকর বুঝতে পারল না কেন এমন হল। মেয়েদের ব্যাপার। শারীরিক গণ্ডগোলের জন্যে অনেক সময় ওদের মেজাজ ঠিক থাকে না। জয়শংকর ভাবল এরকম কিছু হয়ে থাকবে হয় ত।

একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখল মেরি কোথায় বেরিয়ে গেছে। ব্যারি বাগানে খেলা করছে। জয়শংকর একা। পোশাক বদলে এ ঘর ও ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দেখল সব ঘরেই কিছু কিছু বই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওর নিজস্ব দুটো বুককেস আছে, সে দুটো বইতে ঠাসা। এই বইগুলি এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকলে দরকারের সময় পাওয়া যাবে না। এইগুলিকে এক জায়গায় রাখা দরকার।

জয়শংকর পরদিন সকালে বেরিয়ে গ্রীনউড ফার্নিচার কম্পানিতে যেয়ে একটা বুক কেসের অর্ডার দিয়ে দুশো পাঁচ টাকার চেক দিল। এবং সেই চেকই ফেরত আসাতে বিস্মিত।

আজকাল কোনোদিনই বিকেলে মেরি বাড়ি থাকে না। জয়শংকর বাড়ি ফিরে মেরিকে দেখতে পায় না। সন্ধ্যার পর ফেরে, কোনো কোনো দিন রাত্রিও হয়। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না।

মেরির চরিত্র দোষ হয়েছে, এমন কথা জয়শংকর মানতে রাজি নয়। তাহলে সে যায় কোথায়, কি করে? কিছু বলে না কেন? স্ত্রীলোকের চরিত্রদোষ হলে যে সব লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা যায় সে সব লক্ষণ মেরির মধ্যে অনুপস্থিত।

মেরি বিকেলে বাড়ি থাকে না। ফিরতে কখনও কখনও রাত্রি করে ঠিকই কিন্তু স্বামীর প্রতি তার প্রেম কিন্তু অটুট রয়েছে। বিকেল থেকে বড় জোর রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিচ্ছেদটুকু বাদ দিলে জয়শংকরের অভিযোগ করবার আর কিছু থাকে না।

মেরির হিসেবের কোনো খাতা নেই তবে দোকানদারদের বিল আছে। দোকানদারদের ফোন করে জানা গেল তাদের কারুও টাকা বাকি নেই।

তাহলে মেরি এত টাকা খরচ করল কি বাবদে? ব্যাংকে আরও টাকা থাকলে সে টাকাও হয়ত মেরি খরচ করত। কিন্তু মেরি কি বলবে?

টেলিফোন বেজে উঠতে জয়শংকর চমকে উঠল। টেলিফোনে কথা বলে ঘড়ি দেখল সাতটা বেজে গেছে। ব্যারি কখন বাড়ি ফিরে পড়তে বসেছে। তার টিচার মিস মজুমদার কখন এসেছেন জয়শংকর কিছুই টের পায়নি।

জয়শংকর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসল। তার মনে নানা চিন্তা। অনেকক্ষণ পরে ব্যারির ডাকে তার চমক ভাঙল।

—বাবা খাবে?

—খাব ত কিন্তু তোমার মমি যে এখনও এল না, একটু ওয়েট কর ব্যারি।

—ঠিক আছে তাহলে ববি আমি ততক্ষণ টার্গেট প্র্যাকটিস করি। তুমি যে ছোট ছোট তীরগুলো আর বুলস আই এনে দিয়েছ তাই দিয়ে, অ্যাঁ?

ব্যারি মাকে বলে মমি আর বাবাকে বলে ববি।

—ঠিক আছে তাই কর।

জয়শংকর কাপুর আবার মেরির কথা চিন্তা করতে লাগল। সত্যিই কি মেরিকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে? মেরির কি কোনো পূর্ব ইতিহাস আছে? কিন্তু মেরি ত সে কথা স্বীকার করে না,

সে জিজ্ঞাসা করেছিল। মেরিকে বলেছিল ; তোমার যদি সে রকম কিছু ঘটে থাকে তাহলে আমাকে নির্ভয়ে ও অকপটে বলতে পার। আমি রাগ করব না কারণ যে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছে তার মোকাবিলা করতে না পারলে তার চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাবে।

কিন্তু অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেরি কিছুই স্বীকার করে নি। তাছাড়া সে মাঝে মাঝে কোথায় চলে যায় কাউকে কিছু বলেও যায় না। জয়শংকর দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। এ থেকে মুক্তি কি করে পাওয়া যেতে পারে। সে বসে বসে ভাবতে লাগল।

টেলিফোন বেজে উঠল। জয়শংকর রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো।

—কে, জয়, শোনো।

—হ্যাঁ, কি বল, মেরির স্বরে ক্লান্তির সুর, কোথা থেকে কথা বলছ? তাড়াতাড়ি এস, বাচ্চার ক্ষিদে পেয়েছে।

—ঠিক আছে আমি দশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।

—ফোন করছিলে কেন? কিছু দরকার আছে।

—দরকার আর কি, এই দেরি হয়ে যাচ্ছে, ডিনার টাইম পার হয়ে গেল। তোমরা ভাবতে সেই জন্যে, আচ্ছা আমাকে কেউ ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ, রুবি ফোন করেছিল।

—কিছু বলেছে?

—না, কিছু বলে নি।

—আচ্ছা, তুমি কিছু ভেবো না। আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই যাচ্ছি।

মেরি ফোন ছেড়ে দিল। জয়শংকর ফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারি ছুটে এল।

—কে ফোন করছিল ববি? মমি? কখন আসবে?

—মমি এখনি আসবে, সে টেন মিনিটস্।

—মমি বড় দেরি করে। জান ববি তুমি যখন এখানে ছিলে না তখন মমি মাঝে মাঝে ফিরতে বড় দেরি করত। আমি মমির জন্যে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। এক একদিন দিনের বেলাতেও লাঞ্চের সময় মমিকে পেতাম না। একা থাকতে ভাল লাগত না, আমার ক্লাসমেট সঞ্জীব মেননকে ডেকে আনতাম।

ব্যারি কোনো অভিযোগ করছে না। কিন্তু তার স্বরে রয়েছে বিষাদ। চাপা অভিমান।

জয়শংকর কোনো উত্তর দিল না। মনে মনে সে মেরির ওপর খুব বিরক্ত হল।

দশ মিনিট পার হয়ে আধ ঘণ্টা হতে চলল, ঘড়ির বড় কাঁটা সাড়ে নটার ঘর পার হয়ে যাচ্ছে। ব্যারি হাই তুলছে দেখে জয়শংকর বলল চল ব্যারি আমরা খেয়ে নিই। ওরা খেতে বসল। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন কিছু দূরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল। বোধ হয় গেটের কাছে কিন্তু কম্পাউণ্ডের ভেতরে ত গাড়ি আসবার রাস্তা আছে। গেট খোলাও আছে। রাত্রি বারোটার আগে গেট বন্ধ হয় না, তবে কে এলো?

জয়শংকর যখন তোয়ালেতে হাত মুখ মুছে তখন মেরি ঘরে ঢুকল। মেরি শাড়ি পরে না। প্রায়ই রঙিন খদ্দরের কিংবা মুর্শিদাবাদ সিল্কের ফ্রক পরে। তাকে ভালই দেখায়। সুন্দরী ত।

জয়শংকর জিজ্ঞাসা করল। কি গো কোথায় ছিলে? বললে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি, এদিকে ত এক ঘণ্টা হয়ে গেল কোথায় আটকে গিয়েছিলে।

—দেখ আমাকে বিরক্ত কোরো না, আমি খুব ক্লান্ত।

—কি আশ্চর্য, তুমি বেরিয়েছ সেই বিকেলে, ফিরতে দেরি করছ, নিজেই ফোন করলে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি, দশ মিনিটের জায়গায় তুমি এক ঘণ্টা করলে। আমি অন্যায়টা কোথায় করলাম।

—তাতে কি পৃথিবী উল্টে গেছে নাকি, ইউ আর গেটিং অন মাই নার্ভস মিঃ কাপুর।

—মেরি একটু সংযত হয়ে কথা বলতে শেখ। তোমার স্নায়ু-বিকার ঘটাবার মতোই তোমায় কিছুই বলা হয় নি বরঞ্চ ইউ আর গেটিং অন মাই নার্ভস।

—তাই নাকি। দেন লেট আস ডিভোর্স, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াই ভাল। বলতে বলতে মেরি নিজে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

মেরির কেন এমন হল? ও ত এরকম ছিল না, এমনি ত বেশ ভালই থাকে, ঠিক ঠিক ঝি চাকর খাটায়। ব্যারির দেখাশোনা করে। কিন্তু রাত্রে যদি ফিরতে দেরি করে এবং যদি প্রশ্ন করা যায় এত দেরি করলে কেন তাহলেই ক্ষেপে যায়।

তবে মেরির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না সে দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রেমে পড়েছে। মেরির প্রকৃতি সেরকম নয় বলে মনে হয়, তরুণ বয়সে এমন সব কাফলাভ ঘটে কিন্তু মেরি এখন পরিণত, ছেলের মা। তার জীবনে এমন দুর্ঘটনা নিশ্চয় ঘটেনি। কিন্তু মেরি নিজে কিছু না বললেও তাকে আজ বেশ বিচলিত মনে হল।

কিন্তু একটা মুশকিল হয়ে গেল। মেরি দেরি করে বাড়ি ফিরলে এবং কারণ জানতে চাইলে মেরির রাগ হয়। সেরাত্রে সে খেতে চায় না। শেষ পর্যন্ত জয়শংকরকে তার মানভঞ্জন করতে হয় তখন সে খায়।

আজ যা হয় হবে, আজ আর ও মেরিকে খাবার জন্যে খোসামোদ করবে না। একটু কড়া হওয়া দরকার। কড়া হয়নি বলেই মেরি খুব বেড়ে গেছে।

মেরি নিজের ঘরে ঢুকে আলো জেলে চারদিক একবার দেখে নিল তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে সিল্কের ফ্রক খুলে ভাঁজ করে

তুলে রাখল। ফ্রকের নীচে একটা স্লিপ ছিল, সেটা খুলল না, সেইটে পরে শুয়ে পড়ল।

প্রতিদিন শুতে যাবার আগে জয়শংকর সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্টকে একবার ফোন করে জেনে নেয় ঠিক ভাবে গার্ড পোস্টিং করা হয়েছে কিনা। অ্যালার্ম সিস্টেম টেস্ট করা হয়েছে কি না। এক একদিন সে নিজে গিয়েও সব দেখে আসে। আজ আর ভাল লাগছিল না।

সে উঠে যখন কোণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন ফোন বেজে উঠল। ও রিসিভার তুলে বলল। হ্যালো,

ওপারে নারীকণ্ঠ বলল

—দয়া করে একটু ধরুন, আপনার ফোন আছে।

দু সেকেণ্ড পরে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর, কর্তৃত্বের সুরে জিজ্ঞাসা করল

—মিসেস কাপুরকে ডেকে দিন ত।

—আমি মিঃ কাপুর কথা বলছি! মিসেস কাপুর অসুস্থ, তিনি শুয়ে পড়েছেন।

—তাই নাকি?

লোকটার কথা বলার ধরন জয়শংকরের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল

—আপনি কে?

—আমি ইনসান।

—আরে ইনসান ত সবাই কিন্তু আপনার নামটা কি।

ঐটেই আমার নাম কিন্তু মিসেস কাপুরকে কখন পাওয়া যাবে।

জয়শংকর শেষ পর্যন্ত শুনল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল। তারপর ও সিকিউরিটিকে ফোন করে শুতে গেল।

আজ আর সে খাবার জন্যে মেরিকে খোসামোদ করল না।

াতি রাত্রের মতো ঘুমোবার আগে মেরিকে কিস করল না। মেরি পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে আছে। গায়ের স্লিপ ছোট, পা ছুটি সবটাই নিরাবরণ, নির্লোম ফর্সা পা যেন মোমের তৈরি।

জয়শংকর পাশের খাটে শুয়ে পড়ল।. মেরি কি কিছু বলবে? না সে কিছু বলল না। জয়শংকর নিজেই জিজ্ঞাসা করল।

·—কে ফোন করেছিল তুমি ত জানতে চাইলে না।

—জানতে চাইনি এইজন্য যে তুমি নিজে বলবে বলে, এইটুকু ভদ্রতা তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি।

—হ্যাঁ, তোমারই ফোন, কে একজন ইনসান ফোন করেছিল, ইনসানই নাকি তার নাম। হিন্দু না মুসলমান না সাহেব কিছু বুঝলাম না। ইংরেজিতে কথা বলছিল।

—ইনসান ফোন করেছিল? তুমি ঠিক শুনেছ?

—হ্যাঁ, ঠিক শুনেছি, কারণ ইনসান কথার অর্থ হল মানুষ। আমি ভাবলাম লোকটা বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তার নামটা কি?

—হ্যাঁ, ওর নামই ইনসান।

কথা বলে মেরি খাট থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

বাথরুমের দরজার মাথায় ভেন্টিলেটর থাকায় বাথরুমের দরজা বন্ধ করলেও ভেতরের সমস্ত আওয়াজ পাওয়া যায়।

মেরি বাথরুমে ঢুকে বেরিয়ে এল। পরনে হাউসকোট। ইজের ব্রেসিয়ার আর স্লিপটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। আলনার পাশে বেতের বাস্কেটে সেগুলো ফেলে রাখল। পরদিন সকালে ঝি সেগুলো সাবান দিয়ে কেচে দেবে।

তারপর ও নিজের রাইটিং টেবিলের সামনে বসে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কি যেন লিখে কাগজ ভাঁজ করে হাতে নিয়ে আবার বাথরুমে ঢুকল।

ছু তিন মিনিট কোনো আওয়াজ নেই।

জয়শংকর ভাবছিল যে মেরি হয়ত বাথরুম থেকে গা ধুয়ে কিচেনে যেয়ে নিজেই কিছু খাবে আর যদি বাইরে থেকে খেয়ে এসে থাকে তাহলে হয়ত মাথা ধরেছে।

বাথরুমে মেডিসিন ক্যাবিনেট থেকে অ্যাসপিরিন খেতে গেছে। অমন সে মাঝে মাঝে খায়।

কিন্তু মেরির দেরি হচ্ছে কেন? মনে হল যেন কল খুলে গ্লাসে দুতিন বার জল নিল। ব্যাপার কি?

কাল রাতেও দুজনে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। মেরি বলেছিল সে সুইসাইড করবে। স্লিপিং পিল খাচ্ছে না ত?

খুট্‌স করে বাথরুমের দরজা খুলে গেল। মেরি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। হাউসকোটটা তার হাতে। সেটাকে আলনায় ফেলে দিয়ে আলনা থেকে পাজামা সুট টেনে নিয়ে পরে খাটে শুয়ে পড়ল।

জয়শংকর আর শুয়ে থাকতে পারল না। সে উঠে বসে মেরিকে জিজ্ঞাসা করল।

—মেরি বাথরুমে ঢুকে তুমি কি খেয়ে এলে? অ্যাসপিরিন না স্লিপিং ড্রাগ।

—স্লিপিং পিল।

—স্লিপিং পিল? কটা?

—শিশিতে যে কটা ছিল সব কটা।

—সে কি? তুমি কি সর্বনাশ করতে চলেছ?

মেরি কোনো জবাব দিল না। যা ঘটে ঘটুক, এইরকম একটা ভাব নিয়ে সে তার স্বামীর দিকে চাইল। জয়শংকর বাথরুমে ঢুকল। মেডিসিন ক্যাবিনেট থেকে স্লিপিং পিলের শিশি বার করে দেখল শিশি খালি। শিশিতে তিরিশটা ট্যাবলেট থাকে। তিরিশটাই ট্যাবলেট ছিল কি না কে জানে। শিশিটা আবার যথাস্থানে রাখতে রাখতে শেলফে রাখা একখানা ছোট চিঠি তার নজরে পড়ল।

জয়, আমাকে ক্ষমা করো। এ ছাড়া
আমার আর কোনো উপায় ছিল না।
পুলিসকে বোলো তোমরা দায়ী নও।
ব্যারিকে দেখো। তোমাদের আমি
আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে গেলাম।

মেরি

এই চরম পথ বেছে নেবার কারণ কি? ঐ ইনসান নাকি কে টেলিফোন করেছিল শুনেই ত মেরি উঠে বাথরুমে উঠে গেল।

মেরির এখনও জ্ঞান আছে। সে মেরির কাছে ছুটে এল।

—মেরি, তুমি এমন কাজ করতে পার না, আমাকে না হয় বাদ দিলে কিন্তু ব্যারি কি দোষ করল।

মেরি কোন উত্তর দিল না।

—তুমি আমার সঙ্গে উঠে এস।

মেরির হাত ধরে জয়শংকর টানল কিন্তু মেরি উঠবার কোনো চেষ্টাই করল না। তখন সে দুহাত দিয়ে মেরিকে তুলে নিয়ে ব্যারির ঘরে নিয়ে গেল। ব্যারি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রশান্ত ঘুম।

—ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ। ওকে ছেড়ে তুমি মরতে পার?

তবুও কোনো উত্তর নেই। মেরি হাত পা ছুঁড়তে লাগল। জয় তাকে নামিয়ে দিল। নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরি বাথরুমে ঢুকে বমি করবার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলের মুখ দেখে সে ভেঙে পড়েছে। ছেলেকে ছেড়ে সত্যিই মরা যায় না। ছেলেকে কার কাছে দিয়ে যাবে?

জয়শংকর আর দেরি করল না। ব্যারি তখনও ঘুমোচ্ছে। জয়শংকর এসে ডাক্তারকে ফোন করল। ডাঃ বিকাশ কর শুয়ে পড়লেও তখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি। তিনি শুয়ে শুয়ে একটা মেডিকেল জার্নাল পড়ছিলেন। খাটের পাশেই ফোন থাকে।

জয়শংকর তাকে সমস্তই বলল।

—কটা স্লিপিং পিল খেয়েছে মনে হয়?

—তা বলতে পারি না। শিশিতে তো থাকে তিরিশটা, মেরি বলছে প্রায় সবগুলোই খেয়ে ফেলেছি।

—আপনি ওকে এখনি হসপিট্যালে নিয়ে যান, স্টম্যাক পাম্প দেওয়া দরকার।

—আপনি আসবেন না?

—দেরি হয়ে যাবে, মিসেস কাপুরের কোমা আরম্ভ হলে বাঁচানো কঠিন, আমি কি অ্যামবুল্যান্সকে ফোন করে দোব।

—দরকার হবে না আমার গাড়ি আছে।

—তাহলে আপনি এখনি তাই করুন।

জয়শংকর সিকিউরিটিকে ফোন করে গাড়ি আনাল। ব্যারিকে তুলে বলল মাকে নিয়ে সে হসপিট্যাল যাচ্ছে। কিছু ভয় নেই। আয়া তার ঘরে ঘুমোবে। মা বোধ হয় রাত্রে হসপিট্যালে থাকবে কিন্তু সে ফিরে আসবে। ব্যারি কিছু বলল না। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাড়িতে উঠে জয়শংকর ঠিক করল সে হসপিট্যালে যাবে না। কোনো কারণে যদি হসপিট্যালে চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায় তাহলে মেরিকে আর বাঁচানো যাবে না। সে মেরিকে নিয়ে গিয়ে তুলল তার পরিচিত ফ্লোরেন্স নার্সিংহোমে।

ফ্লোরেন্স নার্সিংহোম একটি ছোটখাটো হসপিট্যাল বিশেষ। অতি আধুনিক। দক্ষ চিকিৎসক ও যোগ্য নার্স ও কর্মতৎপর কর্মীরা আছে এই নার্সিংহোমে। এর তুল্য নার্সিংহোম বোধ হয় কলকাতায় আর নেই। এখানে সব রকম চিকিৎসাই হয়।

হাসপাতালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেরির চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে গেল। নাম ঠিকানা পরে লেখা হবে, টাকা পয়সার কথাও পরে। কর্তৃপক্ষ জানে যে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাই কেবল এই হাসপাতালে আসে।

মেরিকে নার্সিংহোমের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক ঘণ্টা পরে একজন নার্স এসে বলল যে মিঃ কাপুর বসে থেকে কি করবেন? তাঁর কিছু করবার নেই। তিনি বাড়ি যেতে পারেন। তাঁকে রাত্রে দরকার হবে না। নার্স জয়শংকরের ফোন নম্বর লিখে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

পরদিন সকালে জয়শংকর নার্সিংহোমে এসে ওয়েটিং হলে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। রিসেপশন ডেসকে সে শুধু এইটুকু খবর পেয়েছে যে মেরি এখন বিপদ থেকে মুক্ত কিন্তু সে যেন অপেক্ষা করে। ডাক্তারবাবু তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

রিসেপশনে গিয়ে আর একবার খোঁজ নিয়ে এল আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রিসেপশন ডেস্কের মহিলা ক্লার্ক কাকে যেন ফোন করে বলল: আপনি যাবেন না। বসুন, ডাক্তারবাবু আপনাকে কয়েক মিনিট পরে ডাকবেন।

সামনের টেবিলে খবরের কাগজ ও কিছু পত্রিকা ছিল। হাতে নিয়েও জয়শংকর রেখে দিল। ভাল লাগল না। আবার টেবিলের ওপর রেখে দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে মেরির কথা ভাবতে লাগল।

মেরি কেন সুইসাইড করতে গেল? কারও স্ত্রী সুইসাইড করলে দোষটা পড়ে স্বামীর ওপর। সকলে ধরে নেয় যে স্বামীই দোষী। স্ত্রীর ওপর নিশ্চয় অত্যাচার করত। অবশ্য সে কলকাতা আসার পরই তারই এক বৌদি তাকে বলেছিল যে সুন্দরী যুবতী বৌকে বাড়িতে একা ফেলে বেশিদিন বাইরে থাকতে নেই।

বৌদি হয়ত ঠাট্টার ছলেই বলে থাকবেন কারণ মেরির প্রকৃতি সে রকম নয়। তাছাড়া সে ত বেশিদিন বাইরে ছিল না। মাত্র তিন মাস। লোকে কি যে সব বলে আর সে নিজেও যা তা কি

সব ভাবছে। ওসব হতেই পারে না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা অটুট আছে, অটুট থাকবেও। সাদা কোট পরে একজন ছোকরা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল : আপনিই মিঃ কাপুর ?

—হ্যাঁ,

আমি ডঃ বিশ্বাস, আমার সঙ্গে আসুন

জয়শংকর ডাঃ বিশ্বাসের সঙ্গে বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল।

—আমার স্ত্রী কেমন আছে ডক্টর বিশ্বাস ?

—প্রাণে বেঁচে গেছেন এই পর্যন্ত কিন্তু খুবই দুর্বল।

ডাঃ বিশ্বাস জয়শংকরকে নিয়ে এসে একটা চেম্বারের সামনে থামল। সামনে ঘসা কাঁচের দরজা বন্ধ। দরজার মাথায় লেখা আছে ডঃ এস. পি. ধর। বিশ্বাস তার আঙুল দিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করল। ভিতর থেকে উত্তর আসতেই বিশ্বাস জয়শংকরকে নিয়ে চেম্বারের ভেতরে ঢুকল।

সাদা পোষাক পরা বিরাট চেহারায় একজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসে কি লিখছেন। চোখে পুরু লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমা। মাথা ভর্তি টাক, বুক পকেটে কলম, পেনসিল ও বলপেন। ছোট ছোট অথচ পরিষ্কার করে পেনসিল দিয়ে কি লিখছিলেন।

বিশ্বাস বলল : ডক্টর এস. পি. ধর 'সাইকিআটরিষ্ট' আপনি এ র সঙ্গে কথা বলুন।

—এক মিনিট মিঃ কাপুর, আর দু লাইন বাকি আছে, সিগারেট ?

জয়শংকর সিগারেট নিল না। সে চুপ করে বসে চেম্বারের চারদিক দেখতে লাগল। দিল্লীতে তাকে একজন সাইকিআটরিষ্ট পরীক্ষা করেছিল। সে সাইকিআটরিষ্টের পরনে ছিল মিলিটারি ইউনিফরম কিন্তু এর পরনে রয়েছে সাদা স্যুট। মনের রোগের ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে।

লেখা শেষ করে ডক্টর ধর বললেন :

—আমি মিসেস কাপুরকে আজই কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম, উদ্দেশ্য সফল হল না বলে মিসেস্ কাপুর দুঃখিত।

জয়শংকরের মুখ শুকিয়ে গেল। মুখ নিচু করে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কেন? মেরি এমন কথা বলবে কেন? সে ভাবতে লাগল।

—কিন্তু মিঃ কাপুর আপনি নিরুৎসাহ হবেন না। একথাও তিনি বলেছেন যে তাঁর সুইসাইড করার চেষ্টা পারিবারিক কোনো কারণ নয়; স্বামীর প্রতি তাঁর ভক্তি বা ভালবাসা কিছুই শিথিল হয় নি, ছেলের প্রতিও তার স্নেহ অটুট আছে।

—তাহলে কারণটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না, মেরির ত অভাব কিছুরই নেই।

—বুঝেছি, কিন্তু মিঃ কাপুর আপনার স্ত্রী সুইসাইড করবার জন্যে আবার চেষ্টা করবেন।

—তাহলে আপনি কি করতে চান, কাপুর জিজ্ঞাসা করে।

—আমরা চিকিৎসা করতে চাই।

—কিছু ওষুধ আছে নাকি?

—হ্যাঁ, ওষুধ কিছু আছে। তাও দেওয়া হবে কিন্তু আসল চিকিৎসা হবে অন্যরকম, ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্ট বলতে পারেন। ডঃ ধর বললেন।

—ভয়ের কিছু আছে নাকি?

—না ভয়ের কিছু নেই, এমনকি একটা চিকিৎসা যে করা হচ্ছে আপনার স্ত্রী বুঝতেই পারবেন না, একটা ইঞ্জেকশন দেব তারপর দেব অতি মৃদু ইলেকট্রো-শক। তারপর আপনি মিসেস কাপুরকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, দুদিন অন্তর আমার কাছে চার পাঁচ বার নিয়ে আসবেন তারপর উনি ঠিক হয়ে যাবেন, কোনো চিন্তা নেই, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এখন দেখা করবেন?

—হ্যাঁ, একবার দেখা করতে পারলে ভাল হয়।

—বেশ, বিশ্বাস, মিঃ কাপুরকে তাহলে নিয়ে যাও।

মেরির কেবিনে এসে জয়শংকর দেখল কেবল শাদা একটা শেমিজ পরে মেরি বিছানায় শুয়ে রয়েছে। জয়শংকর চেয়ারে বসে তার মাথায় হাত দিল।

দু' তিন মিনিট কারও মুখে কোনো কথা নেই। তারপর খুব ধীর কণ্ঠে মেরি বলল ; আমাকে বাঁচালে কেন, আমাকে এখনি বাড়ি নিয়ে চল।

—ডাক্তারবাবু অনুমতি দিলেই নিয়ে যাব।

মেরি হঠাৎ কেঁদে উঠল। জয়শংকর তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে মেরি বলল ঃ মরবার আগে আমি কিন্তু তোমাকে সব বলে যাব।

—নিশ্চয় বলবে, একটু সুস্থ হও তারপর সব শুনব

এমন সময়ে ডক্টর ধর কেবিনে এসে বললেন, মিসেস কাপুর আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা আপনার কিছু চিকিৎসা করব, আপনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন, আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার একটি ছেলে আছে, তার জন্যে আপনাকে সারিয়ে তোলা দরকার।

জয়শংকর বলল, মনে করছি তাকে কিছুদিনের জন্যে স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেব, ওর মায়ের চিকিৎসা শেষ হলে ওকে আবার বাড়ি ফিরিয়ে আনব।

—যদি ভাল মনে করেন তাই করবেন, একটা সংসার ভেঙে যাক আমরা কখনই চাইনা। তারপর ডক্টর ধর মেরির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন একবার ভেবে দেখুনতো, আপনি যা করতে যাচ্ছিলেন তা সফল হলে আপনার ছেলেটার কি হত ? তারপর মিঃ কাপুর যদি আর একটা বিয়ে করতেন তাহলে আপনার ছেলের কি হত ? যাই হক আপনার মধ্যে এখনও আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি রয়েছে। চিকিৎসা করে সেটা আমি দূর করে দেব, তখন আপনি আফশোষ

করবেন। আমার কাছেই এসে বলে যাবেন যে ভাগ্যে সুইসাইড করিনি তাহলে কি সর্বনাশ হত!

মিসেস কাপুর অর্থাৎ মেরি বলতে আরম্ভ করল: তখনও তুমি দিল্লীতে, ফিরতে তোমার বেশি দেরী নেই তখন ষড়যন্ত্রটা হয়েছিল কিন্তু আমি কি বোকা, সব জেনেশুনেও ফাঁদে পা দিয়েছিলাম, কেন জান?

—তুমি না বললে কি করে জানব বল?

—শুধু তোমাকে ভালবাসি বলে, আমার পিঠে আরও দুটো বালিশ দাও ত, ঠেস দিয়ে বসি, শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা যুৎ হচ্ছে না, হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে, কফি খাবে? সুকুমারীকে ডাক না।

—না, কফি খাব না, একটু বিয়ার খাওয়া যাক। তুমি খাবে?

—তা একটু খেতে পারি, সুকুমারী

সুকুমারী হল আসলে ব্যারির আয়া। সংসারের অন্য কাজও করে। সুকুমারী বিয়ারের বোতল, গেলাস আর কাজুবাদামের ডিস সাজিয়ে দিয়ে গেল। দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। একজন কথা বলে যাচ্ছে আর একজন শুনে যাচ্ছে।

—তারপর বল। আমি তখন দিল্লীতে কিন্তু কলকাতা আসবার মুখে।

—হ্যাঁ। সেই সময় আমি একদিন বিকেলে আমাদের ক্লাবে মানে লেকে আমাদের সুইমিং ক্লাবে গিয়েছিলাম, সাঁতার যতটা না উদ্দেশ্য তার চেয়ে বেশী ইচ্ছে ছিল বিকিনি পরে গায়ে একটু খোলা হাওয়া লাগানো। যাই হক বিকিনি পরে লেডিসরুম থেকে বেরিয়েছি আর সামনে দেখি ফ্লেশ রঙের কাঁধকাটা একপিস সুইমিং স্যুট পরে রুবি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে।

—রুবি কে ?

—রুবিকে তোমার মনে পড়ছে না ? সেই যে সেবার বম্বেতে আলাপ হয়েছিল ? আমাদের হোটেলেই থাকত।

—হ্যাঁ মনে পড়েছে সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিনাল মেয়েটাত ?

—হুঁ্যা, মেয়ে বলছ কি ? মেয়ের মা বল, অবিশ্যি ওর ছেলেমেয়ে নেই।

—কিন্তু বেশ সুন্দরী, তা সে কলকাতায় কি করছে ?

—কি করছে জানি না তবে বম্বেতে আমরা ওর যে স্বামীকে দেখেছি তাকে ও তালাক দিয়েছে। এখন এক বড়লোক ব্যবসায়ীর রক্ষিতা হয়ে রয়েছে। আবার একটা ছোকরাকে ও রেখেছে।

—বল কি ?

—হুঁ্যা, সাংঘাতিক মেয়ে, ওর সঙ্গে সেদিন দেখা না হলেই ভাল হত।

—তারপর বল।

—হুঁ্যা, রুবির সঙ্গেই কথা বলছি এমন সময় সুইমিংপুল থেকে ভিজে গায়ে একটি ছোকরা এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে লাগল। কি সুন্দর চেহারা, নিয়মিত ব্যায়াম করে বোধ হয়। একমাথা কোঁকড়া চুল, সরু নাক, পরনে ছোট একটা ট্রাংক, বুকে বা পায়ে কোথাও লোম নেই। আমি তার দিকে চেয়ে আছি দেখে রুবি বলল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এর নাম হল ইনসান। শুধুই ইনসান, আর ও হল আমার বান্ধবী মেরি কাপুর।

—তা ছোকরা কি করে ? কিছু বলল ?

—হুঁ্যা, কলকাতায় কোন আমেরিকান অফিসে নাকি চাকরী করে।

—মুসলমান ? নাকি হিন্দু ?

—আমার ত মনে হল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। আমরা তিনজনে মিলে বেশ গল্প করছিলাম। হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে রুবি ইনসানকে বলল

যে, জান মেরির বর ন্যাশনাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেণ্টস-এর বড় কর্তা, তারপর থেকেই দেখি ছোকরা আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। সে তখনি আমাদের ক্লাবের রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে কফি ইত্যাদি খাওয়ালো এবং পরদিন পার্ক ষ্ট্রীটে এক রেস্তরাঁয় চা খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল। চায়ের পর দু এক দিন ডিনারও হল।

—আর কিছু হল ?

—মানে ?

—ডিনারের পর ড্যান্স এবং ড্যান্সের পর সেই রেস্তরাঁর প্রাইভেট রুমে....

—তুমি বিশ্বাস করবে না কিন্তু মেয়েদের প্রতি সেই ছোকরার কোন দুর্বলতাই নেই।

—যাক তারপর বল।

—তারপর ও আমার টেলিফোন নম্বর জানতে পেরেছিল, মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করত, একদিন বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির।

—বল কি ? এত সাহস ? তারপর ?

—হ্যাঁ, আমি খুব রাগ করলাম, বললাম জয়ের সঙ্গে তোমার এখনও পরিচয় হয়নি, তোমার এভাবে আসা খুব অন্যায়, তাছাড়া আমার এখন খুব মাথা ধরেছে।

—ব্যারি কোথায় ছিল ?

—ব্যারি তখন বাগানে খেলা করছিল। যাক মাথা ধরেছে শুনে ইনসান আমাকে একটা ছোট ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। মাথা ধরা ছেড়ে গেল আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, সন্ধ্যার পর যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন ইনসান চলে গেছে, ব্যারি পড়তে বসেছে

—এটা কবে হল ?

—আগের মঙ্গলবার, আমার বেশ মনে আছে, কারণ প্রতিদিনই

বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেতাম কিন্তু সেই প্রথম দিন যেদিন তোমার কোনো চিঠি পাইনি।

ওদের বিয়ার ও সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। জয়শংকর আর একটু বিয়ার নিল কিন্তু মেরি আর বিয়ার নিল না, সে গালে একটা লজেন্স ফেলে বলতে লাগল।

—এরপর আমি তোমার আর কেনো চিঠি পাইনি। এরপর দিন দুই ইনসানেরও কোনো খবর নেই, তারপর এই বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় ও আমাকে ফোন করেছে।

—রাত্রি এগারোটায়? সাহস ত কম নয়? তা তুমি কি করলে?

—আমি খুব বিরক্ত হলাম, কিন্তু ও বলল যে ফোনে সব কথা বলা যাবে না, ও নিজে আসতে চায়, আমি তখন বললাম কি এমন কথা যে এখন না বললে চলবে না। তখন ও বললে মিঃ কাপুরের খুব বিপদ, তোমার বিপদ শুনে আমি মাথার ঠিক রাখতে পারলাম না তাই ওকে বললাম কিন্তু তাই বলে এত রাত্রে আমার বাড়িতে আসা চলবে না, আমি আমাদের বাড়ির কাছে রাস্তার মোড়ে তোমার জন্যে ওয়েট করব। ও রাজি হল।

—তারপর?

—আমি তখন ফুলপ্যান্ট আর সার্ট পরলাম, মাথায় একটা টুপি পরলাম যাতে সহজে আমাকে কেউ চিনতে না পারে, চোখে দিলাম নীল চশমা, তারপর আমাদের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। ইনসান তার গাড়ি নিয়ে এসে মোড়ে দাঁড় করিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগল, চিনতে পারেনি ত, ভেবেছিল কে না কে একটা ছোকরা, যাই হক আমি তারপর ওর গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি নিয়ে ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গেটের কাছে দাঁড়াল।

মেরি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল: গাড়ির ভেতরটা এতক্ষণ অন্ধকার ছিল, ও আলো জ্বালল। ওর মুখ দেখে আমি

ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে হাসি নেই, বিবর্ণ, চোখ লাল নাকি? যাই হক ও বলল যে সেই দিনই সকালে কয়েকজন লোক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা নাকি জানে যে ইনসানের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

—ব্যাপারটা কি তাই বল না?

—তাই ত বলছি, ইনসান তার পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করল। চিঠিখানা তোমার হাতের লেখা। আমার চিনতে ভুল হল না। তোমারই কাগজ আর তোমারই খাম ব্যবহার করেছে।

—আমি তোমাকে অন্য লোকের হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছি?

—শোনই না, চিঠিতে তুমি লিখেছ যে তুমি একদল লোকের পাল্লায় পড়েছ, তারা আমাকে যা করতে বলবে আমি যেন তাই করি।

—কি করতে বলেছিলাম। জয়শংকর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—সে কথা ইনসান বলল, সে বলল যে তোমার অফিসে মানে ন্যাশনাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টসে একটা স্ট্রংরুম আছে, যার দরজা স্টেনলেস স্টিলের আর সেই ঘরের মধ্যে স্টিলের ফাইল ক্যাবিনেট আছে আর সেই ক্যাবিনেটের মধ্যে একটি ক্যাবিনেটে নাকি আছে কাশ্মীরের ব্যাটল ফ্রণ্টের প্ল্যানের মাইক্রোফিলম। সেই সব মাইক্রোফিলম আবার ছোট ছোট চ্যাপ্টা কৌটোয় রাখা আছে। কৌটোর ওপরে নম্বর দেওয়া আছে।

ইনসান বলল যে সেই লোকেরা তাকে বলেছে। টিথওয়াল সেক্টরের মিলিটারি প্ল্যান তাদের চাই। কৌটোর নম্বর হল টি এস জিরো ওয়ান। ভবিষ্যতে যদি টিথওয়াল আক্রান্ত হয় তাহলে ভারতের স্ট্র্যাটেজি কি হবে তাই নাকি ঐ প্ল্যানে বলা আছে।

—সর্বনাশ, শত্রুপক্ষ এত খবর জেনেছে, তারপর?

—তারপর ইনসান বলল যে ঐ কৌটো আমাকে চুরি করে এনে

ইনসানকে দিতে হবে। ইনসান সেটি দেবে সেই লোকগুলিকে, তিন দিনের মধ্যে নইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য, তাছাড়া আমি যদি ও কথা কারও কাছে প্রকাশ করি তা হলেও তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

আমি বললাম, ইনসান সেই কৌটো আমার পক্ষে চুরি করা অসম্ভব, আমি কি করে চুরি করব? আমি কোনদিনই সেখানে যাইনি, স্ট্রংরুম কোথায় তাও আমি জানি না।

ইনসান আমাকে বলল: তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, তোমাকে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তোমার স্বামীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবং যে এখন তোমার স্বামীর জায়গায় কাজ করছে সেই বীরেন্দ্র সোনপাল তোমার প্রতি অনুরক্ত, তোমার স্বামীর জন্যে তুমি একটু ছলনা করলেই বীরেন্দ্রই তোমার হাতে হয়ত সেই কৌটো তুলে দেবে।

—বীরেন্দ্র আমার প্রতি অনুরক্ত একথা তোমাকে কে বলল? আমি জিজ্ঞাসা করতে ইনসান বলল: আমি কিছু বলছি না, সবই তাদের কথা, তারা এও জানে যে টি এস জিরো ওয়ান কৌটো প্রথম ক্যাবিনেটের প্রথম ড্রয়ারেই আছে

—সর্বনাশ, এ সবই হয়ত সত্যি, ভেতরে নিশ্চয় কোনো গুপ্তচর আছে যারা শত্রুকে এই খবর দিচ্ছে, আমাদের সব ঢেলে সাজাতে হবে, তারপর তুমি কি করলে, আমাকে যদি একটা ট্রাংকলও করতে জয়শংকর বলল।

—ট্রাংককল করব কি? তোমার ঐ জাল চিঠিই ত আমাকে সব কিছু বিশ্বাস করিয়েছে। আমি ত জানি যে তুমি শত্রুর হাতে বন্দী, নইলে কি আর ফোন করতাম না?

—তা সেদিন গাড়ির মধ্যে ইনসান তোমাকে জড়িয়ে ধরেনি বা কিস করে নি?

—সেইটেই ত আশ্চর্য ব্যাপার, আমি আশঙ্কা করছিলাম যে

ব্যাটা বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে অন্ততঃ আমার হাত চেপে ধরবে কিন্তু ব্যাটা বোধ হয় সেক্সলেস, মেয়েদের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই, রুবি আমাকে সে কথা বলেছিল, সে নাকি ইনসানকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল।

—যাই হক তারপর কি হল বল।

—আমি তখনও পর্যন্ত ইনসানকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি, তোমার বিপদ তখন আমার মাথায় চেপে বসেছে, আমি একটু বিশেষভাবে সেজে তোমার অফিসে গেলাম। বীরেন্দ্র সোনপাল একাই ছিল। আমাকে সে আশা করে নি। আমাকে দেখেই অনেকটা মেঘ না চাইতেই জল ভাব করে উল্লসিত হয়ে উঠল।

—কি ব্যাপার মেরি, হঠাৎ যে!

—হঠাৎ! তা বলতে পার, তিন দিন হল জয়ের চিঠি পাইনি তাই খোঁজ নিতে এসেছি তুমি কিছু বলতে পার কিনা।

—ইস এত প্রেম, বিরহ যে আর সহ্য হচ্ছে না।

—স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম থাকবে না ত কি তোমার সঙ্গে থাকবে?

—দোষ কি?

—থাম ত, যে লোকটা রোজ চিঠি দিত হঠাৎ যদি তিনদিন তার চিঠি না আসে তাহলে চিন্তা হয় না?

—তা হতে পারে বৈকি?

জয়শংকর বাধা দিয়ে বলল, তুমি কবেকার কথা বলছ? অফিসে কেউ ছিল না কেন?

—সেদিন শনিবার, আমি বীরেনকে ফোন করে তিনটের সময় গিয়েছিলাম, তখন অফিসে কেউ ছিল না। তুমি রাগ করছ না ত?

—রাগ কিসের? তুমি যে অবস্থায় পড়েছিলে আমি হলে হয়ত তাই করতাম। যাক তারপর কি হল বল।

—আমি যা আশা করেছিলাম ঠিক তাই। বীরেন কিছু সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে লাগল, কাজ উদ্ধারের জন্যে কিছুটা প্রশ্রয়

দিতে হল যেমন বীরেন আমার হাত নিয়ে খেলতে লাগলো, দু'একটা মন্তব্য ও ইঙ্গিত করল। আমার তখনও আসল কাজ উদ্ধার হয় নি। আমি বললাম বীরেন একটা কাজ করবে ?

—কি কাজ, বীরেন জিজ্ঞাসা করল।

—জয়ের ত কোনো খবর দিতে পারলে না, তাহলে····.

—আরে সে ভাল আছে, চিঠি পাওনি ত কি হয়েছে। আর কি বলছিলে

—বলছিলাম কি তোমাদের স্ট্রংরুমটা আমাকে একবার দেখাও না। জয়কে কতবার বলেছি কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় নি।

বীরেন বোধহয় ভাবছিল যে মেরিকে নিয়ে সে যদি স্ট্রংরুমে ঢুকতে পারে তাহলে একটা কিছু করা যাবে। তবুও প্রথমে সে বলল।

—এ কি বলছ মেরি, এ কি কখনও হয়, মিঃ কাপুর জানতে পারলে আমার চাকরী যাবে।

আমি তখন ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম তুমি একটি কাওয়ার্ড। তাছাড়া তুমি কি করে ভাবলে যে আমি জয়কে বলে দেব।

বীরেন কি ভাবল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে কোথা থেকে এক গোছা চাবি নিয়ে এসে বলল

—আমার সঙ্গে এস।

আমরা প্রথমে একটা ঘরে ঢুকলাম। সেই ঘরটায় নানারকম যন্ত্রপাতি আর শিশি বোতল ভর্তি। অনেক রকম শিশি বোতল রয়েছে।

—হ্যাঁ ল্যাবরেটরি, জয়শংকর বলল।

—ল্যাবরেটরি পার হয়ে চকচকে স্টীলের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। বীরেন প্রথমে চাকা ঘুরিয়ে কি সব করল তারপর চাবি লাগিয়ে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। মাঝখানে একটা কাঠের বড় টেবিল আর সেই টেবিল ঘিরে স্টীলের নানারকম ক্যাবিনেট।

ঘরে ঢুকেই বীরেন প্রথমেই আমাকে কিস করবার চেষ্টা করল। অতি কষ্টে এড়িয়ে গেলাম। বললাম এই ক্যাবিনেটটা খোল না। দেখি তোমরা কি করে সিক্রেট ডকুমেণ্ট রাখ। বীরেনকে আমি এড়ালেও ও আমাকে এড়াতে পারল না। ও ক্যাবিনেটের চাবি খুলে ওপরের ড্রয়ারটা খুলে দিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম টি এস জিরো ওয়ান কৌটোটা রয়েছে। তুমি রাগ কোরোনা জয়, আমি তখন মনে মনে প্ল্যান আঁটছিলাম যে কোনোরকমে বীরেনকে আমি এমন ভাবে জড়িয়ে ধরব যাতে ওর পিছন দিক থাকে ক্যাবিনেটের দিকে, তাহলে আমি হাত বাড়িয়ে কৌটোটা তুলে নেব। আমি কৃতকার্য হলাম। বীরেন আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রথম সুযোগেই আমার ব্রেসিয়ারের হুক খুলে দিল, তারপর যেই ও আমার ঠোঁটে কিস করতে এসেছে আর সেই সময়ে ল্যাবরেটরিতে ফোন বেজে উঠল।

বীরেন খুব বিরক্ত হয়ে টেলিফোন ধরতে গেল। যাবার আগে বলে গেল কিছুতে হাত দিয়ো না যেন।

বীরেন যেই ঘর থেকে বেরিয়েছে আর অমনি টি এস জিরো ওয়ান কৌটো আমার ব্যাগে চলে এল। বীরেনও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে হঠাৎ আমাকে ধরে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে চেষ্টা করছি। অতি কষ্টে বীরেনকে দমন করলাম। বললাম এই না এখন না, অসুবিধে আছে আজ আমাকে ছেড়ে দাও, পরে আর একদিন যেদিন বলবে অনেস্ট আই প্রমিস। এই সব বলে ত ছাড়া পেলাম।

—রাসকেল, স্কাউনড্রেল আমি জানতাম তোমার প্রতি বীরেনের দুর্বলতা আছে। তবে ওটা ভেবেছিলাম বৌদির প্রতি দেওরের যে দুর্বলতা সেইরকম আর কি, কিন্তু ও এত নীচে নেমে গেছে, তারপর তুমি কি করলে ?

—লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটা দোকানে ইনসান আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা সেখানে কিছু কিনব এইরকম ঠিক ছিল কিন্তু

আসলে আমি সেই কৌটোটি ইনসানকে দেব। আমি আমাদের গাড়ি নিয়েই গিয়েছিলাম, স্থাড থেকে বেরিয়ে ময়দানের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের সেই দোকানে হাজির হলাম, ইনসানের একটু আগেই সেখানে এসে পৌছলাম।

গাড়ি থেকে শাড়ি পড়া মেমসাহেবকে নামতে দেখে দোকানদার আমাদের খাতির করল। আমার একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কেনবারও দরকার ছিল। একটু পরে ইনসান আসতে এক ফাঁকে কৌটোটা ওকে দিয়ে দিলাম।

—তারপর।

—সেদিন সন্ধ্যার পর ইনসান আমাকে ফোন করে জানাল যে জিনিসটি সে যথাস্থানে পৌছে দিয়েছে : বিপদ কেটে গেছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম কিন্তু মঙ্গলবার তুমি যখন ফিরে এলে এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা না করেই বুঝলাম যে তুমি বদ লোকের পাল্লায় পড় নি। তখন বুঝলাম আমাদের দুজনেরই সর্বনাশ হয়ে গেছে। পরবর্তী চেকিং-এর দিনে নিশ্চয় জানা যাবে যে টি এস জিরো ওয়ান চুরি গেছে। তোমার চাকরী তো যাবেই সেই সঙ্গে আমাকেও শাস্তি পেতে হবে। হয়ত জেল হবে, কারণ আমিই ওটা চুরি করেছি। এ অতি সহজেই প্রমাণিত হবে। তাই আমি ভয় পেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।

মেরি এই কাহিনী বিবৃত করে কাঁদতে লাগল। জয়শংকর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মুখে চুমো খেল। কিন্তু মনে মনে বুঝল, যে তার সামনে ত বটেই প্রতিরক্ষা বিভাগের সামনে সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত। সে বুঝল শত্রুপক্ষ সে যেই হক না কেন খুবই চতুর। তারা সমস্ত খবর রাখে এমন কি মেরির প্রতি বীরেনের দুর্বলতা

আছে সে খবরও তারা জানে। টি এস জিরো ওয়ান কৌটো কোথায় থাকত তাও তাদের অজানা নয়। তাহলে তার নিজের বিভাগেই চর রয়েছে।

জয়শংকর ঘরে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল মেরিকে খুব বকে। কিন্তু মনে পড়ে গেল ডাক্তারের কথা। এখন ওর ওপর রাগ করা চলবে না, তাহলে ক্ষতি হবে। ছেলের কথা মনে করে জয়শংকর নিজেকে সংযত করল।

মেরি জয়শংকরকে লক্ষ্য করছিল। স্বামীর মনোভাব বোধহয় বুঝতে পারল, বলল তুমি আমাকে আর ভালবাসনা বোধহয়, যা কাজ করেছি তারপর আর ভালবাসবে কেন ?

—ওসব কি বলছ মেরি, তোমার অবস্থায় পড়লে আমিও হয়ত একই কাজ করতাম, তুমি ওসব কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না, আচ্ছা তুমি ঐ ইনসানের ঠিকানা জান ?

—না, ওর ঠিকানা জানি না।

—ফোন নম্বর ?

—তাও জানি না, ও ত একদিন বলেছিল যে ও এক বন্ধুর বাড়ি থাকে তার ফোন নেই।

—রুবি ঠিকানা জানে ?

—রুবিও জানে না, রুবি একদিন বলেছিল যে লোকটা যেমন সেক্সলেস তেমনি বোধহয় ঠিকানালেস।

—আচ্ছা চিঠিখানা কোথায় ? মানে যেটা আমি তোমাকে লিখেছিলাম বলে ও তোমাকে দেখিয়েছিল সেই চিঠিখানা ?

—সেখানা ত সে ফিরিয়ে নিয়েছে মানে সেই দুষ্ট লোকেরাই নাকি ফেরত চেয়েছিল।

তাহলে ত কোনো সূত্রই নেই। আজ শুক্রবার তার মানে সাতদিন হল মাইক্রোফিলম খোয়া গেছে। তাকে উদ্ধার করা খুব শক্ত। হয়ত অন্ধকার ঘর থেকে হারানো ছুঁচ কুড়িয়ে পাওয়া যাবে,

কিন্তু সেটা কি আর পাওয়া যাবে। কোথায় গেল সেটা? আমেরিকা! চীন! পাকিস্তান! ইরান!

জয়শংকর ভাবতে লাগল যে আসল প্ল্যান দিল্লীতে আছে। আসল প্ল্যানের মাইক্রোফিলম যে চুরি গেছে এ হয়ত ধরা পড়তে দেরি হবে কিন্তু তার আগেই পাকিস্তান যদি কাশ্মীর ফ্রণ্টে যুদ্ধ বাধায় তাহলে ত সর্বনাশ হয়ে যাবে। সে হয়ত কোনোরকমে নিজের ও মেরির পিঠ বাঁচাতে পারবে কিন্তু দেশের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। টিথওয়াল সেকটরে যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে ভারত কি ভাবে প্রতিরোধ করবে। তারই প্ল্যান ত চুরি গেছে।

জয়শংকর ভাবল সে যদি কোনোভাবে ইনসানকে ধরতে পারে তাহলে তাকে তার কর্তাদের কাছে নিয়ে যাবে। এমন সাংঘাতিক একজন গুপ্তচরকে ধরিয়ে দিতে পারলে তার হয়ত কিছু সুবিধা হতে পারে। আচ্ছা আর একটা কথা। ঘটনা ঘটেছে শনিবার। মেরি বীরেনকে বলেছিল যে পরে সে একদিন তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু মেরি কি গিয়েছিল? না সে যায়নি এবং বীরেন আর তার খোঁজ করে নি। এত সহজে বীরেন মেরিকে ছেড়ে দিল। কারণটা কি?

—মেরি তুমি চুপ করে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো একটু শুয়ে থাক, আমি একটা ফোন করে আসছি, এই বলে জয়শংকর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর নার্সকে ডেকে দিয়ে প্রথমে গেল বাথরুমে। ক্ষতি করতে পারে এমন সব ওষুধ ফেলে দিল। যেখানে যে দড়ি ছিল সেগুলিও মেরির নাগালের বাইরে রাখল, তারপর সে মনোবিদ ডক্টর এস. পি. ধরকে ফোন করে বলল

—দেখুন ডাক্তারবাবু মেরি সাংঘাতিক একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে, আর সেইজন্যেই সে আত্মহত্যা করতে চাইছিল বা করতে চাইছে।

—কি কাজ?

—বলতে অসুবিধে আছে তবে সেই কাজের ফলে আমার নিজেরও বিশেষ ক্ষতি হবে।

—যাই হক না বললেন কিন্তু এর জন্যে তাকে কি আপনি বকাবকি করেছেন বা কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করেছেন?

—না, সেরকম কিছুই করি নি কিন্তু ও সুযোগ পেলেই আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করবে, অবশ্য সেদিকে আমি স্টেপ নিয়েছি। ওকে সর্বদা চোখে চোখে রাখব তবুও একজন অ্যাডাল্ট ওম্যানকে আগলে রাখাও ত মুশকিল।

—আপনি এক কাজ করুন। আপনি মিসেস কাপুরকে চিকিৎসার জন্যে কাল সকালে নিয়ে আসুন। খালি পেটে আনবেন তবে চা টোস্ট খেয়ে আসতে পারেন তার বেশি নয়।

—ঠিক আছে তাই নিয়ে যাব কিন্তু প্লিজ ডক্টর আমাকে বেশিক্ষণ ডিটেন করবেন না।

—ইন দ্যাট কেস আপনি ঠিক আটটায় আসুন বরঞ্চ একটু আগেই আসুন আমি সব কিছু রেডি রাখব। মিসেস কাপুর এলেই আমি কাজ শুরু করে দেব।

—থ্যাংক ইউ

—থ্যাংকস, দেন আনটিল টুমরো এইট-ও-ক্লক।

ডাক্তারকে ফোন করে জয়শংকর মেরির কাছে ফিরে এল। মেরি চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল। জয়শংকর জিজ্ঞাসা করল।

—মেরি তোমাকে লেখা আমার চিঠিগুলো কোথায়।

চোখ খুলে ঈষৎ একটু হেসে মেরি বলল ঐ ত আমার টেবিলের ড্রয়ার খুললেই পাবে। তোমার সব চিঠি পর পর সাজানো আছে। এমন কি খামের ওপর নম্বর দিয়ে রেখেছি।

জয়শংকর চিঠিগুলি গুণে দেখল। দুখানা চিঠি কম। মেরিকে বলল, শেষ দুখানা চিঠি পাচ্ছি না। একখানা চিঠিতে লিখেছিলাম যে এখানে হঠাৎ আমার বোন দীপশিখার ও তার বরের সঙ্গে দেখা

হয়ে গেল, ওরা মস্কো যাবার পথে দিল্লী এসেছে আর শেষ চিঠি-খানায় লিখেছিলাম আমি মঙ্গলবার কলকাতা পৌঁছব কিন্তু তার আগে তোমাকে আর চিঠি দিতে পারব না।

মেরি ভ্রূকুটি করল তারপর বলল কিন্তু জয় দীপশিখার বিষয়, সে চিঠিত আমি পেয়েছি। তাহলে গেল কোথায়? তবে তোমার শেষ চিঠি আমি পাইনি। আশ্চর্য ত! একখানাও চিঠি হারাল না আর ঐটেই হারাল?

মেরির কথামতো জয়শংকর আরও কয়েক জায়গা খুঁজে দেখল, কিন্তু দীপশিখার চিঠি কোথাও নেই।

জয়শংকর হঠাৎ বলল, বুঝেছি, সে চিঠির কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি।

—কি হয়েছে? কি বুঝতে পেরেছ?

নার্স ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। সুকুমারীও বিয়ারের বোতল, খালি গেলাস ইত্যাদি সব নিয়ে গিয়েছিল। জয়শংকর মেরির পাশে বসে আস্তে আস্তে বলল

—চিঠি দুখানা ইনসান চুরি করেছে।

—অসম্ভব। আমি সবসময় ড্রয়ার চাবি দিয়ে রাখি।

—তুমি বললে না যে, ইনসান একদিন বিকেলে আমাদের এই ফ্ল্যাটে এসেছিল?

—হ্যাঁ, কিন্তু ড্রয়ার খুলবে কি করে?

—সোজা, তুমি বলেছিলে তোমার মাথা ধরেছে।

—হ্যাঁ, মাথা ধরেছিল, ইনসান আমাকে কি একটা বড়ি খেতে দিয়েছিল। বলেছিল মাথাধরা ছেড়ে যাবে।

—আসলে সেটা মাথা ধরা সারাবার বড়ি নয়, ঘুমের বড়ি, তুমি বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আর ও সেই সুযোগে আমার চিঠি চুরি করল। সেটা বোধহয় টেবিলের ওপরেই ছিল আর আমার শেষ চিঠিখানা বোধহয় লেটারবক্স থেকে চুরি করেছে, তার উদ্দেশ্য ছিল

আমার হাতের লেখা নকল করা, তা সে করেছিল, তোমাকে আমার নকল চিঠি দেখিয়েছিল। বুঝতে পেরেছ ?

—হ্যাঁ, এইবার বুঝেছি, তোমার হাতের লেখা জাল করেছিল।

—ইনসান কোথায় থাকত তুমি জান না কিন্তু কখনও কোনো হোটেলের নাম করেছিল কি ?

—ওর সঙ্গে সুইমিং ক্লাবেই আমার দেখা হত। ওর ঠিকানা যদি কেউ বলতে পারে তাহলে সুইমিং ক্লাবই বলতে পারবে। আর এক যদি রুবি বলতে পারে।

—রুবি কোথায় থাকে ?

—ও একটা ঠিকানা আমাকে বলেছিল। লেকের কাছে কোথায় থাকে যেন, তবে তুমি ওকে যে কোনদিন বিকেলে সুইমিং ক্লাবে পাবে। রোজই ও বেদিং বিউটি সেজে ওখানে লনে শুয়ে থাকে নয়ত বই পড়ে।

—চিনতে পারব ত ?

—তা পারবে, দেখতে ত ভাল তায় আবার ও ফ্লেশ কলারের ছাড়া বিকিনি বা সুইমস্যুট পরে না। চোখে সাদা গোল ফ্রেমের সবুজ চশমা পরে, দেখবে সুইমিং ক্লাবের গায়ে একটা হলদে রঙের মস্ত বড় ছাতার নীচে একটা বেতের সরু বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে ও বই পড়ে নয়ত নোখ পালিশ করছে।

—ঠিক আছে, কালই ওর সন্ধান পাওয়া যাবে, তাহলে তুমি এখন ঘুমোও।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর ঠিক আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে মেরিকে জয়শংকর নার্সিংহোমে দিয়ে এল। ডাঃ ধর আজ থেকে মেরির চিকিৎসা শুরু করবেন।

ডাক্তারবাবু তৈরি ছিলেন। মেরি যাওয়া মাত্র তাকে নির্ধারিত বেডে নিয়ে যাওয়া হল। তুজন নার্স তার পরিচর্যা আরম্ভ করল। একটু পরেই ডাক্তার ধর স্বয়ং এসে আসল চিকিৎসা আরম্ভ

করবেন। তিনি জয়শংকরকে বললেন লাঞ্চের আগে মেরিকে নিয়ে যেতে।

—ঠিক আছে, এই কথা বলে অগ্রিম বাবদ এক তাড়া নোট ডাক্তারকে দিয়ে জয়শংকর তার নিজের অফিসে গেল।

অফিসে এসেই সে স্ট্রং-রুমে ঢুকল এবং একটির পর একটি ক্যাবিনেট চেকিং আরম্ভ করল। এরকম সে আগেও করত অতএব এতে কিছু নতুনত্ব নেই এবং কেউ কোনো কৌতূহলও প্রকাশ করল না। বীরেন্দ্র খালি এগিয়ে এসে বলল সে সাহায্য করতে পারে কিনা।

—না না আমি একাই পারব তুমি বরঞ্চ জি-রুমটা ভাল করে দেখে এস, ঐ রুমের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্টটা ঠিক আছে কিনা। ঐ ঘরে ফটোস্ট্যাট ক্যামেরা বসানো হবে, কিছু রেয়ার বুকস ওখানে কপি করে সেই সব কপি ঐ ঘরেই রাখা থাকবে, তুমি ঐ ঘরটা ভালো করে দেখে এস।

জয়শংকর মনে মনে বলল, দাঁড়াও না আর তুদিন পরে তোমাকে আমি এখান থেকে ট্রান্সফার করব। কালই আমি দিল্লীকে লিখব। পরস্ত্রীর সঙ্গে তোমার প্রেম করা বার করছি।

না সবই ঠিক আছে কেবল মাত্র টি এস জিরো ওয়ান কৌটোটা নেই। সেটা তাহলে সত্যিই বেহাত হয়েছে। শত্রুর হাতে পৌঁছবার আগে সেটি আর উদ্ধারের আশা :নেই। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে টিথওয়াল ব্যাটলপ্ল্যান চেঞ্জ করাতেই হবে। তাতে যদি তার চাকরী যায়, শাস্তি হয় ত হবে। দেশের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

লাঞ্চের সময় হয়ে এল। এইবার নার্সিংহোমে যাওয়া যাক। মেরিকে বাড়ি নিয়ে যেয়ে লাঞ্চ সেরে আর একবার অফিসে আসবে। স্ট্রং রুমের ভেতরের সমস্ত প্ল্যান সে বদলে ফেলবে। ক্যাবিনেট এদিক ওদিক করে দেবে, ভেতরের সমস্ত রেকর্ডও অন্যভাবে সরিয়ে

রাখবে। প্ল্যানটা সে একাই করবে এবং এই পরিবর্তন এবার থেকে ঘন ঘন করতে হবে। কারণ শত্রুর নজর যখন একবার পড়েছে এবং একবার যখন সহজে কাজ উদ্ধার হয়েছে তখন তারা আবার চেষ্টা করবে। তারপর বিকেলে সে যাবে লেকে সুইমিং ক্লাবে রুবির সন্ধানে।

নার্সিংহোমে তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। একজন নার্স মেরিকে ধরে ধরে নিয়ে এল। মেরি জয়শংকরের পাশে সোফায় বসল। জয়শংকর লক্ষ্য করল যে মেরির কপালের ছু দিকে সামান্য যেন ছোট ছুটি কালসিটে পড়েছে। একটু দুর্বলও মনে হচ্ছে।

ডাক্তার ধরও এলেন। তিনি বললেন বাড়ি ফিরে মিসেস কাপুরকে শুইয়ে রাখবেন, যদি কিছু খেতে চান খেতে দেবেন, কিছু বিভারেজ খেতে চান তাও দেবেন। আবার সোমবার নিয়ে আসবেন।

তারপর জয়শংকরকে কাছে ডেকে এনে বললেন একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, কয়েকদিন ওঁর স্মৃতিবিভ্রম হতে পারে, কিন্তু তা সাময়িক, সে জন্যে ভয় পাবেন না ঠিক হয়ে যাবে, আচ্ছা আপনি তাহলে আর দেরি করবেন না, বাড়িতে নিয়ে গিয়েই সমস্ত ড্রেস আলগা করে শুইয়ে দেবেন।

সেইদিনই বিকেলে জয়শংকর কাপুর লেকে সেই সুইমিং ক্লাবে গিয়ে হাজির। জলের দিক ছাড়া ক্লাব বাকি তিন দিক ঘেরা! ভেতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে দেখা যায় না। দরজায় লেখা আছে মেম্বারস ওনলি। তবুও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করে অথবা নতুন বা হবু সভ্য মনে করে দারোয়ান জয়শংকরকে আটকালোনা। বরঞ্চ খটাস করে একটা সেলামই করল। গাড়ি কোনদিকে রাখতে হবে দারোয়ান সে বিষয়ে জয়শংকরের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল।

জয়শংকর ক্লাবে না এলেও সে লাইফ মেম্বার, মেরির অনুরোধেই

তাকে লাইফ মেম্বার হতে হয়েছে! সে যাই হক এখন রুবিকে খুঁজে বার করতে হবে। রুবিকে কখনও সে সাঁতারের পোষাক পরা অবস্থায় দেখেনি, চিনতে অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু হায়! রুবিকে যেখানে পাওয়া যাবে মেরি বলেছিল সেখানে কোনো মেয়ে নেই। এদিক ওদিক চোখ ফেরাতে ফেরাতে দেখল একজন বিকিনি পরা যুবতী একটি যুবকের সঙ্গে মস্ত বড় একটা বল নিয়ে লোফালুফি করছে। যুবতীর দিকে ভাল করে দেখল। হ্যাঁ, একেই ত রুবি বলে মনে হচ্ছে। একেবারে নক আউট ফিগার। এর কাছে কোথায় লাগে মেরি।

ক্লাব গ্রাউণ্ডে পুরো স্যুট পরে বড় কেউ একটা আসে না। এই রকম স্যুটেড-বুটেড আগন্তুককে ঢুকতে দেখে রুবি ও তার সঙ্গীরও সেদিকে চোখ পড়েছিল। রুবি জয়শংকরকে চিনতে পেরে বল ফেলে দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এল

—কি ব্যাপার জ: তুমি!

—হ্যাঁ, তোমারই খোঁজে এসেছি। যাক আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ?

—আহা কি যে বল, তোমাকে চিনতে পারব না কেন। মেরিকে লুকিয়ে তোমার সঙ্গে কত কাণ্ড করলাম আর তোমাকে অমনি ভুলে যাব। তারপর কি মনে করে বল? লেমন স্কোয়াশ বলে দি

—লেমন স্কোয়াশ নয়। এখানে তোমাকে একটা কিস করা যাবে?

—কেন যাবে না? গো অ্যাহেড। বলতে বলতে রুবি জয়ের মুখের দিকে নিজের মুখ তুলে দিল

জয়শংকর রুবির ঠোঁটে ছোট্ট একটি চুমো খেয়ে বলল

—তোমার সঙ্গে কথা আছে, কিন্তু এখানে বলা সুবিধে হবে না

—বেশ ত আমার সঙ্গে চল, আমার বাড়ি ত কাছেই বলতে বলতে রুবি উঠে দাঁড়াল

—এই অবস্থাতেই যাবে নাকি ?

—দূর, এই দেখনা কি পরি

সামনেই একটা বেতের চেয়ারের ওপরে সবুজ একটা বেলবটম আর লাল একটা শার্ট পড়ে ছিল। রুবি তার বিকিনির ওপর সেই দুটো পরে নিল। একটা কিট ব্যাগ তুলে নিল আর পায়ে জুতো ত ছিলই।

—হল ত, এইবার চল, সঙ্গে গাড়ি আছে ত।

বেশি দূরে নয় কাছেই ওর বাড়ি। একটা পাঁচতলা ফ্ল্যাট বাড়ির নীচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে রুবি থাকে। একখান ঘর হলেও ঘরখানা মস্ত বড়। এক দিকে খাট। একদিকে ড্রেসিং টেবিল। একদিকে বসবার জায়গা, পোষাক বদলাবার জন্যে একদিকে স্ক্রীন। মাঝখানে কার্পেট পাতা, আলমারি, কাবার্ড, রেডিও ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। বাথরুম ঘরের সংলগ্ন। সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা, তারই একধারে রান্না ও খাবার জায়গা। দক্ষিণে খোলা বারান্দাটি বেশ আরামদায়ক। গ্রিল দিয়ে ঘেরা, তারপর ছোট একটি ফুলের বাগান।

ঘরে ঢুকে রুবি বলল : জয় তুমি এক মিনিট বোসো। আমি ড্রেস চেঞ্জ করে আসি, বিকিনি ছোট্ট হলে কি হবে বেশ মোটা, গরম আর বুকে কোমরে বেশ এঁটে বসেছে। আমি এখনি আসছি। স্ক্রীনে আড়ালে গিয়ে সাঁতারের পোষাক বদলে রুবি একটা হাত কা হাওয়াই সার্ট পরে এল। সামনের দিকে ওপরের দুতিনটে বোতা দেয় নি, বুকের উপত্যকা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাওয়াই সার্ নিচে প্যান্টি ছাড়া আর কিছু নেই। জয়শংকরের চোখ চক করতে লাগল। রুবি বুঝতে পেরে গা চুলকোবার ছল করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বক্ষ যুগলের প্রায় সবটাই উন্মুক্ত করে দিল, অবশ্য এক মিনিটের জন্যে।

—একটু বিয়ার খাও নয়ত কফি করি।

—বিয়ার খাবার সময় হবে না, তুমি বরঞ্চ কফি করে দাও।

—হাসিনা। হাসিনা বলে ডাকতেই কোথা থেকে চৌদ্দ পনেরো বছরের ফ্রক পরা একটি মেয়ে এসে হাজির

—কি বলছ ভাবী।

—আরে আমাদের কফি খাওয়ারে, তুইও একটু খাস, তারপর জয়শংকরের দিকে ফিরে বলল, কি খবর জয়। মেরির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি, তাই এতদিন পরে আমাকে মনে পড়েছে

—তা নয় রুবি, তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু, দেখা না হলেও জানি তুমি আমার আছ

—এবং তুমিও আমার আছ, সেবার যখন বিপদে পড়লাম তখন তুমি এগিয়ে না এলে আমার কি তুর্দশা হত বলত, টাকা ত অনেকেই দেয় জয়, তুমিও দিয়েছিলে এবং আমি শোধ দিতে পারিনি, কিন্তু নিজে কে এগিয়ে আসে বলত

—কেন রুবি, টাকা ত উত্তমরূপেই গায়ে গায়ে শোধ দিয়েছ

—কি যে বল, তাতে ত আমিও আনন্দ পেয়েছি, তারপর কি খবর বল ?

—খবর ভাল নয় রুবি, মেরি সুইসাইড করবার চেষ্টা করেছিল, খুব বেঁচে গেছে।

—অঁ্যা, বল কি জয়, সত্যি বলছ, আমার গা ছুঁয়ে বল।

—গা ছুঁয়ে বলার কি আছে, আমি ত বুঝতে পারছি না ও কেন সুইসাইড করতে যাবে।

হাসিনা কফি নিয়ে এসেছিল। তুজনে তুটো কাপ তুলে নিল। জয় জিজ্ঞাসা করল—

—তুমি কিছু কারণ বলতে পার রুবি। এ কদিন ত ও তোমাদের ক্লাবে আসত

আমরা তুজনে একই সঙ্গে থাকতাম, কিন্তু মেরি সুইসাইড করতে যাবে এমন কোনো ইঙ্গিত ত আমি খুজে পাচ্ছি না

—আচ্ছা ইনসান নামে তুমি কাউকে চেন ?

—ইনসান ? হ্যাঁ খুব চিনি, আমি ত তার সঙ্গে মেরির আলাপ করিয়ে দিয়েছি। বেশি দিন নয়, মাত্র কয়েক দিন। তুমি তাকে সন্দেহ করছ নাকি ?' তার সঙ্গে মেরি কিছু করেছে বলে ভাবছ নাকি ?

—বাধা কোথায় ?

—না কোনোই বাধা নেই। কিন্তু তোমার এ সন্দেহ অমূলক। কারণ মেরি মুখে যাই বলুক না কেন সে খুব শক্ত মেয়ে। তাছাড়া সে তোমাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষের কথা চিন্তা করে না। তোমাকে খুব ভালবাসে। ভীষণ, না জয়, ইনসানের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল ঠিকই কিন্তু লোকটার ত কোনো ক্ষমতাই নেই। দেখতে বেশ সুন্দর হলে কি হয় কোনো যুবতী তার দিকে ঢলে পড়লে তার কপালেও চুমো খাবার সাহস নেই লোকটার। না জয় ওদিকে তোমার সন্দেহ করবার কিছু নেই। আমি নিজে ধোয়া তুলসী পাতা নই কিন্তু মেরি সত্যিই ধোয়া তুলসী পাতা। মেরি খুব ভাল মেয়ে। আমি আজই তাকে দেখতে যাব

—আর দুদিন পরে। ওর চিকিৎসা চলছে যার ফলে ও সব কথা এখন মনে করতে পারে না। তোমাকে আমি খবর দেব, তখন যেয়ো। ইনসানের ঠিকানা জান ?

—জানি। পার্ক স্ট্রীটের শেষের দিকে অ্যাডেলফি হোটেলে ও থাকত কিন্তু ও ত ক'দিন আসছে না

—ও বোধহয় আর আসবে না, তোমার কাছে ওর কোনো ফটো আছে বা চেহারার বর্ণনা

—চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, ফটো ও নেগেটিভ দুইই আছে। এক মিনিট, একদিন আমি, মেরি আর ইনসান পাশাপাশি বসে ছিলাম সেই সময়ে আমার এক বান্ধবী ফটো তোলে, এই মাত্র কাল সে একখানা ছবি আর নেগেটিভটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে

—ভেরি গুড, কই দাও ত দেখি

—এক মিনিট

রুবি দু হাত তুলে মাথার চুল ঠিক করতে লাগল। বুকের বোতাম খোলাই ছিল। [illegible] !

—অসভ্য, এখন ছাড়, দরজা খোলা। হাসিনা ঘোরাফেরা করছে। দাঁড়াও ইনসানের ছবিখানা খুঁজে বার করি

রুবি প্রথমে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুঁজে দেখল। না সেখানে নেই। তারপর উঠে তার রাইটিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা সাদা খাম বার করল। সেই খামের ভেতরেই ছবিখানা আর নেগেটিভ ছিল।

প্রথমে মেরি তারপর রুবি এবং সব শেষে একটু তফাতে ইনসান বসে রয়েছে। মেয়ে দুজন পরে আছে বিকিনি আর ইনসান সুইমিং ট্রাংক। সত্যিই ছোকরার চেহারা বেশ সুন্দর। একধারে থাকায় সুবিধা হয়েছে, মেয়ে দুজনকে সহজে বাদ দিয়ে ওর ছবিটা আলাদা করে বড় করা যাবে

—তুমি ইনসানের ছবি নিয়ে কি করবে ?

—ওকে খুঁজে বার করব

—তুমি মেরিকে মিছামিছি সন্দেহ করছ জয়, মেরি নির্দোষ তা ছাড়া বললাম না ইনসান দেখতেই ঐ রকম। আসলে রাঙা মূলো, কোনোই কাজের নয়, জল ভসকা।

—যাই হক নেগেটিভটা আমার কাছে থাক। ইনসানের ছবিটা আলাদা করে নেব আর তোমাদের দুজনেরও আলাদা একটা বড় ছবি করে রাখব। আমার ড্রয়িংরুমে টাঙিয়ে রাখব। তুমি আমার উপকার করলে।

—ঠিক আছে নিয়ে যাও, কিন্তু তুমি আবার কবে আসবে ?

—শীগগির আসব। হয়ত কালই আসতে পারি।

তার অফিসের স্ট্রং রুম থেকে যে টি এস জিরো ওয়ান চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাটল প্ল্যান চুরি গেছে এ কথা জয়শংকর রুবির কাছে স্রেফ চেপে গেল।

—রুবি তাহলে আমি যাই

—বেশ, আমি চাই তোমরা তুজনে সুখে থাক আর মাঝে মাঝে আমাকেও সুখী রেখো, যাবার আগে আমাকে কিস করে যাও, যখন ইচ্ছে আমার কাছে এস, যা দরকার চাইতে সঙ্কোচ কোরো না।

জয়শংকর রুবিকে জড়িয়ে না ধরে তার তুই গালে ও ঠোঁঠে চুমো খেয়ে বিদায় নিল!

এখন সে যাবে পার্ক স্ট্রীটে অ্যাডেলফি হোটেলে।

রিসেপশনে একজন যুবতী বসেছিল। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

—মিঃ ইনসান কি হোটেলে আছেন?

—মিঃ ইনসান ওমর?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওমর।

—ছাট হ্যাণ্ডসম বয়, না সে ত হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে?

—হ্যাঁ, সে হঠাৎই চলে গেছে। বাট হি ওয়াজ ভেরি জেনারাস, আমাকে সুন্দর একটা ব্রুচ দিয়ে গেছে।

—কোথায় গেছে? মানে ও কি দিল্লী গেছে? কিছু বলে গেছে কি?

—ভেরি সরি স্যার। কাউকে কিছুই বলে যায় নি।

—মালপত্তর সব নিয়ে গেছে?

—মালপত্তর আর কি, শুধু ত একটা স্যুটকেস। সেটা সে নিজেই নিয়ে চলে গেল। হোটেলের গাড়িতেও যায় নি, পথে হয়ত কোথাও ট্যাক্সি করে নিয়েছে।

—আমার নামে কোনো মেসেজ রেখে-যায় নি? আমার নাম মনোজশংকর।

মেয়েটি পাশের একটা ড্রয়ার খুলে দেখল। কয়েকখানা চিঠি ছিল। কিন্তু মনোজশংকরের নামে কোনো চিঠি নেই। থাকবেই বা কেন? জয়শংকর কেনই বা জিজ্ঞাসা করতে গেল?

—আচ্ছা ইনসান যে ঘরে আছে সেই ঘরখানা আমি একবার দেখতে পারি?

—কোনো লাভ নেই মিঃ শংকর। কারণ মিঃ ওমর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর সাফ ত করাই হয়েছে, এমন কি সেই ঘরে বোর্ডারও এসে গেছে।

—তাহলে আর কি করব। থ্যাংক ইউ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে জয়শংকর নিজের গাড়িতে উঠল। পার্ক স্ট্রীটেই একটা বড় ছবির দোকানে ছবি এনলার্জ করতে দিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে শুনল রুবি নামে এক মহিলা তাকে ফোন করেছিল। জয়শংকর বাড়ি ফিরে যেন রুবিকে ফোন করে।

কি ব্যাপার? অনেক দিন পরে জয়শংকরকে দেখে রুবি কি থাকতে পারছে না? না কি সে ইনসানের কোনো খবর দেবে? কিন্তু কোথায় ফোন করবে? রুবির ফোন নম্বর সে জানে না, সেও কোনো ফোন নম্বর বলে নি। মেরি হয়ত জানতে পারে, কিন্তু তার স্মরণশক্তি এখন বিলুপ্ত।

মেরির আয়াকে ডেকে সে কফি আনাল। কফি খেতে খেতে ভাবতে লাগল, ব্যারিকে এখন স্কুল বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে ভালই হয়েছে নইলে তার জন্যে সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতে হত। তারও অসুবিধে হত। বোর্ডিংয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে ভালই থাকবে।

কফি খেয়ে একবার মেরির কাছে গেল। মেরি তখন শুয়ে একখানা ছবির পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখছিল। জয়শংকর খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মেরিকে চুমো খেল। জিজ্ঞাসা করল—

—কেমন আছ মেরি—

—কি হয়েছে বলত আমার। একজন মেয়ে মানুষ এসে আমার অনেক সেবা করছে। ও কে?

—কেন মেরি, ও ত তোমার নার্স

—নার্স কেন?

জয়শংকর বুঝল ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে মেরির কিছু স্মৃতি-ভ্রংশ হবে, এ বোধহয় তারই লক্ষণ। মেরিকে বলল:

—নার্সকে আমিই আনিয়েছি। উনি আর কিছুদিন থাকবেন। তুমি এখন একটু বই পড়, আমি একটু ঘুরে আসছি

—তাড়াতাড়ি এস যেন, আমার ভয় করে

—আমি এখনি আসছি

রুবির ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখল যে রুবি তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই বলল, তোমাকে এইমাত্র ফোন করেছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি আমার বাড়িতেই আসছ, দেখেছ আমি কি বোকা। তোমাকে ফোন করতে বলেছি কিন্তু আমার নম্বরটা জানাইনি আর আমার যে ফোন রয়েছে সে আমার নামেও নেই।

— আমি অনুমান করলাম যে ইনসান সম্বন্ধে তোমার কিছু মনে পড়েছে তাই আমাকে ডেকেছ, যাক ওর কথা ফোনে না বলে ভালই করেছ। মেরির কানে উঠলে ওর ক্ষতি হতে পারে। মেণ্টাল ট্রিটমেণ্ট হচ্ছে ত।

—এস, এইখানে বোসো।

ওরা গিয়ে বারান্দায় বসল। হাসিনা দুজনকে দু গেলাস সরবত দিয়ে গেল। রুবি বলল, বাদামের সরবত। হাসিনার মায়ের ফরমুলা। ভারি চমৎকার, আমি রোজ দু গেলাস করে খাই। সকালে

এক গ্লাস, সন্ধ্যায় এক গ্লাস, টনিক। ক্ষিধে হয়, ঘুম হয়, ক্লান্তি দূর করে। কি জানি বাটা বাদামের সঙ্গে কি সব মেশায়, সামান্য একটু সিদ্ধি আর কি দেয় যেন। খেয়ে দেখ বেশ স্ফূর্তি হবে।

সরবতের গেলাসে চুমুক দিয়ে জয়শংকর জিজ্ঞাসা করল, এবার বল কি খবর।

—দেখ তখন অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম, সত্যি বলছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, পুরনো কথা মনে পড়ছিল।

—যাক, এখন কাজের কথা বল।

—কাজের কথা হল কি যে তুমি নরেন্দ্রপুর চেন?

—চিনি, কি হয়েছে।

—নরেন্দ্রপুর ছাড়িয়ে মাইল খানেক গেলে একটা একতলা বাড়ি তোমার চোখে পড়বেই পড়বে।

—কেন পড়বে?

—বাড়ি খানা ছোট, এক তলা। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড কিন্তু পিকিউলিয়ারিটি হচ্ছে কি বাড়িটার ছাদের কার্নিসের ওপরে মানুষের নানা রকম মূর্তি আছে। মেয়ে পুরুষ দুই। বেশ বড় বড়। কিসের তৈরী জানি না, হয়ত পোড়ামাটির কিন্তু বেশ সুন্দর। এই বাড়িখানা তোমার চোখে পড়বেই পড়বে।

তা সে বাড়িতে কি হয়েছে।

—মানে আমি যার সঙ্গে আছি সেই ভদ্রলোকের ওদিকে একখানা বাগান বাড়ি আছে। প্রায় প্রতি শনিবার সকালে আমরা যাই, রবিবার বিকেলে ফিরে আসি। গত শনিবার যখন যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম বাড়ির গেটে ইনসানের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকছে। তুমি ওকে অ্যাডেলফি হোটেলে না পেলে হয়ত ওখানে পেতে পার।

—ভাল খবর দিয়েছ ত। অ্যাডেলফিতে ওকে পাইনি। ও

হোটেল ছেড়ে কোথায় গেছে কেউ জানে না। কাল সকালেই খোঁজ নিতে হবে, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

—না আমি কাল সকালে যেতে পারব না। আমার এক ফ্রেণ্ড আসবে, সারাদিন থাকবে। এখানে বসে সে ছবি আঁকে।

—জানি, সেই ছোকরা যাকে তুমি রেখেছ, তাই না ?

—ঠিক, কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

—মেরি আমাকে বলেছিল।

—বেশ সুন্দর ছবি আঁকে কিন্তু। আমার কয়েকখানা ন্যুড এঁকেছে। একখানা কোথায় নাকি গোল্ড মেডেলও পেয়েছে। দেখবে ?

—একদিন দিনের বেলায় দেখব। এখন তুমি পাশে থাকতে তোমার ছবি দেখে লাভ কি ?

—কি যে বল

—যাক আমি আজ উঠি, ইনসানের আর কোনো খবর পেলে আমাকে জানিয়ো। থ্যাংক ইউ।

রুবি তার ঠোঁট এগিয়ে দিল। জয়শংকর চুম্বন করে বিদায় নিল।

পরদিন সকালে জয়শংকর গাড়ি নিয়ে বেরোল ইনসানের উদ্দেশ্যে। বেরোবার আগে রুবি, মেরি ও ইনসানের গ্রুপ ফটোখানা সঙ্গে নিল।

নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের যে স্কুল আছে সেই স্কুলে জয়শংকর দু একবার এসেছিল। রাস্তা তার অপরিচিত নয়। রুবির পরামর্শ মতো রাস্তা ধরে সে চলল। ঠিক। খানিকক্ষণ যাবার পর দূর থেকেই সে মানুষের মূর্তিওয়ালা বাড়িখানা দেখতে পেল। বেশ বড় কম্পাউণ্ডের মাঝখানে বাড়ি, সবুজ রং। বাড়ির চারদিকে ঘিরে কম্পাউণ্ডওয়াল ঘেঁসে শুধু ছাতিম গাছ। বাড়ি ঘিরে ফুল ও সবজির বাগান।

গেটের সামনে জয়শংকর গাড়ি দাঁড় করিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। কেউ কোথাও নেই। গেট থেকে একটা রাস্তা সোজা গেছে বাংলোর দিকে। আর চারদিক ঘিরে লাল কাঁকরের রাস্তা। ডান দিকের রাস্তা দিয়ে জয়শংকর দেখল সামনে গ্যারাজ। দরজা বন্ধ। কিন্তু দরজার মধ্যে ছোট একটা জানালা রয়েছে। জানালাটা খোলা কিন্তু ভেতরটা প্রায় অন্ধকার।

কি মনে করে জয়শংকর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল ভেতরে গাড়ি আছে না আর কিছু আছে। অন্ধকার হলেও দেখা গেল ভেতরে ৬৩ মডেলের একখানা অ্যামেরিকান গাড়ি রয়েছে।

গাড়িটা সত্যিই ৬৩ মডেলের কি না স্থির করবার জন্যে জয়শংকর এক মনে সেদিকে চেয়ে দেখছিল।

—কি দেখছেন? কাউকে খুঁজছেন নাকি?

জয়শংকর চমকে উঠল। সে ফিরে দাঁড়াল। একজন দীর্ঘকায় পাঞ্জাবী শিখ। কাঁধ থেকে কৃপাণ ঝুলছে। গোঁফ দাড়ি ও মাথায় পাগড়ি ও সালোয়ার কামিজ স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে লোকটি শিখ।

জয়শংকর খুব সপ্রতিভ। সে মোটেই অপ্রস্তুত হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিল—

—হ্যাঁ সর্দারজী, আমি একজনকে খুঁজছি। আমার চাকরীই হল কাউকে না কাউকে খুঁজে বার করা।

সর্দারজী ধরে নিল সাহেব নিশ্চয়ই ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক। সর্দারজী কিছুদিন মিলিটারিতে ছিল। খটাস করে এক সেলাম ঠুকে বলল:

—মুঝে মাফ কিজিয়ে। আমি চিনতে পারি নি। কাকে খুঁজছেন সাহেব?

জয়শংকর পকেট থেকে গ্রুপ ফটোখানা বার করে ইনসানের চেহারা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

—এই সাহেবকে চেন?

বেশ কিছুক্ষণ ছবির দিকে সর্দারজী চেয়ে রইল। ইনসানকে দেখছিল নাকি বিকিনি পরা মেয়ে দুটিকে দেখছিল! ঠিক বোঝা গেল না। প্রায় মিনিট দুই পরে মুখ খুললো৷

—দেখুন সায়েব লোকটিকে খুব চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু....

—ঠিক, চেনা মনে হওয়া উচিত। ছবিতে লোকটির গোঁফ রয়েছে কিন্তু এখন সে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে।

—ঠিক বলেছেন সায়েব। এই লোক ত এই বাড়িতেই রয়েছে। হ্যাঁ, ইনিই ত ফিলিপ সায়েব।

—ফিলিপ সায়েব? খাঁটি সায়েব নাকি? ইংরেজ?

—না হুজুর উনি বলেছেন ওঁর নাম ফিলিপ।

—ফিলিপ কি?

—তা জানি না হুজুর, এই বাড়ি হল রায়চৌধুরী বাবুর। খুব বড় লোহার ব্যবসা আছে। কলকাতায় শোভাবাজারে থাকেন। ফিলিপ সাহেব আমার বাবুর কাছ থেকে বাড়িভাড়ার রসিদ এনে দেখালেন, আমি তাঁকে থাকতে দিলাম।

—ফিলিপ সায়েব এখন আছে?

—না হুজুর, তিনি দার্জিলিং না কোথায় গেছেন। মঙ্গলবারে গেছেন, কাল শনিবার ফিরবেন বলে গেছেন। লোকটা কি বদ নাকি হুজুর? যদি বলেন তাহলে ওকে ভাগিয়ে দি। বাবু ভাড়া দিয়েছেন ত কি হয়েছে, কি করে তাড়াতে হয় আমি জানি।

—না, না, তাড়িয়ো না। আমি ওর খোঁজে কাল আসব তবে সর্দারজী তুমি ত ফৌজীতে ছিলে। খুব চালাক লোক, আমি এসেছিলাম ফিলিপ সায়েবকে বোলো না যেন

—না হুজুর আমি কিছুই বলব না

—ঠিক ত?

—ঠিক হুজুর।

—তোমার নাম কি সর্দারজী?

—আমার নাম হুজুর দরবারা সিং।

ফেরবার পথে জয়শংকরের একটা খটকা লাগল। মেরি যেদিন আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেইদিন রাত্রে ইনসান তাকে ফোন করেছিল অথচ দরবারা সিং বলছে যে ইনসান মঙ্গলবারেই দার্জিলিং গেছে। তাহলে ফোন কে করেছিল? ইনসান স্বয়ং না আর কেউ, নাকি ইনসান দার্জিলিং যাবার নাম করে কলকাতায় গিয়ে অ্যাডেলফিতে ছিল।

এ বিষয়ে মেরি হয়ত তাকে কিছু বলতে পারে। কিন্তু সে বেচারী ত এখন অসুস্থ। তা ছাড়া চিকিৎসার ফলে হালের ঘটনা সে সব ভুলে বসে আছে। ভাগ্যে চিকিৎসার আগে মেরি তাকে কিছু বলেছিল, নইলে তাকে অগাধ জলে পড়তে হত।

কাল তাকে আবার নরেন্দ্রপুরে ফিরে আসতে হবে। লোকটার ত কাল ফেরার কথা। কাল তাহলে সে কখন আসবে? তার চেয়ে পরশু ভোরেই আসা ভাল। তাই হবে।

রবিবার। অন্ধকার থাকতেই জয়শংকর উঠে পড়ল। লোকটা মানে ইনসান সকালে কোথাও বেরিয়ে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে। সাড়ে ছটার মধ্যে জয়শংকর নরেন্দ্রপুরে পৌঁছবে।

দাড়ি কামিয়ে বাথরুম থেকে এসে জয়শংকর নিজেই এক কাপ কফি করে নিল। বিস্কুট ত ছিলই এবং প্রতিদিনের মতো ব্রেক-ফাস্টের সঙ্গে একটি মালটিভিটামিন ক্যাপসুল খেয়ে মেরিকে একবার দেখে এল। মেরি তখনও ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া রাত্রে তাকে সিডেটিভ দেওয়া হয়। অতএব বেশ বেলা পর্যন্তই সে ঘুমোবে। কাজ সেরে ফিরে এসেও হয়ত দেখবে যে মেরি ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে মনে করেছিল জয়শংকর অত তাড়াতাড়ি যেতে পারল না। আলিপুর থেকে গোল পার্কের

কাছাকাছি আসতেই তার গাড়ির এঞ্জিনের সামনে একটা গোলমাল দেখা দিল। সেটা এখনি ঠিক করে না নিলে একটু পরেই গাড়ি হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ এঞ্জিন ঠিক করিয়ে যেতে হলে বেশ বেলা হয়ে যাবে।

অল্পদূরেই একটা সার্ভিস স্টেশন ছিল। জয়শংকর গাড়ি সেখানে জিম্মা করে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। ফেরবার সময় সার্ভিস স্টেশন থেকেই গাড়ি নিয়ে ফিরবে। ততক্ষণে নিশ্চয় রিপেয়ার হয়ে যাবে। কিন্তু এদিকে যে দেরি হয়ে গেল। এতক্ষণে সে হয়ত নরেন্দ্রপুরে পৌঁছে যেত।

এদিকে যে ট্যাক্সিটায় সে যাচ্ছে তার স্পিড বাড়ানো যাচ্ছে না। যেতে যেতে জয়শংকর লক্ষ্য রাখছে যে অপর দিক থেকে ৬৩ মডেলের সেই অ্যামেরিকান গাড়িখানা আসছে কি না। তাহলে পথেই সে ইনসানকে ধরবে।

নরেন্দ্রপুরে রায়চৌধুরীর বাংলোয় সে যখন পৌঁছল তখন দরবারা সিং বাগানে মালি খাটাচ্ছে। জয়শংকরকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এসে খটাস করে স্যালুট দিয়ে বলল, যে ফিলিপ সায়েব আছে। কাল রাত্রে ফিরেছে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে। কোথাও বেরোবে বোধহয়।

জয়শংকর ঠিক করল প্রথমে সে নিজের নাম বলবে না তাহলে ইনসান তাকে ঢুকতে দেবে না হয়ত।

দরজার পাশে কলবেলের বোতাম টিপল জয়শংকর। দুবার টিপতে হল না। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা খুলে গেল। হ্যাঁ, এইত সেই ইনসান ওমর, গোঁফবিহীন। চিনতে ভুল করল না জয়শংকর।

ইনসানও চেয়ে দেখল জয়শংকরকে কিন্তু মুখে কোনো ভাববৈ-লক্ষণ্য দেখা গেল না। দরজাটা ভাল করেই খুলে দিয়ে একটু পাশে সরে দাঁড়াল যাতে জয়শংকর ভেতরে ঢুকতে পারে।

—আমি এই বাড়ির মালিক মিঃ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে আসছি, আমি তাঁর ম্যানেজার, বাড়িতে কি নতুন ইলেকট্রিক কাজ হয়েছে সেইটে আমার দেখা দরকার। আপনিই ত মিঃ ফিলিপ?

—ভেতরে আসুন

জয়শংকর ভেতরে ঢুকল। ইনসান দরজা বন্ধ করে দিল। তখন জয়শংকর বলল, আমি মিঃ রায়চৌধুরীর ম্যানেজার নই। আমি........

—আমি আপনাকে চিনি। আপনি মেরির স্বামী জয়শংকর কাপুর। আপনাদের শোবার ঘরে আপনার একটা বড় ফটোগ্রাফ আছে

উত্তর শুনে জয়শংকর মনে মনে ভীষণ চটে গেল। ইচ্ছে হল লোকটার মুখে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দেয়, লোকটা তার বৌ-এর নাম ধরে ত ডাকছে, কতই যেন ভাব, আবার তাদের শোবার ঘরেও ঢুকেছিল, সে কথাও বলছে।

ইনসান তখনও থামে নি। সে বলল:

—এত সকালে এসেছেন, ব্রেকফাস্ট হয় নি নিশ্চয়। ভাল কিছু দিতে পারব না। ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, চা চলবে?

—না থাক, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, এখন তুমি আমার সঙ্গে দয়া করে চল

—কোথায় যেতে হবে?

—কলকাতায় সি বি আই-এর দপ্তরে

—আরে কি আশ্চর্য। আমি যে সেখানেই যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সেই কি একটা কথা আছে না গ্রেট মাইণ্ডস থিংক অ্যালাইক।

জয়শংকর তার পকেট থেকে তার সিকিউরিটি পি-৩৮ রিভলভার বার করে বলল, আমাকে বোকা মনে কোরো না। আমার সঙ্গে চল

—বোকা ভাবিনি স্যার, আপনি বোকা হলে আমাকে নিশ্চয় খুঁজে বার করতে পারতেন না, অতবড় চাকরিও করতে পারতেন না

রিভলভার দেখে ইনসান একটুও ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। জয়শংকর যেন হাতে সিগারেট ধরে আছে, তার ভাবখানা এই রকম। সে বলতে লাগল

—কিন্তু স্যার ব্যাপারটা খুব হালকা নয়

—সেটুকু জ্ঞান আমার আছে, তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করবে আর আমি সেটাকে হালকা মনে করব এ রকম তুমি ভেবো না, এতক্ষণ যে তোমাকে মেরে ফেলি নি সেই তোমার ভাগ্য। শুধু আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা নয় তুমি আরও বেশি অন্যায় কাজ করেছ

—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি স্যার, মিসেস কাপুরের মতো সপ্রতিভ ও সমঝদার মহিলা বিরল, তাঁকে আমি একই সঙ্গে আমার বৌদি ও শালীর আসনে বসাতে পারি

—আজে বাজে কথা বাদ দিয়ে মূল কথাটা বল

—হ্যাঁ বলছি। আমি এবং মিসেস কাপুর দুজনেই একটা বদ দলের পাল্লায় পড়েছি, তারা টি এস জিরো ওয়ান ব্যাটল প্ল্যান ফেরত দিতে পারে কিন্তু সেজন্যে তাদের পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে নইলে তারা আমাকে ও মিসেস কাপুরকে হত্যা করবে। বিশ্বাস করুন এই টাকার মধ্যে আমার কমিশন বা শেয়ার কিছুই নেই, আমি শুধু

টেলিফোন বেজে উঠল

—নোড়ো না। জয়শংকর আদেশ করল, আমি ফোন ধরব

ইনসানের দিকে রিভলভারের নল রেখে জয়শংকর এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল। যতটা সম্ভব ইনসানের কথা বলার ভঙ্গি নকল করে বলল :

—হ্যালো.

—আরে ভাই ইনসান

—কি বল, কণ্ঠস্বর জয়শংকরের পরিচিত বলে মনে হল

—আরে শুনেছ? কাপুর মাগীটা নাকি সুইসাইড করতে গিয়েছিল? মনে হচ্ছে সে তার বরকে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। তাহলে ত আর দেরি করা যায় না....হ্যালো, শুনছ

জয়শংকর অবাক। এ কণ্ঠস্বর তার খুবই পরিচিত। টেলিফোনে যে কথা বলছে তাকে, সে খুব ভাল করে চেনে। তার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। কি আশ্চর্য! এমনও হতে পারে!

দিল্লী

সি বি আই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের অফিস। ইনভেস্টিগেশন চিফ রামদাস শেঠী তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। একটা অত্যন্ত জরুরী কেস তাঁর সামনে।

কলকাতা থেকে টুকরো টুকরো ভাবে খবরটা পেয়েছেন। সেই টুকরো খবরগুলি সাজিয়ে তিনি পুরো একখানা নোট লিখে টাইপ করিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন। অফিস প্রায় ফাঁকা। জরুরী কাজের জন্য মাত্র কয়েকজন লোক আছে।

তিনি ক্যাপ্টেন জগদীশকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ক্যাপ্টেন জগদীশ বাড়ি নেই, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ডিফেন্স কলোনিতে গেছে। ডিফেন্স কলোনির সেই বাড়িতে ফোন করা হয়েছে। জগদীশ যেন বাড়ি ফেরবার আগে সি বি আই-তে আসে। আর ডি স্বয়ং ডেকেছেন। রামদাস শেঠীকে সকলে সংক্ষেপে আর ডি বলে।

জগদীশ চৌধুরী একদা ফৌজিতে ছিলেন। সেখানে শত্রু-পক্ষীয় গুপ্তখবর সংগ্রহে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়। কিভাবে তিনি ফরেন সার্ভিসে বদলি হলেন সে খবর আমাদের জানা নেই। জগদীশ কয়েকটি দূতাবাসে প্রেস অ্যাটাশির কাজ করেছিল।

ফরেন সার্ভিস থেকে জগদীশ চৌধুরী কিভাবে সি বি আইতে

গেল সে খবরও আমাদের অজ্ঞাত। সি বি আই-তে সে ক্যাপ্টেন রূপে পরিচিত। সি বি আই-তে সে প্রচুর দক্ষতার প্রমাণ দেখিয়েছে। তার প্রধান কাজ হল বিদেশী দূতাবাসের কর্মীদের ওপর নজর রাখা। এ কাজ সে অবশ্য একা করে না। তার কয়েকজন সহকারী আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার ফলে জগদীশকে রাষ্ট্রপতির পদক দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে।

এত রাত্রে সাধারণতঃ হেডকোয়ার্টারে জগদীশের কোনোদিন ডাক পড়েনি। তার নিজের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। সে ট্যাক্সি নিয়ে ডিফেন্স কলোনিতে গিয়েছিল। অত রাত্রে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। তখন জগদীশ হেডকোয়াটারে ফোন করে গাড়ি আনাল।

ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর নইলে এতরাত্রে আর ডি স্বয়ং তাকে ডাকতেন না। জগদীশ যখন আর ডি-এর চেম্বারে ঢুকল তখন দেওয়ালের ঘড়িটাতে টুং টাং করে বারোটা বাজল।

—বোসো জগদীশ, আই অ্যাম ভেরি সরি। নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে তোমাকে ডেকে পাঠাতে হল কিন্তু কেসটা খুবই জরুরী, কালই তোমাকে ক্যালকাটায় ফ্লাই করে যেতে হবে, এই নাও আমার নোট, বাড়িতে ফিরে পড়ে নিও

—একটু সংক্ষেপে যদি বলেন স্যার

—কলকাতায় আলিপুরে আমাদের ন্যাশনাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস-এর চিফ জয়শংকর কাপুরকে চিনতে ?

—চিনতাম বৈকি স্যার, এই ত সেদিন দিল্লীতে ছিলেন, স্পেশাল ট্রেনিং নিতে মস্কো গিয়েছিলেন, হ্যাঁ কি হয়েছে ?

—আমরা তাকে হারিয়েছি, উই হ্যাভ লস্ট হিম

—মানে ? তিনি কি ডিফেক্ট করে অন্য দেশে চলে গিয়েছেন ?

—আরে না না তা নয়, কলকাতা থেকে কিছুদূরে চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ডে গঙ্গার ধারে সোমবার দিন তার ডেড বডি পাওয়া গিয়েছে, তার ডান হাতে ধরা ছিল তার সিকিউরিটি পি-৩৮ রিভলভার

—বলেন কি স্যার ?

—প্রাথমিক অনুসন্ধানে মনে হয় জয়শংকর সুইসাইড করেছে, তার মাথা থেকে যে গুলিটা বার করা হয়েছে নিঃসন্দেহে সেটি তার রিভলভার থেকেই বেরিয়েছে। জয়শংকরের গাড়িখানাও তার ডেড বডির কাছে একটু তফাতে গাছের আড়ালে পাওয়া গেছে কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বলছে যে রবিবার বিকেলে গাড়ি খানা সেখানে ছিল না।

—বডি ত পাওয়া গেছে সোমবার ?

—ঠিক। কিন্তু ময়না তদন্ত বলছে যে জয়শংকরের মৃত্যু হয়েছে অন্ততঃ ছত্রিশ ঘণ্টা আগে, মনে হয় শনিবার রাত্রে কোনো সময়ে, তাই নয় কি ?

জগদীশ গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনছিল। সে তার জামার গলার বোতাম আলগা করে দিল। খুবই দুঃসংবাদ।

—এখন ঘটনা হচ্ছে কি, আর ডি বলতে লাগলেন, জয়শংকরের অ্যামেরিকান বৌ মেরি কাপুর আগের বৃহস্পতিবার রাত্রে স্লিপিং পিল খেয়ে সুইসাইড করবার চেষ্টা করেছিল। জয়শংকর তাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। ডাক্তারেরা স্টম্যাক পাম্প ব্যবহার করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে কিন্তু তার আত্মহত্যা প্রবৃত্তি দূর করতে ডাক্তারেরা তাকে ইলেকট্রো শ্যক ট্রিটমেন্ট করছে। সোমবারেও তাকে শ্যক দেওয়ার জন্যে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার স্বামী যে মারা গেছে তাকে জানান হয় নি। কারণ ডাক্তারেরা মনে করে যে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেলে মেরি হয়ত আবার আত্মহত্যা করতে চাইবে

একটা সিগার ধরাতে ধরাতে আর ডি বলতে থাকলেন :

—মেরির নার্স বলেছে যে শনিবার সন্ধ্যায় একজন টেলিফোন করে বলে যে সে জয়শংকর, সোমবার সকালের আগে সে বাড়ি ফিরতে পারবে না। না, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে নি, নার্স

জয়শংকরের গলা টেলিফোনে কখনও শোনে নি। মেরি তার বাড়িতেই আছে। চিকিৎসার জন্যে তাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার দিন যখন জয়শংকরের বডি সরানো হচ্ছিল সেই সময়ে একজন ইনসান ওমর ফোনে গুলজারা সিংকে জানায় যে হ্যাড থেকে মানে আলিপুরের ঐ আরকাইভস সেকশন থেকে কাশ্মীরের টিথওয়াল সেকটরের ব্যাটল প্ল্যান চুরি গেছে। গুলজারা অনুসন্ধান করে দেখে যে ব্যাপারটা সত্য। ফাইল ক্যাবিনেট থেকে টি এস জিরো ওয়ান চিহ্নিত ব্যাটল প্ল্যানের মাইক্রোফিল্ম কপি চুরি গেছে

—সর্বনাশ!

—শোনো, ঐ ইনসান ওমর কোথাকার লোক বা কি তার পরিচয় এখনও জানি না, সে বলেছে যে ঐ ব্যাটল প্ল্যান বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের হস্তগত হয় নি, একটা দলের হাতে আছে, তাদের পাঁচ লাখ টাকা দিলেই তারা ঐ প্ল্যান ফেরত দেবে অথচ দেখ নতুন একটা প্ল্যান করে সেইভাবে প্রতিরক্ষা রচনা করতেও আমাদের আরও বেশি টাকা খরচ হবে, আর ডি বললেন, ইনসান আরও বলেছে যে ব্যাটল প্ল্যানটা বিদেশী কোনো শক্তির হাতে ওরা দেবে না তবে যদি ঐ টাকা না পায় তাহলে হয়ত ওরা ঐ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে বিদেশী কোনো শক্তিকেও প্ল্যানটা বেচে দিতে ওরা দ্বিধা করবে না

—কি সাংঘাতিক! ক্যাপ্টেন জগদীশ বলল, কিন্তু ওরা যদি ইতিমধ্যে ঐ প্ল্যান নকল করে কোনো বিদেশী শক্তিকে দিয়ে থাকে?

—সেটা আমরা ধরতে পারব, কারণ মাইক্রোফিল্মভরা কৌটোগুলি সীলকরা আছে। সীলভাঙা দেখলেই আমরা ধরতে পারব যে মাইক্রোফিল্ম বার করা হয়েছিল। তাছাড়া ঐ সীলের গালা আমাদের একটা নিজস্ব ফরমুলায় তৈরি। আবার আরও একটা মজা আছে, ঐ কৌটোগুলো একবার খুললে আবার বন্ধ করাও মুশকিল

—কিন্তু কোথায় ও কিভাবে টাকা দিয়ে মাইক্রোফিল্মের কৌটো ফেরত নেওয়া হবে ?

রামদাস শেঠী মাথার একগাছি চুল টানতে টানতে বললেন : ব্যবস্থাটা এই রকম হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে ইনসানের হাতে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হবে, সবই একশ টাকার নোট। ইনসান স্যুটকেস ভর্তি টাকা নিয়ে যেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই মাইক্রো-ফিল্মের কৌটো এনে দেবে

—ইনসানকে কেউ ফলো করে নি

—না, উপায় ছিল না। তাহলে ওরা কৌটো নষ্ট করে দেবে

—টাকা কি ভাবে দেওয়া হল। মানে নম্বর লিখে রাখা হয়েছে কি ?

রামদাস শেঠী জগদীশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন : সবই জাল নোট, তুমি ত অপারেশন সিসেরো পড়েছ, বৃটিশ এমব্যাসির সেই স্পাইকে হিটলার জাল নোট দিয়েছিল

তাহলে কি টি এস জিরো ওয়ান মার্কা মাইক্রোফিল্মের কৌটো আমাদের হস্তগত হয়েছে

—পাকা খবর আমি এখনও কিছু পাইনি, তুমি কলকাতা চলে যাও, সঙ্গে একজন চৌকস লোকও নাও। ফাইলটা দিচ্ছি, ভাল করে পড়ে নাও এবং কলকাতায় পৌঁছে যা ভাল বুঝবে করবে, সমস্ত ভার তোমার ওপর

-- জয়শংকরকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ থাকতে পারে কি ?

—ফাইল পড়ে আমি কিছু কারণ পাইনি, যে সময়ে কৌটো চুরি গেছে সে সময়ে জয়শংকর কলকাতায় ছিল না তবে তার মৃত্যুর আগে সে একবার অফিসে গিয়েছিল কি করেছিল না করেছিল আমি জানি না

— জয়শংকরের বৌ মেরিকে আমাদের তরফ থেকে কেউ কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ?

—না, সে নার্সিংহোমে আছে, তাকে ছ বার ইলেকট্রো-শ্চক্‌ দেওয়া হয়েছে। তার স্মরণ শক্তি সাময়িক ভাবে অবলুপ্ত, ডাক্তারবাবুরা তার কাছে কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন

—মানে বাইরের কোনো লোক

—ঠিক তাই

জগদীশ বলল: কলকাতায় আমার একজন সহকারী আছে, এখান থেকে কাউকে নিয়ে যাব না।

—বেশ, তার নাম বল

—তার নাম হল তানবীর

—নামটা আমি নোট করে নিলাম

কলকাতায় এসে ক্যাপ্টেন জগদীশ চৌধুরী অ্যাডেলফি হোটেলেই উঠল, যে হোটেলে ইনসান ওমর থাকত। দক্ষিণ খোলা একটা ভাল ঘরই তাকে দেওয়া হল।

তানবীর কলকাতাতেই থাকে। কিন্তু জগদীশ তাকেও অ্যাডেলফিতে এনে তুলল এবং তার পাশের ঘরে। তানবীরের নিজস্ব গাড়ি আছে। জগদীশ তানবীরের গাড়িখানাও আনিয়ে হোটেলের গ্যারাজে রাখল। হোটেলে থাকলেও তানবীরকে মাঝে মাঝে বাড়ি যেয়ে থাকতে হয়।

কলকাতায় নাকি একটি ক্যাসিনোর অভাব। জগদীশ দেখতে এসেছে কলকাতায় একটা ক্যাসিনো কোথায় খোলা যায়। তার আরও একটা মতলব আছে। একতলায় থাকবে ক্যাসিনো, সেখানে জুয়ো খেলা হবে। ক্যাবারে গার্লরা নাচবে আর নাচবে মেয়ে পুরুষরা জোড়ায় জোড়ায়, বার থাকবে।

আর দোতলায় সে চালু করতে চায় ধনী ব্যক্তিদের একটি ক্লাব।

সই ক্লাবে ধনীদের সঙ্গ দেবার জন্যে কল গার্ল পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে অতি উত্তম খাদ্য ও পানীয়।

জগদীশ এইরকম বলে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে লোকজনের ইন্টারভিউ নিচ্ছে; দু চারজন ক্যাবারে গার্লেরও ইন্টারভিউ নিয়েছে। নিজে দামী পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়, হীরের বোতাম, দু হাতের আঙুলে চার পাঁচটা আংটি জ্বল জ্বল করছে। সরু গোঁফ। হেয়ার ক্রীম লাগিয়ে ব্যাকব্রাশ করে চুল এমন চকচকে করেছে যে তাতে বোধহয় মুখ দেখা যায়। একটা দাঁতে সোনার কেস পরিয়ে নেয়, মনে হয় সেই দাঁতটা যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।

তানবীর যেন তার পি এ। তার চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, তবে সব সময়ে পরে না। পরে শুধু কিছু পড়বার বা লেখবার সময়। জগদীশ খায় দামী হাভানা সিগার আর তার পি এ তানবীরের ফেভারিট হল পাইপ, ভার্জিনিয়া টোব্যাকো ছাড়া সে কিছু ব্যবহার করে না।

জগদীশ আর তানবীর দুজনে ছদ্ম আবরণের আড়ালে থাকুক না কেন দুজনে খুব কর্মতৎপর, চৌকস, চটপটে, গায়ে ভীষণ জোর, প্যাঁচ জানে কয়েক রকম, বন্দুক বা পিস্তলের লক্ষ্যও অব্যর্থ।

সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনে বেরোল। আজ দুজনে পরেছে স্ল্যাক আর ছিটের হাওয়াই শার্ট। তানবীর গাড়ি চালাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রীট থেকে চৌরঙ্গিতে পড়ে তানবীর জিজ্ঞাসা করল :

—কোথায় যাব

—চলই না

—ডান দিকে না বাঁ দিকে

—বাঁ দিকে, আলিপুর যাব, ন্যাশানাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস-এর কম্পাউণ্ডে

—ঠিক আছে তাহলে ময়দানের ভেতর দিয়ে যেয়ে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যাই

—কোন দিকে যাবে সে তুমি ঠিক করবে। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেই হল। বাঃ কলকাতার ময়দানটি কিন্তু চমৎকার

—শুধু চমৎকার নয়, কলকাতার গৌরব

—তা তুমি ঠিক বলেছ তানবীর

—ঠিক বলিনি ?

— আমি তোমার সঙ্গে একমত। তাহলে অত জোরে না যেয়ে একটু আস্তে চল, এই সকালে ময়দানের ভেতর দিয়ে যেতে আমার বেশ ভালই লাগছে

—কিন্তু এ পথ শীগগিরই ফুরিয়ে যাবে

— তাহলে এখানকার কাজ শেষ হলে একদিন এসে সারা ময়দান পায়ে হেঁটে বেড়ান যাবে

—কিন্তু দিনে স্যার ময়দান এমন সুন্দর দেখছেন আর রাত্রে এই ময়দান আবার বিভীষিকা, কত কাণ্ড ঘটে, কত ব্লাকমেল, কত ছিনতাই, কত অপহরণ, খুন, জখম, দুর্ঘটনা

—তা এখানকার পুলিস কিছু করে না ? জগদীশ জিজ্ঞাসা করে

—করে বৈকি, তবে বিরাট শহর এই কলকাতা, বিরাট এই ময়দান। ময়দানের জন্যে বিশেষ পুলিসের ব্যবস্থাও আছে কিন্তু তা বোধহয় যথেষ্ট নয়

এই ভাবে ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে স্যাড বিল্ডিং-এর কম্পাউণ্ডে এসে পড়ল। জয়শংকরের কোয়ার্টার খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ওরা গাড়ি থেকে নেমে যখন জয়শংকরের কোয়ার্টারে ঢুকতে যাচ্ছে তখন মেরি কাপুরের আয়া সুকুমারী কোথা থেকে ফিরছিল।

জগদীশই ওকে জিজ্ঞাসা করল: মেমসায়েব মানে মিসেস কাপুর বাড়ি আছেন

—আছেন কিন্তু তিনি ত অসুস্থ,

—জানি, আমরা ওঁর নার্সিংহোমের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেই

আসছি, জরুরী কাজেই এসেছি, আমরা ওঁকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন

—বলছি, কিন্তু তুমি কে?

—আমার নাম সুকুমারী মণ্ডল, আমি মিসেস কাপুরের আয়া

—অ, তাহলে ঠিক আছে, আমরা আসছি দিল্লী থেকে, আমরা মিঃ কাপুরের মৃত্যুর বিষয় খোঁজ খবর করতে এসেছি, জগদীশ বলল

—বেশ, তাহলে আসুন, কিন্তু মেমসায়েবকে বেশি বিরক্ত করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না। জানেন বোধহয় যে ডাক্তারবাবুরা মেমসায়েবের কি চিকিৎসা করছেন তাতে তিনি সব কথা মনে করতে পারেন না

—হ্যাঁ, তাও আমরা জানি

—এই যে এদিকে আসুন

সুকুমারী, জগদীশ ও তানবীরকে বারান্দায় নিয়ে গেল। বারান্দায় গদি আঁটা একটা বেতের চেয়ারে বসে মেরি নিজেই কমলা লেবু ছাড়িয়ে খাচ্ছিল। পাশে ছোট একটা টেবিল, তার ওপর কয়েকখানা পত্রিকা রাখা রয়েছে। চোখে বোধহয় রোদ বা তীব্র আলো সহ্য হয় না তাই চিক ফেলা রয়েছে, চিকের ভেতর দিয়ে বারান্দায় জায়গায় জায়গায় রোদের সরু সরু লাইন এসে পড়েছে। একটা বড় ফুলদানিতে নানারকম ফুল সাজানো রয়েছে। ওধারে একটা মনি প্ল্যাণ্ট লতিয়ে লতিয়ে ওপরে উঠে গেছে।

বারান্দায় আরও কয়েকটা গদি আঁটা চেয়ার ছিল। জগদীশ ও তানবীর দুজনে দুখানা চেয়ারে বসল। সুকুমারী ওদের কয়েক সেকেণ্ড আগে এসে জানিয়ে দিয়েছে যে দিল্লী থেকে দুজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মেরি কাপুর হাল্কা নীল রঙের একটা পাত্‌লা শাড়ি আর ফিকে হলদে রঙের একটা চোলি পরেছিলেন। মাথার চুল সোনালী,

ছোট করে ছাঁটা, ধারালো মুখ কিন্তু বিবর্ণ। দেহের গড়ন ভাল। স্নেহময়ী গৃহিণীর বেশ একটা ভাব আছে।

মেরি মুখ তুলে ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। জগদীশ নিজের পরিচয় দেবার আগেই মেরি জিজ্ঞাসা করল :

—আপনাদের ত চিনতে পারছি না, তারপর একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পুরন্ত ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, আপনারা কে ?

—আমার নাম ক্যাপ্টেন জগদীশ চৌধুরী আর এ আমার সহকারী তানবীর, আমরা আসছি দিল্লী থেকে

—তাহলে চলুন আমরা ড্রইং রুমে বসিগে যাই

—আপনি ব্যস্ত হবেন না মিসেস কাপুর, আমরা এখানে বেশ ভালই আছি

—তাহলে এখানেই বসুন। ওরে ও সুকুমারী রেডিওটা আস্তে করে দে। আর এঁদের দুকাপ চা করে দে। আর শোন আমাকে একটা সিগারেট দে না রে। কাল থেকে তুই আমাকে একটাও সিগারেট দিস নি

—সে কি বৌদি, তুমি ভুলে গেছ, এই ত এক ঘণ্টা আগে সিগারেট খেয়েছ, এই দেখ অ্যাশট্রেতে এখনও পড়ে রয়েছে

—খেয়েছি বলছিস তাহলে না হয় থাক, তুই বরঞ্চ চা করতে যাবার আগে এদের সিগারেট দিয়ে যা

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা নিজেরাই ধরাব এখন

কিন্তু সিগার বা পাইপের ধোঁয়ার গন্ধে মেরির যদি অসুবিধে হয় এই মনে করে জগদীশ বা তানবীর ধূমপান থেকে আপাততঃ বিরত রইল। চা এলে না হয় সকলে একসঙ্গে সিগারেট ধরানো যাবে

—মিসেস কাপুর আপনি আপনার স্বামীর কতদিন খবর পান নি ?

—মেরি চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথার ওপর দু হাত রেখে ভুরু কুঁচকে কি ভাবল তারপর বলল :

—কি যে আমার হয়েছে, আমার সব কথা মনে পড়ে না ; ঠিক করে বলতে পারছি না। তা দু সপ্তাহ হবে বোধহয়। নাকি অতদিনও নয় ? তোমরা কিছু খবর জান নাকি ? আমি ওর জন্যে খুব চিন্তায় আছি

—সে ত স্বাভাবিক....

—আচ্ছা জয় আমাকে চিঠি লিখছে না কেন ? ও কোথায় আছে ? আবার কোনো সিক্রেট কাজে গেছে না কি ?

সুকুমারী চা ও কিছু বিস্কুট নিয়ে এল। মেরির জন্যে ছোট্ট একটি কাপে চা। কিছু বিস্কুট। সিগারেট।

চা পানের সময় জয়শংকর সম্বন্ধে জগদীশ কোনো প্রশ্ন করল না, বোধহয় চিন্তা করবার অবকাশ দিল মেরিকে। চা খাওয়া শেষ হতে জগদীশ তানবীরকে বলল :

—তুমি গাড়িতে বোসগে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি

তানবীর বুঝল যে জগদীশ তার সামনে মেরিকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়না। সে নীচে চলে গেল।

—মিঃ জয়শংকরকে আপনি শেষ কবে দেখেছেন বলে আপনার মনে পড়ে ?

মেরির চোখ ছল ছল করে উঠল। সে মাথা নীচু করল। বোধহয় কান্না আটকাবার চেষ্টা করছে

—দেখ আমার শরীরটা ভাল নেই, কি রকম সব গোলমাল লাগছে। কিছুই ভাল লাগছে না

—আমি জানি, আপনার ইলেকট্রো-শ্যক ট্রিটমেণ্ট চলছে, সেইজন্যে আপনি সব কথা মনে করতে পারছেন না

—তুমি ঠিক ধরেছ, এই দেখ না, এই যে আমি শাড়িখানা পরেছি, ওটা কখন পরেছি কিংবা আমার কিনা তাও আমি মনে

করতে পারছি না, কি বিড়ম্বনা বলত। কই তুমি ত সিগারেট ধরালে না? আমার কোনো অসুবিধে হবে না

—আপনি?

—আমার এখন ইচ্ছে করছে না

জগদীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল: ওর জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। ও সিরিয়াস কিছু নয়

—বাঃ কি বলছ তুমি। এই দেখ না সুকুমারী এই ঘড়িটা আমার হাতে লাগিয়ে দিয়ে গেল কিন্তু আমার যে এমন একটা সোনার ঘড়ি আছে তা ত আমি একেবারেই মনে করতে পারছি না

জগদীশ দেখল যে মিসেস কাপুর এখন অনেকটা সহজ হয়েছেন। তবুও জয়শংকরের খবরটা হঠাৎ দেওয়া যাবে না।

মেরি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একবার বারান্দার ধারে গেল। চিক সরিয়ে কি যেন দেখে এসে চেয়ারে বেশ আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বলল:

—তুমি জয়ের কথা কি বলছিলে যেন

জগদীশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা যেন নিজের মনে মনেই বলল:

—কাজটা আমার নিজেরও খুব মনঃপুত নয়, তবে মনে হয় আপনি শুনলে যে আঘাত পাবেন তা এখন সহ্য করতে পারবেন, আপনাকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল কারণ পুরনো খবরের কাগজে যদি ঘটনাটা পড়ে ফেলেন কিংবা হঠাৎ কেউ যদি বলে ফেলে তাহলে হয়ত আপনার ক্ষতি হতে পারে

জগদীশ মেরির মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল। চেয়ারের হাতল দুটো ধরে মেরি একটু শক্ত হয়ে বসেছে। ঠোঁট ঈষৎ কাঁপছে। ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করল:

—তার মানে জয়ের কিছু হয়েছে নাকি

জগদীশ মাথা নিচু করল, ঘাড় নেড়ে বলল: হ্যাঁ

—সাংঘাতিক কিছু

জগদীশ মুখে কিছু না বলে আবার ঘাড় নাড়ল

—খুব সাংঘাতিক? খারাপ খবর?

মেরির মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে জল টলটল করছে, চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরেছে। তবুও আস্তে আস্তে বলল:

—তাহলেও কর্তারা তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, উত্তর শোনবার আশায় জগদীশের মুখের দিকে চাইল। জগদীশের মুখ রীতিমতো গম্ভীর

—তাহলে···তাহলে জয় কি মারা গেছে?

জগদীশ এবার উঠে দাঁড়িয়ে মেরির কাছে গিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল: ভেঙে পড়বেন না, আপনার শোক আমি বুঝতে পারছি, তবুও বলব সাহস সঞ্চয় করুন

জগদীশের শেষ কথাগুলো মেরি আর শোনে নি। তখন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জগদীশ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ডিভানে শুইয়ে দিয়ে মাথার নীচে কুশন দিয়ে সুকুমারীকে ডাকল। সুকুমারী দেখে বুঝল তার বৌদি অজ্ঞান হয়ে গেছে

—ডাক্তারবাবুকে ফোন করব? সে জিজ্ঞাসা করল

—না ফোন করতে হবে না; তুমি এক কাজ কর। ওঁর ব্রেসিয়ারের হুকটা খুলে দাও আর কোমরে পেটিকোটের দড়ি আলগা করে দাও, দিয়েছ? বেশ এবার ফ্রিজ থেকে একটু বরফ নিয়ে এস

সুকুমারী ছুটে গিয়ে ফ্রিজ থেকে কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে এল। জগদীশ সেই বরফ মেরির কপালে ও মুখে ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞাসা করল:

—ব্র্যাণ্ডি আছে?

সুকুমারী ঘাড় নাড়ল

—নিয়ে এস

সুকুমারী ব্র্যাণ্ডি আনতে জগদীশ চামচে করে একটু একটু করে কয়েক চামচে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়ে দুই গালে কয়েকবার চড় মারল, অবশ্য জোরে নয়।

একটু পরে মেরি চোখ মেলে চাইল। কয়েক মিনিট চোখ মেলে সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইল। জগদীশ ভাবল মেরি হয়ত এবার হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁদতেই থাকবে। থামানো মুশকিল হবে। কিন্তু মেরি সে রকম কিছু করল না। ঈশারা করে সুকুমারীকে ডেকে বলল : পেটিকোটের দড়ি বেঁধে দিতে, ব্রেসিয়ারের হুক লাগিয়ে দিতে। সুকুমারী সযত্নে তাই করে দিল।

—এবার আমাকে তুলে বসিয়ে দে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। মেরি কিন্তু আস্তে আস্তে ডিভান থেকে উঠে পাশের একটা শোফায় দু পা তুলে আরাম করে বসল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাঙালী মেয়ে হলে এতক্ষণে বোধহয় কেঁদে ভাসিয়ে দিত।

—এবার বলত কি হয়েছিল? জগদীশকে জিজ্ঞাসা করল

জগদীশ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার পাশে বসে বলল :

—তাকে কেউ খুন করেছে, চন্দননগরে গঙ্গার ধারে মিঃ কাপুরের বডি পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরই রিভলভার দিয়ে তাঁকে কেউ গুলি করেছিল, দেখে মনে হবে মিঃ কাপুর যেন সুইসাইড করেছেন, অন্ততঃ পুলিস তাই মনে করে। জগদীশ সংক্ষেপে কাহিনী বিবৃত করল।

সব শুনে মেরি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল :

—আমি জয়কে মেরেছি

মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? মিসেস কাপুর এসব কি বলছেন? আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে না ত?

—তা কি করে হবে, আপনি সে সুযোগ পেলেন কি করে? আপনি ত অসুস্থ হয়ে এখানে পড়ে, কোথাও যাবার মতো অবস্থাও ছিল না আপনার? এসব কি বলছেন আপনি?

মেরি জগদীশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল

—আমি নিজের হাতে তাকে খুন করি নি, আমারই জন্যে জয়কে প্রাণ দিতে হয়েছে, আমিই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী

—আচ্ছা মিসেস কাপুর ওঁকে কে হত্যা করেছে আপনি কিছু বলতে পারেন ?

—হ্যাঁ, বলতে পারি, মেরি যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল : তার নাম হচ্ছে ইনসান, ইনসান ওমর

জগদীশ মনে মনে বলল : একটা সূত্র পাওয়া গেল মনে হচ্ছে। মেরির দিকে তাকিয়ে বলল : আপনার যা মনে পড়ে বলুন ; কিছু খাবেন ? মল্টেড মিল্ক ? সিগারেট

মেরি চুপ করে বসে রইল। জগদীশ সুকুমারীকে ডেকে বলল এক কাপ মল্টেড মিল্ক তৈরি করে আনতে। সুকুমারী চলে গেল। জগদীশ সিগারেট বার করে মেরিকে দিল, নিজেও নিল। দেশলাই কাঠি জেলে প্রথমে মেরিরটা ও পরে নিজেরটা ধরাল। মেরি কয়েকটান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিল। ভাল লাগছে না

—কি সর্বনাশ ! আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না, কত কিছু বলবার আছে যে আমার

—যেটুকু মনে পড়ে সেইটুকুই বলুন, তাতেও আমার কাজ হবে

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে মেরি বলল : চিঠি নিয়ে কি একটা ব্যাপার হয়েছিল যেন, ইনসান আমার স্বামীর চিঠি চুরি করে জাল করেছিল, এরকম কি একটা হয়েছিল

—আচ্ছা আপনার সঙ্গে ইনসানের কি করে আলাপ হল, কিছু মনে পড়ে ?

—কি করে পরিচয় হল ? না মনে পড়ছে না ত ? তুমি বুঝি মনে করছ যে আমি জানি কিন্তু ভান করছি

—আমি কি ভাবছি না ভাবছি তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন

না, আপনার যা মনে পড়ে সেইটুকু বলুন, একেই দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি হলে খুনীকে হয়ত ধরাই যাবে না

—চিঠিগুলোই হল মূল...

ক্যাপ্টেন জগদীশ আরও আধঘন্টা মেরির সঙ্গে কথা বলল। নানা রকম প্রশ্ন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গল্প করে জগদীশ কথা বার করবার চেষ্টা করল। কিছু জানা গেল কিছু অস্পষ্ট রইল। মেরি কখনও তার চেতন মনে রয়েছে। কখনও রয়েছে অবচেতন মনে। যে কথা মানুষ গোপন করতে চায় বা তার নিজের গোপন ক্রিয়াকলাপ মানুষ তার অবচেতন মনের অবস্থায় বলে ফেলে। অনেকে ঘুমোবার সময় এমন সব কথা বলে যার বিষয় অন্য লোকে হয়ত কিছুই জানে না, যেমন ঘুমন্ত স্বামী এমন একটা কথা বলল যা তার স্ত্রী কখনও আশা করে নি। তা মেরি তার অবচেতন মনের অবস্থাতে এমন কিছু বলল না যা থেকে মনে হতে পারে যে মেরি দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছে।

ক্যাপ্টেন জগদীশের সন্দেহ যে ভারতীয়কে বিয়ে করলেও মেরি মার্কিন মেয়ে, সে হয়ত সি আই এ-এর খপ্পরে পড়ে ব্যাটল প্ল্যানটি চুরি করে তাদেরই হাতে তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু না। মেরি চেতন মনে যেটুকু বলেছে অবচেতন মনে তার বেশি কিছু বলে নি। আজকে তাকে আর বিরক্ত করা চলে না এবং বলতে কি মেরির স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে

নীচে নেমে এসে জগদীশ দেখল তানবীর গাড়িতে বসে বসে একটা থ্রিলার পড়ছে। জগদীশকে দেখে বই বন্ধ করল। জগদীশ তার পাশে বসল। তানবীর গাড়িতে স্টার্ট দিল

—চল তানবীর আমরা একবার বীরেন্দ্র সোনপালের সঙ্গে দেখা করে আসি

—সে কে ?

—বীরেন্দ্র হল জয়শংকরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মানে ন্যাশানাল আরকাইভস-এ জয়শংকরের পরেই তার স্থান ছিল কিন্তু এই চুরির পর তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

—বীরেন্দ্র এখন আছে কোথায় ?

—ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে তাকে একটা ইনস্ট্রাক্টরের পদে রাখা হয়েছে

—তাহলে আমরা এখন ব্যারাকপুর যাব

—হ্যাঁ, ব্যারাকপুরে এয়ারফোর্স স্টেশনে। তুমি চেন

—হ্যাঁ চিনি, ব্যারাকপুর চিড়িয়ার মোড় পার হয়েই ডান দিকে আরদালি বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে হবে

—ঠিক আছে, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চল, বাকি কাজ আমি করব।

জগদীশ ভাবল যে যেহেতু কলকাতায় তানবীর তার সহকারী সেই হেতু ঘটনা পরম্পরা তাকে জানিয়ে রাখা উচিত। ভূমিকাটুকু তানবীরের জানা আছে। জগদীশ বলল :

—জয়শংকর যখন দিল্লীতে ছিল তখন সে তার বৌকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখত কিন্তু শেষে একটা চিঠিতে হয়ত লিখেছিল যে ব্যস্ত থাকার জন্যে সে হয়ত এক সপ্তাহ চিঠি লিখতে পারবে না, সেই চিঠিখানা ইনসান ওমর কোনোভাবে হস্তগত করে

—তারপর ?

—মেরি কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়, কি এমন কাজে জয় ব্যস্ত থাকবে যে চিঠি লিখতে পারবে না ? শুধু উদ্বিগ্ন নয় মেরি অধৈর্য হয়ে পড়ে, জয়শংকরের প্রতি তার একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। ইলেকট্রো-শ্যক চিকিৎসার ফলে তার মানসিক অবস্থা এখন স্বাভাবিক নয়। নইলে সে যে কি করত বলতে পারি না

—তাহলে স্বামী-স্ত্রীতে খুব প্রেম ছিল

—ছিল, মেরির মনের অবস্থা যখন এই রকম সেই সময়ে একদিন ইনসান ওমর জয়শংকর কাপুরের একখানা চিঠি এনে হাজির। চিঠিখানা দেখে অবশ্য মেরির মনে হয়েছিল যে এ চিঠি তার স্বামীই লিখেছে, চিঠির কাগজ ও হাতের লেখায় সে কোনো তফাত লক্ষ্য করে নি

—চিঠিতে জয়শংকর কি লিখেছিল

—লিখেছিল যে সে এমন একটি দলের হাতে পড়েছে যে তারা মেরিকে যা করতে বলবে মেরি যদি তা না করে তাহলে এরা তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। মেরি খুবই ভয় পেয়ে গেল, সেই দুষ্ট লোকেরা মেরিকে কি করতে বলবে তাও সে বুঝতে পারল না, টাকা চায় না স্বয়ং মেরিকেই চায় তারা, টাকা হলে ত ছেলেটাকেই আটকে রাখতে পারত তাহলে ?

—চিঠিখানা জাল নাকি ?

—আমার এখন তাই মনে হচ্ছে

—মিসেস কাপুর কি করল তখন ?

—অনেক চেষ্টা করে মনে করে মিসেস কাপুর বলল যে সে তখন বীরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে গেল, বীরেন্দ্র তখন জয়শংকরের অনুপস্থিতিতে ন্যাশনাল আরকাইভসের চার্যে ছিল

—কোথায় দেখা করতে গেল ?

—কেন ? বীরেন্দ্রর অফিসেই গেল। অফিস ত একই কম্পাউণ্ডে যেতে কোনো অসুবিধে নেই, বোধহয় সেদিন শনিবার ছিল, ছুটি হয়ে গেছে, অফিসে বীরেন্দ্র একাই ছিল অন্ততঃ তার ডিপার্টমেণ্টে। এখানকার ঘটনা মেরির ভালই মনে পড়ে। বীরেন্দ্র তাকে সমস্ত বিভাগটা ঘুরিয়ে দেখায়, বীরেন্দ্র তাকে চুম্বন করেছিল শুধু তাই নয় তাকে একটা টেবিলে ফেলে তার পোশাক খোলবারও চেষ্টা করেছিল। সে জানত তার প্রতি বীরেন্দ্রর দুর্বলতা আছে, বীরেন্দ্র আগেও তা ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে কিন্তু পাছে

বীরেন্দ্রর চাকরিতে ক্ষতি হয় এজন্যে মেরি জয়শংকরের কাছে কোনো অভিযোগ করেনি

—তারপর ?

মেরির মনে পড়ে যে একটা ক্যাবিনেট থেকে সে মেটালের ছোট একটা কৌটো তুলে নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরে নিয়েছিল

—তাহলে সেই দলের দুষ্ট লোকেরাই মেরিকে কৌটোটা চুরি করতে বলেছিল, তারা ইনসান ওমর মারফত মেরিকে এইরকম আদেশ করেছিল, ব্যাপারটা সত্যিই না কি সব সাজানো

—এই ত সবে ইনকুয়ারি আরম্ভ করেছি, সঠিক কিছু বলা শক্ত, ইনসানই বা এল কোথা থেকে ? মেরির সঙ্গে তার পরিচয় কি করে হল ? কতদিনের পরিচয় ? এসব জানতে হবে, নয় কি ?

—ঠিক বলেছ

—বীরেন্দ্র প্রাথমিক ইনকুয়ারির সময়ে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, তার সেই স্টেটমেণ্টের সঙ্গে মেরির বিবৃতি মিলছে না

—কোথায় মিলছে না ?

—মেরি যে শনিবার দুপুরে তার অফিসে গিয়েছিল, বীরেন্দ্র এ কথা স্রেফ চেপে গেছে। সে বলেছে সিকিউরিটি ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি সে হতে দেয় নি তবুও টি এস জিরো ওয়ান সংখ্যক কৌটো কি করে চুরি গেল তা সে বলতে পারছে না, সে জয়শংকরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে, সে বলছে যে জয়শংকর যখন এখানে ছিল তখনই হয়ত কৌটোটা চুরি গেছে।

গল্প করতে করতে অনেকটা সময় কেটে গেছে। ওরা এখন ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড দিয়ে যাচ্ছে, রাস্তা ফাঁকা পেয়ে তানবীর গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল।

তানবীরই বলল : সেদিন সেই শনিবার দুপুরে বীরেন্দ্র একা পেয়ে মেরির সঙ্গে কিছু করেছিল হয়ত, পাছে সেটা প্রকাশ হয়ে

পড়ে এবং চাকরীতে অবহেলার জন্যে তার কোনো ক্ষতি হয় এই ভয়েই বীরেন্দ্র হয়ত ব্যাপারটা চেপে গেছে

—এটা তুমি ঠিকই বলেছ, কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে চরিত্রবান লোকেরই থাকা উচিত অন্ততঃ অফিসে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার ফস্টিনষ্টি করা মোটেই উচিত নয়, এতে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়, বীরেন্দ্রকে জেরা করে সব কিছু বার করে নিতে হবে।

পথে এবিষয়ে আর কোনো কথা হল না। ওরা এয়ারফোর্স স্টেশনে এসে পৌঁছল। ক্যাপ্টেন জগদীশ চৌধুরী নামে একজন লোক সি বি আই থেকে আসবে এ খবর অফিসার কমাণ্ডিংকে দেওয়া ছিল। জগদীশ অফিসার কমাণ্ডিং-এর কাছে তার পরিচয় পত্র ও আইডেনটিটি কার্ড পেশ করল।

বীরেন্দ্র সোনপালকে ডেকে পাঠান হল। অফিসার কমাণ্ডিংকে জগদীশ অনুরোধ করল যে তাদের যেন একটি নির্জন ঘরে কথা বলতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

অফিসার কমাণ্ডিং একজন অরডারলিকে ডেকে পাঠাল। জগদীশকে কোন ঘরে বসাতে হবে সে কথা তিনি বলে দিলেন এবং এই নির্দেশও দিলেন যে যতক্ষণ কথাবার্তা চলবে অরডারলি যেন ততক্ষণ কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেয়।

অরডারলি সেই বিশেষ ঘরে জগদীশকে নিয়ে গেল। ঘরটি বিশেষ বড় নয় তবে ছোটও নয়। বেশ কয়েকটি আরামপ্রদ চেয়ার রয়েছে। একটিতে জগদীশ বসে সিগারেট ধরিয়ে বীরেন্দ্রর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অরডারলি বলল সে বাইরে টুলে বসে থাকবে, দরকার হলে তাকে ডাকলেই পাওয়া যাবে।

জগদীশ এবারও তানবীরকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বীরেন্দ্র এল। আরে এ ত নেহাতই বাচ্চা, সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে বোধহয়। এত কম বয়সী

লোক এত বড় চাকরী পেল কি করে, বোধহয় খুঁটির খুবই জোর আছে।

পরিচয় বিনিময় হবার পর জগদীশ তাকে বসতে বলল। সিগারেটও অফার করল।

—এ ঘরে আমরা কথা বললে বাইরে কেউ শুনতে পাবে না ত?

—না, বাইরে কেউ শুনতে পাবে না, কনফিডেনসিয়াল কথা বলার জন্যেই ঘরটা বোধহয় ঠিক করা আছে

—তবুও আমরা আস্তে আস্তেই কথা বলব

বীরেন্দ্রকে বেশ চঞ্চল মনে হল কিছুটা নার্ভাসও বোধহয়। ঘরের আবহাওয়া সহজ করে নেবার উদ্দেশ্যে জগদীশ অন্য কিছু কথা আরম্ভ করল, ব্যারাকপুর সম্বন্ধে, কলকাতার বিষয়ে ইত্যাদি।

বীরেন্দ্র অনেকটা সহজ হল। তার মনও অনেকটা হালকা হল। এইবার জগদীশ তাকে বলল:

—আলিপুরে হ্যাডের অফিসে প্রাথমিক ইনকুয়ারির "সময়ে তুমি যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলে তা আমি পড়েছি

—তাই নাকি! তাহলে ত আপনি সব কিছু জেনেই এসেছেন, নতুন আর কি বলবার আছে আমার?

—আছে, তুমি তোমার স্টেটমেণ্টে কিছু বলতে ভুলে গেছ

—ভুলে গেছি? আপনি কি করে জানলেন?

জগদীশ একটু হাসল: হ্যাঁ ভাই ভুলেই গেছ, তুমি বলতে ভুলে গেছ যে শনিবার অফিস ছুটির পরও তুমি যখন তোমার অফিসে একা বসেছিলে সেই সময়ে মিসেস মেরি কাপুর কোন মতলবে তোমার অফিসে এসেছিল এবং তুমি তাকে তোমার বিভাগ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলে। এমন কি স্ট্রংরুম, বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও, নয় কি?

জগদীশ তখন বীরেন্দ্রর দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। বীরেন্দ্র মনে মনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম

—ঠিকই, তবে এ ব্যাপারে আমি মেরি বৌদিকে জড়াতে চাই না বলেই ওর নাম উল্লেখ করি নি

সহানুভূতি দেখাবার ছল করে জগদীশ বলল : তা ত ঠিকই, বসের স্ত্রী মানে তোমার বৌদি এসেছিল এটা বলবার মতো কিছু নয়

—হ্যাঁ, বৌদি আমাকে টেলিফোন করেই এসেছিল, এসেছিল প্রায় তিনটের সময়। বৌদি আমাকে বলল যে এক সপ্তাহ হতে চলল সে তার স্বামীর কোনো চিঠি পায় নি তা আমি দিল্লী থেকে তার কোনো খবর এনে দিতে পারি কি না। আমি জানতাম যে মিঃ কাপুর তখন একটা গোপনীয় স্থানে ট্রেনিং নিচ্ছেন, যেখান থেকে চিঠি পাঠান অসুবিধা আর সেই জন্যেই হয়ত তিনি চিঠি লিখতে পারছেন না, কিন্তু এ কথাটা আমি বৌদিকেও বলতে পারি না কেননা এটা জয়দা বৌদিকেও বলেন নি, আমি বৌদিকে আজে বাজে কথা বলে সান্ত্বনা দিলাম

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। ক্যাপ্টেন জগদীশ ও বীরেন্দ্র দুজনেই চুপ করে রইল। একটু পরেই জগদীশ জিজ্ঞাসা করল :

—তারপর ? তারপর কি হল ?

—দেখুন ক্যাপ্টেন এরপর যা ঘটল তা আমার বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন অনেকটা জেনে ফেলেছেন তখন আমার বলে ফেলাই ভাল

—হ্যাঁ, নিশ্চয় বলে ফেলাই ভাল

—বৌদি আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করতে আরম্ভ করল। একেই ত সুন্দরী তায় আবার নানা ছলাকলা বৌদির জানা আছে, এই রকম একজন যুবতী যদি আমার প্রশংসা করে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে তাহলে আমার পক্ষে তা প্রতিরোধ করা শক্ত, আমি স্বীকার করছি আমিও বৌদিকে কাছে টানবার চেষ্টা করেছিলাম

—যদিও মিসেস কাপুর তোমার বসের বৌ তবুও তোমার এসব খারাপ লাগছিল না নিশ্চয়

—খারাপ লাগবে কেন বলুন, আমি জানি অনেক লোক অন্ততঃ মনে মনে বৌদির জন্যে লালায়িত, কি একখানা চেহারা

—বেশ : বৌদি তোমাকে গরম করে তুলল, তাই না? বীরেন্দ্রর কান লাল হয়ে গেছে। জগদীশ বলল : তুমি তখন তোমার বৌদিকে জড়িয়ে ধরেছ, ▬▬ হাত দিয়েছ এবং চুম্বন করবার চেষ্টা করেছ, তাই না?

বীরেন্দ্র ঘাড় নেড়ে সায় দিল

—কিন্তু আমি চুম্বন করতে পারি নি, বৌদি আমাকে আরও প্রলোভিত করে বলল, যে সে আমাকে অনেক চুমো খেতে দেবে যদি নাকি তাকে আমি সমস্ত ডিপার্টমেণ্টটা ঘুরিয়ে দেখাই, দাদাকে নাকি অনেকবার বলেছিল, দাদা রাজি হয় নি, আমি ভাবলাম আমি ত বৌদির সঙ্গেই থাকব তাছাড়া বৌদি হল আমার বসের বৌ, আমারও চেনা জানা লোক, কি ক্ষতি করবে? এটা নিশ্চয় মেয়েমানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল

—তুমি রাজি হলে

—হ্যাঁ, আমি রাজি হলাম কারণ তখন ঠিক আমি আমার মধ্যে ছিলাম না, আমি কখন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাব···

বীরেন্দ্রর মুখ চোখ কান সব লাল হয়ে গেছে, সত্যিই সে নিজেকে দমন করতে পারে নি সেই কথাই সে জগদীশের কাছে স্বীকার করল

—তা তুমি কি শেষ পর্যন্ত···

—না আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি, বলতে কি বৌদি আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছিল

—তা তুমি তোমার স্টেটমেণ্টে এসবের বিবরণী দাও নি ত? কারণটা কি?

বীরেন্দ্র চুপ করে রইল। একটু পরে বলল

—না, তখন আমি ভেবেছিলাম ব্যাটল প্ল্যান চুরি যাওয়ার মধ্যে

বৌদিকে টানি কেন ? তাকে আমি স্ট্রংরুমে নিয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে তিনি কি ভাবে জড়িত থাকতে পারেন ? তখন বৌদির কেউ স্টেটমেণ্ট নিয়েছে কিনা আমি জানি না আর নিয়ে থাকলেও বৌদি কি বলেছে আমি জানি না, আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবার চেষ্টা করেছিলাম এসব কথা বলেছে কি না আমি জানি না।

—মানে তুমি তোমার বৌদিকে সন্দেহ করতে পার না, তাই নয় কি ?

—ঠিক তাই ?

—তাহলে তুমি যা বলবার সবই আমাকে বললে, তোমার আর কিছু লুকনো নেই ? আচ্ছা আমি এবার তোমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করব ভেবেচিন্তে তার উত্তর দেবে ? স্ট্রংরুমে তুমি যখন মিসেস কাপুরকে নিয়ে গিয়েছিলে তখন কি কোনো মুহূর্তে ঐ ব্যাটল প্ল্যান মিসেস কাপুরের পক্ষে চুরি করার সুযোগ হয়ে থাকতে পারে ?

—আপনি ?…আপনি বৌদিকে সন্দেহ করেন ?

জগদীশ বীরেন্দ্রর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাইল। বলল

—ঠিক করে ভেবে দেখ, মিসেস কাপুর আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন……

—কই আমি ত জানি না ?

—পরে জয়শংকরের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে তাঁকে কেউ খুন করেছে

বীরেন্দ্র যেন চমকে উঠল, সে যেন অবাক

—খুন ? কিন্তু কাগজে যে লিখেছে মিঃ কাপুর সুইসাইড করেছেন ?

—খবরের কাগজ অনেক কিছু লিখতে পারে। আসলে যা হয়েছে আমি তোমাকে তাই বলছি। একজন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল এবং তার স্বামী তাকে বাঁচাল আর সেই স্বামীই খুন হল

এই দুটো ব্যাপার তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে না? এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও

—কিন্তু আমি ত স্ট্রং-রুমের ভেতর বৌদির সঙ্গে সর্বদা ছিলাম। সে ব্যাটল প্ল্যান সরাবার সুযোগ পাবে কখন? আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না। তা কি করে হবে?

—তুমি কি ঐ ফাইল ক্যাবিনেটটি দেখিয়েছিলে এবং বলেছিলে যে এই ড্রয়ারে নানারকম ব্যাটল প্ল্যানের মাইক্রো-ফিল্ম আছে?

—না, না, কখনই না

—বেশ তাহলে ব্যাটল প্ল্যান সরাবার সম্ভাবনাগুলি দেখা যাক। তোমার কাছে ঐ ফাইলিং ক্যাবিনেটের চাবি ছিল?

বীরেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল, বোধ হয়, ছিল। আমার কাছে চাবির যে গোছা ছিল তার মধ্যে ছিল হয়ত

—তাহলে সেই চাবির গোছা কি মেরি কাপুরের পক্ষে হস্তগত করার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে? তোমার পকেট থেকে তুলে নেওয়ার? তুমি জানতেই পারলে না হয়ত; এমন কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ কি ঘটেছিল?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বীরেন্দ্র বলল: পকেটে হাত দিলে কি আমি বুঝতে পারতাম না?

জগদীশ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল: এ কথা কি তুমি জোর করে বলতে পার, ট্রামে, বাসে ভিড়ে কত সময় পকেটমার হয়, আবার শোনা যায় পকেটমার অপহৃত জিনিসটি আবার পকেটেই ফিরিয়ে দিয়েছে, কখন পকেট থেকে তুলে নিল কখন আবার ফিরিয়ে দিল এসব জানা যায় না

—বৌদি কি পকেটমার?

—বাধা কোথায়? পকেটমার না হলেও নিশ্চয় কিছু একটা করেছিল, তুমি তখন বৌদিকে নিয়ে কি করছিলে বলত? তাকে নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া করছিলে তাই নয় কি

—তা বলতে পারেন

—ঐটুকু বললে হবে না, তোমরা তখন কি ঠিক অবস্থায় ছিলে আমাকে তাই বল

—বলব ? আপনি, কিন্তু কাউকে বলবেন না ত ? বা কিছু মনে করবেন না ?

—না কাউকে বলব না ? আর ছেলেমানুষ ফুটন্ত যুবতীকে জড়িয়ে ধরেছ এতে আর মনে করার কি আছে, তুমি বল

—আমি বৌদিকে আমার বুকের মধ্যে কসে জড়িয়ে ধরেছিলাম, আমার বুক দিয়ে তার বুক অনুভব করছিলাম, বলতে কি আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম

—তাই বল, সেই সময় তুমি নিশ্চয়ই বৌদিকে চুম্বন করবার চেষ্টা করেছিলে

—তা করেছিলাম কিন্তু তিনি বাধা দিচ্ছিলেন

—তুমি তখন উন্মত্ত এবং সেই সময়ে বৌদি তোমার পকেট থেকে কিছু তুলে নিল কি না তুমি বুঝতে পারলে না, তাই নয় কি ? চাবি কি তোমার প্যান্টের পকেটে ছিল ?

—না আমার এই রকম একটা ঝোলা শার্টের পকেটে ছিল

—তাহলে ত আরও উত্তম, তাহলে তোমার পকেট থেকে চাবি তুলে নেওয়ার তোমার বৌদির একটা সুযোগ জুটেছিল

—তাই ত দেখছি এখন ? বৌদি কি এই জন্যেই এসেছিল নাকি ? অ্যামেরিকান মেয়েকে চেনা মুশকিল, ওর পিছনে কি সি. আই. এ. আছে নাকি ?

—কিছু বলা যাচ্ছে না, আচ্ছা তুমি ত তোমার বৌদিকে চুম্বন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে, তারপর অভিমান করে কি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে

—অভিমান করে নয়, তবে ঠিক সেই সময়ে ফোন বেজে

উঠেছিল, ফোন ছিল ল্যাবরেটরিতে, আমি ফোন ধরতে ল্যাবরে-টরিতে গিয়েছিলাম

—নিশ্চয় স্ট্রং-রুমে বৌদিকে একা ফেলে ? কতক্ষণ

—তা দু তিন মিনিট হবে

—কে ফোন করেছিল ?

—একজন লোক, চিনি না, সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা করছিল, জিজ্ঞাসা করছিল যে বীরেন্দ্র সোনপাল নামে বিখ্যাত যে হকি প্লেয়ার আছে আমি সেই লোক কিনা, আমি কখনও ইস্ট অ্যাফ্রিকা গিয়েছিলাম কি না, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম

—স্ট্রং-রুমে ফিরে এসে কি দেখলে

—বৌদি দু হাত তুলে মাথার চুল ঠিক করছে

—তারপর কি হল, তুমি বৌদিকে স্ট্রং-রুম দেখিয়ে দিয়েছ এবং তখন তুমি নিশ্চয় তোমার পাওনা দাবি করলে

—দাবি করতে হল না, বৌদিই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুম্বন করতে লাগল

—তখন বোধহয় তিনি তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন

—হ্যাঁ দিচ্ছিল, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?

—চাবিটা তোমার পকেটে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে ত ?

—উঃ কি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র, তাহলে কি আপনার মনে হয় যে যেহেতু বৌদি অ্যামেরিকান মেয়ে অতএব সি. আই. এ. বৌদিকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে এবং তারাই মিঃ কাপুরকে খুন করেছে বা করিয়েছে এবং অবস্থা এমন করেছে যাতে আমার ঘাড়ে দোষ চাপান যায়

—এখনও কিছুই বলতে পারি না, জগদীশ বলল

—আপনার কি মনে হয় আমার খুব সাজা হবে

—মিলিটারি কোর্ট তোমার বিচার করতে পারে, তারা কি

করবে তা আমি জানি না, তোমার ত এখন এই এয়ারফোর্স স্টেশন ছেড়ে যাওয়া নিষেধ

—হ্যাঁ

—কোথাও যাবার চেষ্টা কোরো না, দেখি আমি কি করতে পারি

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ

ক্যাপ্টেন জগদীশ চলে গেল।

জগদীশ আর তানবীর দুজনেই হোটেলে ফিরে এল। জগদীশ সারাদিন হোটেল থেকে বেরোল না। কি সব নোট করতে লাগল, কাগজে কি সব ছক আঁকল, কাকে যেন ফোন করল। বিকেলে এক প্রস্থ বিলিয়ার্ড খেলল। তারপর সন্ধ্যার একটু পরে তানবীরকে বলল :

—চল আলিপুর যাই, জয়শংকর কাপুরের কোয়ার্টারে যাব

—তাহলে গাড়ি বার করি

—হ্যাঁ, গাড়ি বার কর, আলিপুরে কাপুরের কোয়ার্টারে কাজ সেরে আর এক জায়গায় যাবার ইচ্ছে আছে, কলকাতার ট্যাক্সি ত সব সময়ে সব জায়গায় যেতে চায় না, তা নইলে সেখানে ট্যাক্সি করেই যেতাম

—কোথায় যাবে ?

—দেখতেই পাবে

—ঠিক আছে আমি গাড়ি বার করছি, তুমি এস।

আলিপুরে জয়শংকর কাপুরের কোয়ার্টারে পৌঁছে তানবীরকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে জগদীশ ওপরে উঠে গেল।

দরজায় কলবেল টিপতে সুকুমারী এসে দরজা খুলে দিল।

—মিসেস কাপুর জেগে আছেন ত ?

—হ্যাঁ, জেগে আছেন

—কেমন আছেন ? সুস্থ আছেন ?

—হ্যাঁ, আজ বিকেল থেকে বেশ ভাল দেখছি, বিকেলে ছেলেকে হসটেল থেকে আনানো হয়েছিল। সে দেখা করে ফিরে গেছে, তারপর থেকে ভাল আছেন

—বেশ, সুকুমারী তুমি এই গোলাপ ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বল আমি দেখা করতে চাই

—আপনি আসুন না?

—না, আগে তুমি খবর দাও

—তবে দেখুন আজ যেন কোনো কড়া প্রশ্ন করবেন না, আবার অজ্ঞান হয়ে গেলে আবার কি হবে কে জানে

—না, না, আজ আমি ভাল ভাল কথা বলব

একটু পরে সুকুমারী এসে জগদীশকে ডেকে নিয়ে গেল। গদি আঁটা দীর্ঘ একটি চেয়ারে মেরি কাপুর অর্ধশায়িত অবস্থায় কি একটা বুনছিলেন

জগদীশকে বসতে বলে সুকুমারীকে চা দিতে বলে জিজ্ঞাসা করল: কি খবর? নতুন কিছু আছে

—আপনি কি রকম বোধ করছেন

—ডাক্তাররাই বলতে পারে, আমার ত দিন কাটছে না, খুব খারাপ লাগছে। কবে যে এই চিকিৎসা শেষ হবে কে জানে, মাঝে মাঝে সব কথা মনে পড়ছে আবার মাঝে মাঝে সব ভুলে যাচ্ছি, বল তোমার খবর বল

—আমি আজ সকালে বীরেন্দ্র সোনপালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, হঁ্যা আপনি যা বলেছিলেন সেই সঙ্গে তার বিবৃতি মিলে যাচ্ছে।

—বীরেন্দ্র মিথ্যা কথা না বললে গরমিল হবার ত কথা নয়

—আচ্ছা বীরেন্দ্র বলছে যে সে আপনাকে জড়িয়ে ধরে কিস করবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় ফোন বেজে উঠেছিল, ও ফোন ধরতে যায়। আপনি তখন স্ট্রংরুমে একা কি করছিলেন

—আমার ত ঠিক মনে পড়ছে না, ফাইল ক্যাবিনেট দেখছিলাম ? নাকি ফাইল ক্যাবিনেট থেকে কিছু তুলে নিলাম ?

কথা বলতে বলতে মেরি কাপুর আঙুলের গাঁট দিয়ে কপাল ঠুকতে লাগলেন

—আমার মনে হচ্ছে যে ল্যাবরেটরিতে টেলিফোন বাজেনি, বীরেন্দ্রর সঙ্গে কারও যোগসাজস ছিল, সেই রিং করেছিল যাতে আপনি কিছুক্ষণ একা থাকেন এবং টি এস জিরো ওয়ান ব্যাটল প্ল্যান চুরি করার দোষ আপনার ঘাড়ে চাপান যায়

—আর আমি যদি চুরি করে থাকি ? আরে না, না, আমিই ত সেটা ফাইল ক্যাবিনেট থেকে তুলে এনে ইনসানকে দিয়েছি, দেখ ইনসানই হয়ত জয়কে খুন করেছে, তোমরা ওকে গ্রেফতার করছ না কেন ?

—না ওকে গ্রেফতার করায় এখন অসুবিধে আছে, ওকে গ্রেফতার করলে আসল লোকদের ধরা যাবে না, আমরা এখনও তাদের নাগাল পাইনি

কথাগুলি বলে জগদীশ বক্র দৃষ্টিতে মেরির দিকে চাইল। মেরি কিন্তু তখনও এক মনে বুনে চলেছে।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল: মিসেস কাপুর আমি কি বললাম আর তার উত্তরে আপনি কি বললেন বলুন ত ?

—হঁ্যা আমি বললাম যে তোমরা ইনসানকে গ্রেফতার করছ না কেন ? তাতে তুমি বললে যে ইনসানের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, এই ত, বলে মেরি কাপুর হাসতে লাগল, অত ভুলি না মশাই, এখনও স্মৃতি শক্তি পুরো ফিরে আসে নি ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যা শুনলাম তার উত্তর ঠিকই দিতে পারব

মেরির উত্তর শুনে জগদীশ নিশ্চিন্ত হল কারণ যা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তা তার পক্ষে বলা উচিত হয় নি কারণ মেরির ভূমিকা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায় নি, তার স্বামী ভারতীয় হতে

পারে কিন্তু সে ত অ্যামেরিকান, তার পিছনে যে সি. আই. এ. নেই একথা কি জোর করে বলা যায় ?

—আচ্ছা মিসেস কাপুর ইনসানকে এখন কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন ?

—কেন ও ত অ্যাডেলফি হোটেলে থাকত না ?

—না, মিসেস কাপুর সেখানে ইনসান আর থাকে না

—তাহলে আমি বলতে পারছি না,

এই সময় সুকুমারী এসে জগদীশকে বলল: বৌদির এবার খাবার সময় হয়েছে, বৌদি খাওয়া সেরে ঘুমোবে, এখন খেয়ে না ঘুমোলে মানে একটু দেরি হয়ে গেলে আর ঘুম আসতে চায় না। তখন আবার ঘুমের ইঞ্জেকসন দিতে হবে

—ইঞ্জেকসন কেন ?

—সমস্ত ট্যাবলেট খাওয়া ডাক্তার বাবু নিষেধ করেছেন

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে এখন চললাম মিসেস কাপুর, দেখি ইনসানকে কোথায় পাওয়া যায়

নীচে এসে দেখল তানবীর পায়চারি করছে। জগদীশ কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করল ; কি, কাজ মিটল ?

—কাজ কি আর মেটে রে ভাই, এখনও বেশি রাত্রি হয় নি। চল দিকিনি তোমাদের এখানে নরেন্দ্রপুর কোথায় আছে সেখানে যাই, সেখানে একটা বাড়িতে হয়ত মূর্তিমানকে পাওয়া যেতে পারে

—তুমি কি করে জানলে যে সেখানে মুর্তিমানকে পাওয়া যাবে

—দিল্লীতে আমাকে আর ডি যে ফাইল দিয়েছিল তাতে এক জায়গায় একটা ছোট্ট নোট আছে। জয়শংকর কাপুর খুন হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হওয়ার পর একজন দরবারা সিং পুলিসের কাছে একটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল। তাতে সে বলেছিল যে নরেন্দ্রপুরের ঐ বাড়িটার সে দারোয়ান। ঐ বাড়িতে জয়শংকর

কাপুর ছুদিন গিয়েছিল। ঐ বাড়িতে ফিলিপ নামে একজন সায়েব থাকত। ফিলিপ নাকি তার আসল নাম নয়।

পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে জগদীশ বলল :

—তার এই খবরে পুলিসের যদি কিছু কাজ হয় এই জন্যে দরবারা সিং খবরটা পুলিসে দিয়ে এসেছে। পুলিস খোঁজ করেছিল কিন্তু ফিলিপের অ্যালিবাই ছিল খুব টাইট।

—ঐ ফিলিপ, ইনসান ওমর হতে বাধা কোথায়? চলই না দেখা যাক, জগদীশ বলল

—কিন্তু রাত্রিবেলা চেনা যাবে কি করে?

—চেনা নাকি শক্ত নয়। বাড়িটার ছাদে বড় বড় মানুষের মূর্তি আছে। ঐ রাস্তা ধরে বরাবর গেলে নাকি বাড়িটা চোখে পড়বেই পড়বে।

—তাই নাকি, বেশ চল।

ওরা যখন সেই বাড়িতে পৌছল তখনও বেশি রাত্রি হয় নি ঠিক কিন্তু বাড়িটা অন্ধকার। গেটের সামনে ওদের গাড়ি থামতেই একজন লোক এসে দাঁড়াল। যে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে বলে দিতে হল না যে লোকটি পাঞ্জাবী এবং শিখ।

জগদীশ গাড়ি থেকে নেমে বলল

—কি সর্দারজী ভাল আছ ত

—হুজুরকে ত চিনতে পারছি না

—চিনতে পারছ না দরবারা সিং?

—না হুজুর আমার নাম জানলেন কি করে?

—আমি যে জয়শংকর কাপুরের বন্ধু

—খুব আফশোষের কথা হুজুর, কাপুর সাহেব খুন হয়ে গেলেন, পাঞ্জাবী কাগজে আমি খবর পড়ে কলকাতায় লালবাজার থানায় গিয়ে আমি স্টেটমেণ্ট লিখিয়েছিলাম, কে জানে কোন খবর পুলিসের কাজে লাগে। কিন্তু কোনো পুলিস এখানে এতদিন ইনকুয়ারিতে আসে নি

—এই ত আমি এলাম

—আপনি লালবাজার থেকে আসছেন হুজুর ?

—না, কাপুর সাহেব ত সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের অফিসার ছিলেন, তাই আমি আসছি দিল্লী থেকে

দরবারা সিং খটাস্ করে একটা স্যালুট দিল।

—ঠিক আছে সিংজী, সাহেব আছে নাকি ?

—এখনও ফেরেন নি। আপনারা একটু ওয়েট করুন। এখনি আসবে

—তাই নাকি ? তানবীর তুমি গাড়িটা একটু দূরে রেখে এস।

তানবীর গাড়িটা একটু দূরে রেখে লক করে ফিরে এল। ওরা দুজনে বাংলোয় উঠে বারান্দায় থামের আড়ালে লুকিয়ে রইল। তার আগে দরবারাকে ওরা সাবধান করে দিয়েছিল, সে যেন কিছু না বলে। জগদীশ শেষ বারের মতো দরবারা সিংকে সাবধান করে দিয়েছিল ; খবরদার দরবারা ফিলিপ সাহেবকে কিছু 'বলবে না তাহলে তোমাকে ফাটকে পুরব।

দরবারাও বুঝিয়ে দিয়েছিল সে সেরকম লোকই নয়, সে ফৌজিতে ছিল। সে ত নিজে গিয়ে লালবাজারে জবানবন্দী দিয়ে এসেছে।

বারান্দায় উঠে তানবীর বলল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি, ধরাব নাকি একটা করে

—না হে, সিগারেট শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও গন্ধ থাকে, ও বেটা খুব চালাক, আগে গন্ধ পেয়ে সাবধান হয়ে যেতে পারে।

দরবারা সিং-এর কথাই ঠিক। ওদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। গেটে একটা গাড়ি এসে থামল। দরবারা গেট খুলে দিল। গাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকল। ইনসান গাড়ি গ্যারাজে তুলে বাংলোর দিকে শিস দিতে দিতে ও হাতে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসতে লাগল। তার জুতোর শব্দ ক্রমশ জোর হচ্ছে।

জগদীশ আর তানবীর দুজনে দুই রিভলভার নিয়ে প্রস্তুত। ইনসান খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। সে তখনও জগদীশ বা তানবীরকে দেখতে পায়নি। এমন কি সে তালা খুলে যখন ঘরে ঢুকেছে তখনও ওদের দেখতে পায় নি। যেই সে আলো জ্বেলেছে অমনি দেখল দুজন অপরিচিত লোক, দুজনেরই হাতে রিভলভার।

তানবীর দরজাটা বন্ধ করে দিল। জগদীশ কথা আরম্ভ করল

—ইনসান ওমর ঐ চেয়ারটায় চুপ করে বোসো; আমাদের কথা শুনলে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না; তানবীর দেখত ওর পকেটে বা অন্য কোথাও অস্ত্র আছে কি না।

রিভলভার ছিলনা তবে একটা ছোরা ছিল। তানবীর ছোরাটা বার করে নিল।

—তোমরা কে? ইনসান জিজ্ঞাসা করল

—আমরা যেই হই না কেন তাতে তোমার দরকার নেই তবে এইটুকু জেনে রাখ যে আমাদের অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল গোপন খবর সংগ্রহ করা

—কি রকম?

—এই যেমন ধর তোমার হাতে যখন পাঁচ লাখ টাকা এসে গেছে কিন্তু সেই টাকা তুমি কি করে দেশের বাইরে নিয়ে যাবে তা নিয়ে খুব চিন্তিত

—তোমরা কি বলতে চাও

—আমরা বলতে চাই যে তুমি যদি আমাদের অর্ধেক ভাগ দাও তাহলে, বাকি অর্ধেক আমরা দেশের বাইরে বার করে দিতে পারি, নেপাল, পাকিস্তান, সিকিম, ভুটান, সিঙ্গাপুর, এমন কি হংকং-এও পাঠাতে পারি

—আমি যদি রাজি না হই?

—তাহলে আমি বলব যে পাঁচলাখ টাকা নিয়ে এদেশে এখনি

মরে যাওয়ার চেয়ে আড়াই লাখ টাকা নিয়ে বিদেশে যাওয়া অনেক ভাল, নয় কি ? আমাদের প্রস্তাব সহজ, সরল, কোনো ঘোর প্যাঁচ নেই

—হ্যাঁ, আমারও বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় নি তবে তোমরা ঠিক খবর পাওনি, টাকা আমার হাতেই আসে নি

—কি রকম ?

—মানে আমি মধ্যবর্তীর ভূমিকা নিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম মানে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং তোমাদের দেশের গোয়েন্দা বিভাগও জানে যে আমার হাতে একটিও পয়সা আসে নি, তাহলে আমি নির্ভয়ে এই শহরে ঘুরে বেড়াতে পারতাম না, এখানে চাকরীও করতে পারতাম না

—দেখ বাপু তোমার ঐ রূপকথার কাহিনী বাচ্চা ছেলেদের শুনিয়ো, আমরা ওসব বিশ্বাস করিনা। আমরা চাই আড়াই লাখ, না দিলে তোমাকে মরতে হবে

—আমি যদি কিছু না বলি ? ইনসান বলল

—ঠিক আছে তোমাকে আমরা আর একটা সুযোগ দেব, তাতেই তুমি বুঝবে যে তোমাকে আমরা এখানে এখনই মেরে ফেলতে পারি

—তোমাদের যা ইচ্ছে করতে পার

—বেশ তাই করছি, তানবীর আরম্ভ কর

দুজনে রিভলভার নামিয়ে রেখে ইনসানকে চেয়ার থেকে ওঠবার সুযোগ না দিয়ে তাকে চকিতে আক্রমণ করে দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে এমন ভাবে আঘাত করতে লাগল যে ইনসান যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল

মারের আরম্ভের সময় সে বলছিল ; এই তোমরা একি করছ, আমি কিছু জানি না, আমাকে ছেড়ে দাও, কিন্তু একটু পরেই বুঝল যে এরা ছাড়বার পাত্র নয় এবং এইভাবে মারতে মারতে তাকে

সত্যিই হয়ত মেরে ফেলবে। এই ভাবে মরার কোনো মানে হয় ? সে নিজেও তিলমাত্র বাধা দেবার সুযোগ পাচ্ছে না

জগদীশ বলছে : আমাদের ক্ষমতা টের পাচ্ছ ত, তোমাকে যে আমরা মারছি এতে তোমার শরীরে কোথাও সামান্য দাগটুকুও পড়বে না অথচ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার মৃত্যু হবে, কেউ জানতে পারবে না কিসে তুমি মরলে, কথা বলতে বলতে জগদীশ এমন একটা আঘাত করল যে ইনসান অজ্ঞান হবার উপক্রম। এবার ইনসান রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল, এবার বোধহয় ওরা আমাকে সত্যিই মেরে ফেলবে !

—থাম, থাম, ওরে বাবা, ইনসান দম নিতে লাগল। জগদীশ আর তানবীর বুঝল যে যথেষ্ট হয়েছে। ইনসান তখন চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে

জগদীশ তখন বলছে এইবার ভাল ছেলের মতো সুড় সুড় করে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও, আমরা তোমার টাকা ভাল ভাবে নিরাপদে পৌঁছে দেব, তুমি যেখানে বলবে সেখানে, আমরা এজন্য গ্যারান্টি দিতেও রাজি আছি

অতি কষ্টে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ইনসান এক গ্লাস জল চাইল। জগদীশ রিভলভার দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তানবীর খাবার জল এনে দিল।

ইনসান জল খেয়ে মুখে চোখে ভিজে হাত বুলিয়ে বলল :

—আমি একা নই

—বেশত তাদেরও নাম বল, তাতেও আমাদের কোনো অসুবিধে নেই

—শোনো তাহলে, ঐ টাকায় আমার নিজের কোনো লোভ নেই, আমি কোনো ভাগও চাই না, তবে এমন কেউ আছে যে ঐ টাকাটা ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে চায়, সে হয়ত তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে পারে,

আর একটু দম নিয়ে ইনসান বলতে লাগল : আবার ঐ এক-জনের আবার একজন পার্টনার আছে, সে তার পার্টনারকে মেরে পুরো টাকাটাই মারতে চায়। আমাকে বলেছিল পার্টনারকে সরিয়ে দিতে, আমি রাজি হইনি, আমার ওপর গোয়েন্দাদের নজর আছে, তোমরা হয়ত পারবে ঐ পার্টনারের ভাগটাও আদায় করতে

—কি করে আদায় করব ? জগদীশ জিজ্ঞাসা করল

—আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি

—বেশ তাহলে তার নাম বল

ইনসান খুব আস্তে আস্তে বলল : সে একটা মেয়ে কিন্তু যেমন ধড়িবাজ তেমনি সাংঘাতিক

—বেশ ত, আমরা অনেক মেয়ে দেখেছি। তার একটা নাম আছে ত ? কি নাম বল

—মিসেস মেরি কাপুর

কাঁটায় কাঁটায় যখন বেলা দশটা জগদীশ ন্যাশানাল আরকাইভসে টেলিফোন করল। ওপার থেকে অপারেটর বলল :

—ন্যাশানাল আরকাইভস, গুড মর্ণিং

—গুড মর্ণিং গুলজারা সিং প্লিজ

—এক মিনিট প্লিজ, হ্যাঁ, কথা বলুন মিঃ সিং

—হ্যালো মিঃ গুলজারা সিং আমি ক্যাপ্টেন জগদীশ চৌধুরী কথা বলছি, সেই খবরটা নিয়েছিলেন

—নিয়েছি আপনি আসুন, ফোনে বলব না

—শুনুন মিঃ সিং আমি এখনি অতদূর যেতে পারব না, এখানে একটু পরেই আমার একজন ভিজিটর আসবে

—অমিও ত এখনি একবার বেরোচ্ছি

—কোথায় ? কতদূরে যাবেন ?

—পি জি হসপিটাল, আপনি এক কাজ করুন না। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এখানে আসুন, যে আগে পৌঁছবে সে ইনকুয়ারিতে ওয়েট করবে

—ঠিক আছে মিঃ সিং আমি এখনি স্টার্ট করছি

বিশেষ সেই শনিবার, যে শনিবারে স্যাড-এর স্ট্রংরুম থেকে টি এস জিরো ওয়ান চুরি যায় সেদিন ল্যাবরেটারিতে সেই বিশেষ ফোনটি যেটি বীরেন্দ্র সোনপাল ধরতে গিয়েছিল সেটি কোথা থেকে এসেছিল ? তার উৎস কোথায় ? জগদীশ গুলজারা সিংকে অনুরোধ করেছিল। গুলজারা সিং খোঁজ নিয়েছিল।

সে বলল : কল বাইরে থেকে আসে নি। বাইরে থেকে কল এলে টাইম ও প্রার্থিত ব্যক্তির নাম লিখে রাখা হত। ওই সময়ে বাইরে থেকে কোনো কলই আসে নি

—তাহলে ? উৎসুক কণ্ঠে জগদীশ জিজ্ঞাসা করে

—কলটি আমাদের ইণ্টার্নাল লাইন থেকেই কেউ করেছিল।

—থ্যাংক ইউ মিঃ সিং আর একটা কাজ করতে হবে, ঐ শনিবার বেলা ৩-টে থেকে ৪-টে পর্যন্ত কারা ডিউটিতে ছিল তার একটা লিসট আমাকে দেবেন, থ্যাংক ইউ, লিসটটা কাল পেলেই ভাল হয়

গুলজারা সিং বলল যে সে হসপিট্যালের কাজ সেরে অফিসে ফিরে লিসট তৈরি করিয়ে রাখবে

আরও একবার থ্যাংকস দিয়ে জগদীশ বিদায় নিল। ব্যাপারটা যেন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমশ। মেরি কাপুর কি সত্যিই সুইসাইড করতে গিয়েছিল ? নাকি জয়শংকরকে ধোঁকা দিয়েছিল। মেরির হয়ত আসল উদ্দেশ্য ছিল তার সাইকোলজিক্যাল চিকিৎসা করা হক যাতে তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। এইসময় পুলিস বা কেউ কিছু প্রশ্ন করলে মেরি বলতে পারবে যে চিকিৎসার ফলে তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তার কিছু মনে পড়ছে না ত। অতএব ব্যাটল প্ল্যান চুরির সঙ্গে মেরিকে জড়িত করা যাবে না।

হোটেলে ফিরে এসে দেখল তানবীর তার জন্যে অপেক্ষা করছে

—কি খবর তানবীর ? সব ভাল ত ? ইনসান কি করছে ?

ঘুমোচ্ছে, শুধুই ঘুমোচ্ছে, ওকে জাগতেই দেওয়া হচ্ছে না

—বেশি ঘুমের বড়ি খাইয়ো না যেন

—না সেদিকে আমাদের খেয়াল আছে

—তুমিত এখন নেই, ও পালাবে না ত ?

—না তার ব্যবস্থা করে এসেছি

—ঠিক আছে, আমি একবার মেরি কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে যাব

—গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ নাকি জগদীশ ?

—না আমি তোমার গাড়ি নিয়ে যাব না

—তাহলে আমি বাড়ি ফিরে যাই

—ফিরে যাবে বই কি, যেয়ে দেখ আমাদের বন্দী মশাই কি করছেন, ঠিক আছেন কিনা

ক্যাপটেন জগদীশ যখন জয়শংকর কাপুরের কোয়ার্টারে পৌছলেন তখন দেখলেন যে মেরি কাপুর আজ একা নেই। তার পাশে মেরির চেয়েও সুন্দরী না হলেও অধিকতর আকর্ষণীয় একজন যুবতী বসে রয়েছে।

ওরা দুজনে বারান্দায় বসেছিল। সুকুমারী জগদীশকে সেইখানেই নিয়ে গিয়েছিল। মেরিকে দেখে জগদীশ হাসিমুখে বলল

—গুড ইভনিং মিসেস কাপুর, ভাল আছেন ত

—হ্যাঁ জগদীশ ভাল আছি, আমার বন্ধু রুবি, রুবি এ হল জগদীশ, দিল্লী থেকে এসেছে

—আপনার বন্ধু বেশ সুন্দরী মিসেস কাপুর

রুবি বলল যিনি বলছেন তিনিই বা কম সুন্দর কিসে ?

সকলেই হেসে উঠল। তারপর প্রাথমিক কিছু আলাপ কিছু মন্তব্য, কিছু গল্পগুজব। রুবি আর বসল না। তার বুঝি কিছু কেনা-কাটা আছে। আজ সে চলল। যাবার আগে জগদীশকে বলল:

—আবার দেখা হবে, বলে ডান হাত জগদীশের দিকে বাড়িয়ে দিল। জগদীশ হাতটি ইচ্ছে করে নিজের গালে ঠেকিয়ে পরে হাতে বেশ ভাল করে চুম্বন করল।

জগদীশ হাত ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত রুবি হাত টেনে নিল না। সেই দৃশ্য দেখে মেরি হাসতে লাগল।

রুবি চলে যাবার পর মেরি বলল: রুবি তোমাকে সহজে ছাড়ছে না। ও তোমাকে শীগগির পাকড়াবে

—আপনি তাই মনে করেন?

—রুবিকে আমি চিনি না? সুন্দর পুরুষ দেখলে ও আর থাকতে পারে না

জগদীশ মনে মনে বলল: জগদীশই কি সুন্দর যুবতী দেখলে থাকতে পারে। সেই কবে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছে এখনও কোনো যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করা গেল না। ভাল লাগে কি? ডিউটি ত করতেই হবে কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু ফষ্টিনষ্টিও করতে হয়।

আপাততঃ যুবতীর ভাবনা মন থেকে হঠিয়ে দিয়ে মেরিকে বলল:

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, কয়েকটা জিনিস জানতে চাই তার আগে জিজ্ঞাসা করি এই রুবি কে?

—পছন্দ হয়েছে বুঝি, তা ওর কাছে তুমি যেতে পার এক আধটা রাত্রিও কাটিয়ে আসতে পার, আমার থেকে ওর প্রকৃতি ভিন্ন হলেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের, ও কলকাতায় থাকে না তবে আপাততঃ রয়েছে

—কোথায় থাকে

—লেকের কাছে, সাদার্ণ এভিনিউতে কোথায় থাকে যেন

—ঠিকানা জানেন ?

—আজই যাবে নাকি ?

—তা নয়, তবে আমি যে বিষয়ে খোঁজ খবর করছি তাতে কে কখন কাজে লাগে বলা যায় না ত

মেরি ভুরু কুঁচকে কি ভাবল তারপর বলল :

—না ঠিকানাটা মনে পড়ছে না ত

—ঠিক আছে যখন মনে পড়বে তখন বলবেন, আচ্ছা শুনুন সেই শনিবারে আপনি যেদিন টি এস জিরো ওয়ান কৌটটি তুলে নিলেন সেদিন আপনি যখন বীরেন্দ্রর সঙ্গে স্ট্রংরুমে ছিলেন, মনে পড়ছে

—হ্যাঁ মনে পড়ছে, কি হয়েছে ?

—সেই সময় ল্যাবরেটরিতে টেলিফোন বেজে উঠেছিল, বীরেন্দ্র ফোন ধরতে গেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে। বীরেন্দ্র যেই ক্যাবিনেট ফাইলের ড্রয়ারটা খুলল আর তখনি ল্যাবরেটরিতে ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। বীরেন্দ্র ছুটল ফোন ধরতে আর আমি এই সুযোগে—বুঝতে পারছ

—হ্যাঁ আপনি টিথোয়াল সেকটরের ব্যাটল প্ল্যানের মাইক্রো-ফিলমের কৌটোটি তুলে নিলেন, তাই না ?

জগদীশ মেরির মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল। বীরেন্দ্র যা বলেছিল তার সঙ্গে মেরির কাহিনীর কিছু কিছু গরমিল দেখা যাচ্ছে। বীরেন্দ্র নিজে ফাইল ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলে দিয়েছিল একথা বলে নি, এছাড়া দুজনেই হয়ত কিছু কথা চেপে যাচ্ছে। কথা শুনে মনে হচ্ছে মেরি কণামাত্র মিথ্যা বলছে না কিন্তু সুন্দরীদের কি সর্বদা বিশ্বাস করা যায় ?

—মিসেস কাপুর এবার আপনাকে আমি একটা জরুরী কথা বলব

—জরুরী কথা ? গত কয়েকদিন বা এখন যে সব কথা বললে সে সব বুঝি জরুরী নয় ?

—নিশ্চয় প্রতিটি কথাই জরুরী এমন কি রুবির বিষয়ে যা বলেছি তাও জরুরী

—ঠাট্টা রাখো যা বলবে বল। আমি আর বেশি সময় দিতে পারব না

—আমি খোঁজ নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি তাতে দেখেছি যে কিছু লোক আছে, মানে তারা আপনার শত্রু, তারা আপনাকে মৃত দেখতে চায়

মেরি যেন চমকে উঠল। তার মুখ হল বিবর্ণ

—কেন ? আমি তাদের কি করেছি যে তারা আমাকে মারতে চায়

—কেন না এই ব্যাটল প্ল্যান চুরির ব্যাপার আপনি অনেক কিছু জানেন, সেগুলি প্রকাশ হলে তাদের রীতিমতো ক্ষতি হবে

—তুমি কি করে জানলে ?

—কি করে জানলাম সেটা কোনো কথা নয়, কিন্তু জেনেছি

—তোমার কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, আমার নিজেরও সেই কথা মনে হয়েছে কিন্তু কি করা যাবে বল ত ?

—সে ব্যবস্থা আমি করব। আমি এমন একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করছি যা থেকে আপনার শত্রুরা মনে করবে আপনার 'মৃত্যু' হয়েছে আর ইতিমধ্যে আপনাকে কিছুদিন আমি লুকিয়ে রাখব

—তুমি কি করে আমাকে 'মারবে' জগদীশ

—সে ভার আমার, আপনার কোনোই ক্ষতি হবে না, ইনসানের সামনে আপনাকে গঙ্গায় ফেলে দেব, আপনি ডুব সাঁতার কেটে অন্য একটা নৌকোয় উঠতে পারবেন না ? সাঁতার ত জানেন

—অগভীর সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে পারি তা বলে গঙ্গায় ডুব সাঁতার ? না বাবা তা আমি পারব না

—তবে রেললাইনে অ্যাকসিডেন্ট, আপনার বডি পাওয়া যাবে কিন্তু আপনি তখন হয়ত আরামে অন্যত্র নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকবেন

—হ্যাঁ এটা তোমরা করতে পার কিন্তু তোমাদের একটা বডি যোগাড় করতে হবে

—সে সব ভার আমাদের, আচ্ছা মিসেস কাপুর আপনার কাছে কোথাও মিস রুবির ঠিকানা লেখা নেই ?

—না ঠিকানা লেখা নেই

—টেলিফোন আছে ?

—টেলিফোন ? হ্যাঁ থাকতে পারে, সুকুমারী শোন

—কি বৌদি কি বলছ ?

—হ্যাঁ রুবির টেলিফোন নম্বর জানিস ?

—কেন জানব না ? গাইডেই ত লেখা আছে

—গাইড খানা এনে জগদীশকে দে ত ?

সুকুমারী গাইড নিয়ে এল। গাইডের গোড়াতেই অনেক ফোন নম্বরের সঙ্গে রুবির ফোন নম্বরও লেখা রয়েছে। ফোন নম্বরটি জগদীশ নোট করে নিল।

—রুবিকে বুঝি তোমার খুব ভাল লেগেছে ?

—না মিসেস কাপুর তা নয় আপনার 'বডি আইডেনটিফাই' করতে হবে ত ? সেইজন্য, যাই হক আমি এখন যাচ্ছি, আমি আপনাকে আগে থাকতে খবর দেব, তবে আপনি আপনার বাইরে বেরোবার পুরনো এক সেট ড্রেস দেবেন, পুরনো যা নাকি আপনার 'বডি' তে পাওয়া যাবে আর দেবেন একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, তাতে মেয়েলি টুকিটাকি যা থাকবার তা ত থাকবেই উপরন্তু লণ্ড্রির রসিদ পুরনো চিঠি এইরকম কিছু কাগজ থাকলে ভাল হয় যা থেকে নাকি আপনাকে সনাক্ত করা যাবে

—আমাকে নয়, তুমি সুকুমারীকে বলে যাও। ও সব গুছিয়ে প্যাকেট করে রাখবে এখন

জগদীশ সুকুমারীকে বুঝিয়ে বলে দিল, এমন কি জুতো, রুমাল, প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, কিছু বাদ না পড়ে তবে পুরনো দিলেই ভাল হয়।

নিজের হোটেলে ফেরবার পথে জগদীশ তানবীরের বাড়ি হয়ে গেল। ইনসানেরও খবর নিল। মেরি কাপুরের 'অ্যাকসিডেণ্টের' বিষয়েও আলোচনা করল।

সুকুমারী বেশ গুছিয়ে একটা প্যাকেট করে দিয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছদে 'এম কে' অক্ষর দুটি মারকিং ইঙ্ক দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। সনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না।

অ্যাকসিডেণ্টটা কি ভাবে ঘটাতে হবে সে বিষয়ে জগদীশ তানবীরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করল। তানবীর পরিকল্পনাটি অনুমোদন করলেও জগদীশকে পরামর্শ দিল ব্যাপারটা পুলিস কমিশনারকে এবং স্থানীয় থানায় অবশ্যই জানিয়ে রাখতে হবে। তা নইলে হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই ভেস্তে যেতে পারে

—এটা তুমি ভাল বলেছ তানবীর। তাহলে কাল সকালেই আমি পুলিস কমিশনারের কাছে যাব। তুমি ওই সময়ে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে সুবিধামতো একটা স্পট ঠিক করে আসবে। তাহলে আমি এখন আসি

—ইনসানকে দেখবে না?

—কি করছে?

—ঘুমোচ্ছে

—ঠিক আছে, ঘুমোক, চ্যাঁচামেচি কিছু করেনি ত?

—না, সে সব কিছু করে না

পুলিস কমিশনার কিন্তু অপরের একটা ডেডবডি এনে চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে রাখতে রাজি হলেন না। তিনি অন্য কিছু করতে বললেন।

তখন জগদীশই প্রস্তাব করল : বডি ছাড়াই ত আমরা একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে পারি

—কি রকম মিঃ চৌধুরী

—মনে করুন আপনারা বললেন যে অমুক দিন অমুক সময়ে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনায় একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তাঁর মৃতদেহ এমনভাবে বিকৃত হয়েছিল যে তার ময়না তদন্তও করা যায়নি। তাঁর মৃতদেহর কাছে তাঁর ভ্যানিটি-ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল। কাগজপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে মৃতা মহিলার নাম মিসেস মেরি কাপুর। দুঃখের বিষয় যে কিছুদিন পূর্বে মহিলার স্বামীর মৃতদেহ চন্দননগরে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায়। পুলিস এটি আত্মহত্যা মনে করে। মিসেস কাপুরের পরিচ্ছদ তাঁর আয়া ও জনৈক বান্ধবী সনাক্ত করেছেন। এটি দুর্ঘটনা অথবা এর অন্তরালে কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে পুলিস তদন্ত করছে ইত্যাদি। এইভাবে একটা বিবৃতি দিতে পারেন না কি ?

—হ্যাঁ, দেশের স্বার্থে এটা করা যেতে পারে

পুলিস কমিশনারের সঙ্গে জগদীশ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করল। স্থান, তারিখ ও সময় নিয়ে দুজনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হল এবং কাজটি সম্পন্ন করবার জন্যে কয়েকজন পুলিসের ওপর ভার দেওয়া হল। জগদীশ মনে মনে সন্তুষ্ট।

ইতিমধ্যে রুবির সঙ্গে আলাপটা সেরে রাখতে হবে।

পরদিন ভোরে। জগদীশ তখনও বিছানায় শুয়ে। সবে ঘুম ভেঙেছে। উঠব উঠব করছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। হোটেলের অপারেটর জিজ্ঞাসা করল :

—মিঃ চৌধুরী ?

—কথা বলছি

—গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরী

—মর্নিং। এত ভোরে কি ব্যাপার ?

যুবতী পাঞ্জাবী অপারেটর রসিকা। হাসতে হাসতে বলল :

—ভোর হয়েছে বুঝি ?

—কেন তুমি বুঝতে পারছ না।

—কি করে বুঝব বলুন ? এমন একটা চেম্বারে বসিয়ে দিয়েছে যে তার দরজা জানালা থাকা সত্ত্বেও বাইরের আলো ঢোকে না, সব সময়ে টিউবলাইট জ্বেলে রাখতে হয়। তাহলে কি করে বুঝব বলুন ভোর হল কিনা।

—যাক গে কি ব্যাপার বল

—একটু আগে আপনার একটা ফোন এসেছিল, কিন্তু আপনাকে লাইন দিতে না দিতেই কেটে গেল, সেই জন্যে আপনার ঘরে রিং করেছিলাম, আপনি ঘরে আছেন ত ?

—আছি

—আবার লাইন এলে দেব

—ট্রাংককল নয়ত ?

—না, লোক্যাল কল

জগদীশ ভাবতে লাগল এত ভোরে তাকে কে ফোন করতে পারে ? ইনসান যে অফিসে চাকরী করে সেই অফিসে সে গিয়েছিল। একটা অ্যামেরিকান এঞ্জিনিয়ারিং কম্পানি। সেখানে সে গোপনে ও সন্তর্পণে কিছু ইনকুয়ারি আরম্ভ করেছে। এক জনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। ইনসানের বিষয় কিছু খবর তার কাছ থেকে সে আশা করছে। এ কি সেই লোক ?

খবরের কাগজ দিয়ে গেল। প্রথম পাতাতেই ছোট একটি খবর পড়ে সে চমকে উঠল। বোল্ড টাইপে বক্স করে খবরটি ছাপা হয়েছে : টিথওয়াল সেকটরে পাকিস্তান সৈন্য কর্তৃক যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন। ভারত কর্তৃক তীব্র প্রতিবাদ।

এমন খবর ত কাগজে মাঝে মাঝে ছাপা হয়। জনসাধারণ এই খবরগুলিকে গুরুত্ব দেয় না। এই খবরটিকেও হয়ত কোনো গুরুত্ব দেবে না তারা, কিন্তু জগদীশের কাছে এই খবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

খবরটি পড়ে জগদীশের মনে এই প্রতিক্রিয়া হল যে আরম্ভ হয়ে গেল নাকি? এত তাড়াতাড়ি? কিন্তু এদিকে ত সে গোপন চক্রের কোনো কিনারাই করতে পারল না।

ফোন বেজে উঠল। এবারে অপারেটর কোনো কথা বলেনি। সে শুধু লাইনটি চালান করে দিয়েছে।

—হ্যালো কে কথা বলছেন?

—কে কথা বলছেন আপনি! জগদীশ চৌধুরী? ক্যাপ্টেন?

—তাকেই কি চাইছেন আপনি?

—হ্যাঁ তাকেই চাইছি আমি? আপনিই?

—হ্যাঁ। কথা বলছি, কি দরকার বলুন। আপনি কে?

—ও তুমিই তাহলে? আমার নাম হায়দার আলি নাকি টিপু সুলতান? হর্ষবর্ধনও হতে পারে। যেই হই না কেন তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমাদের বিরাট অর্গানাইজেশন, তার তুলনায় তুমি পিগমি, আমি বলি কি তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। একা ইনসানকে আটকে রেখে কিছু হবে না। শুধু কলকাতাতেই আমাদের হয়ে অমন দু ডজন ইনসান কাজ করছে, আর মজা এই যে প্রত্যেকের নামই ইনসান। কি? টের পেয়েছ! থাক বাজে লোকের সঙ্গে আর বেশি কথা বলব না

—তোমরা কারা? তোমার নাম কি?

—তিন দিনের মধ্যে দিল্লী ফিরে না গেলে টের পাবে

—বেশ তাহলে তিন দিনের পরেও অপেক্ষা করব

—যদি মরতে চাও ত-তাই কর

লাইন কেটে গেল। এমন ভাবে বহু লোক জগদীশকে ভয়

দেখিয়েছে। কয়েকবার বিপদে পড়েছে আবার শত্রুপক্ষকে শায়েস্তাও করেছে অতএব এসব ভেবে কিছু লাভ নেই।

যে লোকটি কথা বলছিল তার গলার স্বর জগদীশের অচেনা, কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারছিল তার পাশে একজন লোক বসে আছে। সেও কিছু কিছু কথা বলছিল। এরা কারা? ইনসান বর্ণিত সেই অজানা শক্তিশালী দল যারা শুধু পাঁচ লাখ টাকার জন্যে টি এস জিরো ওয়ান কৌটোটি চুরি করেছিল? নাকি বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থা?

ওদিকে আবার পাকিস্তান সিজ ফায়ার লাইন ক্রস করছে। ইনসানের ওপর চাপ দিতে হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে জগদীশ আর ডি-এর দেওয়া টপ সিক্রেট ফাইল নিয়ে পড়ল। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি নোট ভাল করে পড়তে লাগল। বিদেশী কোন কোন গুপ্তচরসংস্থা এখন কলকাতায় সক্রিয় তাদের বিষয়েও একটা নোট রয়েছে। সেটিও জগদীশ সযত্নে পড়ল, যদি কোথাও কোনো সূত্র পায়?

না, কোথাও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু পাওয়া গেল একটা নামের তালিকা, তিন ভাগে বিভক্ত। তিনটি বিদেশী রাষ্ট্রের কলকাতায় যাদের এজেন্ট সন্দেহ করা হয় তাদের নামের তালিকা।

জগদীশ প্রতিটি নাম পরীক্ষা করতে লাগল। একটা নাম পাওয়া গেল দুটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের তালিকায়, রণবীর দুগল। টেলিফোন গাইড খুলে দেখল রণবীর দুগল বা দুগল রণবীরের নামে কোনো ফোন নেই। পুলিসও খোঁজ নিয়েছিল। তাদের তালিকাতেও রণবীর দুগল কেউ নেই। দিল্লীকেও জিজ্ঞাসা করেছিল সি বি আই-এর তালিকায় কেউ আছে নাকি? রণবীর দুগল? না নেই।

তার কোনো ফটো নেই, চেহারার কোনো বর্ণনা নেই, তার বিষয় কিছুই জানা নেই, শুধু একটি নাম রণবীর দুগল। তার বয়স

কত? কোথাকার লোক? ডুগল? ডুগর আছে জানে কিন্তু ডুগল? তানবীরকে তখনি ফোন করল জগদীশ। রণবীরকে খুঁজে বার কর?

—কিন্তু সে কে? কোথায় থাকে?

—কিছুই জানি না। তানবীরের সঙ্গে নামের মিল আছে রণবীরের। তাকে খুঁজে বের করতে পারলে তুমিই পারবে। চেষ্টা কর। অ্যামেরিকায় এফ বি আই শুধু একটি নাম পেয়েছিল। হ্যারি গোল্ড, বিখ্যাত অ্যাটমিক স্পাই ডঃ কার্ল ফুকসকে যে সাহায্য করেছিল। শুধু ঐ নাম থেকেই হ্যারি গোল্ডকে খুঁজে বার করেছিল

—জানি হ্যারি গোল্ড ছিল তার আসল নাম কিন্তু রণবীর ডুগল যদি আসল নাম না হয়

—তাহলে এক কাজ কর, কলকাতায় ত অনেক সি আই এ এজেন্ট আছে তাদের কারও সঙ্গে ভিড়ে পড়। বল তুমি, তাদের হয়ে কাজ করতে চাও। তারপর বাকিটা করবে তুমি, বুঝেছ

—সি আই এ-এর দলে কেন?

—সি আই এ-এর তালিকায় রণবীরের নাম আছে

—তুমি বেশ আছ, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে থাকবে তুমি আর আমি খুঁজে বেড়াব সি আই এ-এর টিকটিকি-কে?

—এই চোপ, যা বলছি তাই কর! পারলে তোমার ভাল হবে বলে দিলাম

সারাদিনটা জগদীশের কাটল এইসব ধান্দায়। বিকেলে হোটেলের অপারেটরকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে বলল: এই নম্বরে একজন মহিলা থাকেন, রুবি নাম। তাকে একটু ডেকে দাও।

দু মিনিট পরে বেল বাজল।

—হ্যালো

—রুবি?

—হ্যাঁ, তুমি কে ?

—জগদীশ, জগদীশ চৌধুরী

—ও ছ্যাট হ্যাণ্ডসাম বয়, এত তাড়াতাড়ি, আর থাকতে পারলে না বুঝি

—বুঝতেই ত পারছ, কি করছিলে ? ফ্রি আছ ?

—এখন ফ্রি আছি, আসবে ?

—হ্যাঁ,

—কখন আসবে, এখনি না পরে

—তুমি বললে এখনি যাব

—বেশ তাই এস, রাত্রে ডিনার আছে, তাড়াতাড়ি এস

—জগদীশ আর কথা বাড়াল না। লাইন ছেড়ে দিল। লাইন ছাড়তে না ছাড়তে আবার ফোন বেজে উঠল

—রুবিকে আপনি কতদিন জানেন মিঃ চৌধুরী ? টেলিফোন অপারেটর জগদীশকে জিজ্ঞাসা করছে

—তুমি চেন বুঝি ?

—আরে আমি একা নাকি ? কলকাতার সমস্ত হোটেল, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, ক্যাসিনো, সবাই রুবিকে চেনে, আমাকে যদি বলতেন রুবিকে চাই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি কনেকশন করে দিতাম

—তার এত বেশী পপুলারিটির কারণ কি

—আরে দাদা রুবি যখন যে হোটেলে আসে তখনই সেই হোটেল মাতিয়ে রাখে আর কোন হোটেলেই বা সে যায় না, পেটে যেই একটু ওয়াইন পড়ল আর অমনি রুবির মুখ খুলে গেল, সময় সময় নাচতেও আরম্ভ করে, ট্যুইস্ট নাচে ওর জুড়ি সুয়েজের এপারে আর কেউ নেই

জগদীশ ভাবল রুবিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল অথচ সে যে হোটেলে থাকে তার টেলিফোন অপারেটরই তাকে চেনে। এই অপারেটর হয়ত রণবীরকেও চিনতে পারে। তবে টেলিফোনে

জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। এই অপারেটর নিজেই যদি সি আই-এর লোক হয়? অনেক হোটেলে ত এমন অনেকে আছে! তার চেয়ে

—থ্যাংক ইউ মিস···

—আমার নাম এখনও জানেন না বুঝি, মিস খান্না, সুরজিত খান্না

—থ্যাংক ইউ সুরজিত, আজ আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?

—খেতে পারি মিঃ চৌধুরী তবে এই হোটেলে নয় এবং নো ড্রিংক প্লিজ

—ঠিক আছে, তুমি আমার জন্যে আটটার সময় লাউঞ্জে ঘড়ির নীচে ওয়েট করবে, আই উইল পিক ইউ আপ

ওপারে হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপরের সেকেণ্ডেই দুজনেই লাইন কেটে দিল।

রুবির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ে ঠিকানাটা অবশ্যই জেনে নিয়েছিল জগদীশ। হোটেলের নিজস্ব ট্যাক্সি নিয়ে রুবির সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে হাজির। জগদীশকে কষ্ট করে বাড়ি খুঁজতে হয়নি। ড্রাইভারকে রুবির বাড়ির নম্বর বলতেই সে সোজা রুবির ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি এনে হাজির।

গাড়ি থেকে নেমে জগদীশ ড্রাইভারকে টিপস দিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল। ড্রাইভার অপেক্ষা করতে রাজি ছিল। কিন্তু জগদীশ বলল সে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরবে।

রুবি বোধ হয় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। গাড়ির আওয়াজ হতেই সে দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল

—আরে এস এস জগদীশবাবু, কি ভাগ্য আমার। এই যে এদিকে এস, একবার আশে-পাশে অন্য ফ্ল্যাটের দিকে চেয়ে দেখ। দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখলাম ত, জানালায়, দরজায়, বারান্দায় অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে

—মেয়ে বোলো না, মেয়েদের মা বল, কেন দাঁড়িয়ে আছে জান কি ?

—না, কি করে জানব বল, তোমার ফ্ল্যাটে এই ত প্রথম এলাম

—তাহলে শোনো, আমার ফ্ল্যাটের সামনে কোনো গাড়ি দাঁড়ালেই হচ্ছে। সব ফ্ল্যাটে যেন সাড়া পড়ে যায়, ঐ সব মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, ওরা লক্ষ্য করে আমার ফ্ল্যাটে কে এল, ঘরের পর্দা খুলে রাখবার জো নেই তাহলে ওদের কৌতূহল বেড়ে যায়, কখনও কোনো পুরুষকে দেখতে পাবেনা তাহলেই তার বর এসে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে

—কারণ ?

—বুঝলে না, আমি যে খারাপ মেয়ে। এই যে তুমি ঐ চেয়ারটায় বোসো। ওরে ও হাসিনা

হাসিনা হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল। বাঃ বেশ মেয়েটাত। দেখন্ হাসি, স্ফূর্তিবাজ, চটপটে, কাছে ডেকে আদর করতে ইচ্ছে করছে, এ নিশ্চয় রুবির মেড

—এই হাসিনা সাহেবকে তোর সেই বাদামের সরবত খাইয়ে দে। অর্ডার শুনে হাসিনা হাসতে হাসতে চলে গেল।

—বাদামের সরবত ? ব্যাপারটা কি ? সকলে চা, কফি, সফট ড্রিংক, বিয়ার অন্য কিছু অফার করে

—জানি, একবার খেয়েই দেখনা, হাসিনার মায়ের ফর্মুলায় তৈরী। খেলে শরীর মন আনচান করবে, দারুণ একসাইটিং, নিজেকে সামলানো দায়

—তাই নাকি ? তাহলে ফর্মুলাটা আমাকে বলে দাও না, চাকরী-বাকরী ছেড়ে ঐ সরবতের একটা দোকান দি

—ইস্, আমি বলে ঐ সরবতের একটা বার করব ঠিক করেছি তবে তোমাকে হয়ত ম্যানেজার করলেও করতে পারি, তোমার চেহারাটা মেয়ে পটাবার পক্ষে বেশ ভাল, তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড কটা আছে

—তুমি হবে? আমার একটাও গার্ল ফ্রেণ্ড নেই

—হয়েই আছি, যাক এবার বল কি খবর, বলতে বলতে রুবি জগদীশের পাশে বসল। তার পরনে ছিল হাউস কোট। এমন ভাবে বসল যে এক দিকের উরু উন্মুক্ত হয়ে গেল, রুবি তা ঢাকা দেবার চেষ্টা করল না, বুকের ওপরের বোতামও খোলা ছিল, প্রায় সমস্ত বক্ষযুগল উন্মুক্ত, চোখ ফেরালেই জগদীশ তার বুক দেখতে পাচ্ছিল। এইসব দৃশ্যে জগদীশ অভ্যস্থ।

—আমি তোমার বান্ধবী মেরি কাপুর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, ওর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—তা বেশ কয়েক বছর, কিন্তু তুমি কে? তোমার বিষয় কিছু বল

—আমার নাম ত জানই, আমি মেরিকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছি তা ছাড়া ওর স্বামী কি ভাবে মারা গেল তাও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি

—ও তুমি তাহলে গোয়েন্দা

—তা বলতে পার, মেরি কি রকম মেয়ে

—ভাল মেয়ে, আমার মতো খারাপ মেয়ে নয়, স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিল, ভাল মেয়ে

—ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন কিছু জান?

—আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল? তা ত শুনি নি, মাঝে ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না, ওর স্বামী মারা গেছে খবরের কাগজে পড়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ও অনেক কথা ভুলে গেছে, কিছু এলোমেলো কথাও বলছে, আমি ভাবলাম বেচারী হঠাৎ শোক পেয়ে ঐ রকম হয়ে গেছে বোধহয়

—তা নয়, ডাক্তারেরা মনে করে যে ওর মন থেকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দূর হয় নি, সেই প্রবৃত্তি দূর করার জন্যে ইলেকট্রিক শক চিকিৎসা চলছে, যার জন্যে ওর সাময়িক ভাবে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে

—তাই নাকি? আমি ত এতসব জানতাম না, সুকুমারীও ত কিছু বলল না

—আচ্ছা রুবি তোমার কি মনে হয় যে প্রচুর টাকা পেলে মেরি কোনো খারাপ বা অন্যায় কাজ করতে পারে?

—কি রকম? কত টাকা? কি খারাপ কাজ? কাউকে খুন? কোনো পুরুষকে প্রলোভিত করা?

—টাকার পরিমাণ আড়াই লাখ

—অত টাকা পেলে কিছু খারাপ কাজ হয়ত করতে পারে তবে খুন জখম বা কাউকে বিষ খাইয়ে হত্যা ও করতে পারে না।

হাসিনা সরবত নিয়ে এল। জগদীশ চুমুক দিয়েই বুঝল যে এ ত সিদ্ধির সরবত। এই সরবত ও ছোটবেলা থেকে খেয়ে আসছে, তবে হাসিনা একটু গোলমরিচ গুঁড়িয়ে দিয়েছে যাতে নেশা না হয়, তবে রুবি ক্ষুন্ন হবে বলে জগদীশ কিছু বলল না। সে হাসিনার সরবতের খুব তারিফ করল।

—আচ্ছা রুবি, তুমি ইনসান ওমরকে চেনো?

—কেন মেরি বলছিল নাকি যে আমি চিনি?

—না মিসেস কাপুর কিছু বলেন নি, চেনো নাকি?

—না মনে পড়ছে না ত? অনেক পুরুষকেই ত চিনি তবে নামটা আমার মনে থাকে না, নাম নিয়ে আমার কি হবে, পুরুষটা কেমন, আমার কাছে তারই গুরুত্ব বেশি, বুঝলে মশাই, এই যে তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তোমার নাম হয়ত ভুলে যাব কিন্তু তোমাকে আমার ঠিক মনে থাকবে

জগদীশের মনে হল রুবি হয়ত ইনসানকে চেনে। সে প্রথমে মেরির কথা বলল কেন? মেরি যদি বলে থাকত যে রুবি ইনসানকে চেনে তাহলে কি রুবি স্বীকার করত। তবুও বলল:

—মনে করে দেখত, বেশ লম্বা, সুদর্শন, খুব কম কথা বলে, মেয়েদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নেই, মনে পড়ে?

—ও রকম পুরুষ ত হাজার হাজার আছে

—আচ্ছা রুবি আজ আমি উঠি, তুমি ত আবার ডিনারে যাবে, আমি আবার আসব

—নিশ্চয় আসবে

তানবীরের বাড়িতে ইনসানকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেইজন্যে তানবীর এখন আর হোটেলে থাকে না। নিজের বাড়িতেই থাকে।

ইনসানের কাছ থেকে এখনও কোনো কথা বার করা যায় নি। অনেকক্ষণ ধরে তাকে ক্রমাগত জেরা করার পর সে বলল, যে কিছু হয়ত সে বলতে পারে যদি তাকে কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে দলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে। ও প্রস্তাব অসম্ভব। কারণ ইনসান বলেছে যে তাকে যদি জগদীশ বা তানবীর অনুসরণ করে তাহলে সেই দলের লোকেরা টের পেলে তাকে মেরে ফেলবে, মানে ইনসানকে।

জগদীশ তাকে একেবারেই ছাড়তে রাজি নয়। ছাড়া পেলে ইনসান আর ফিরে আসবে না, সে ফিরে আসতে চাইলেও তার দলের লোক তাকে আসতে দেবে না। চাই কি তারা ইনসানকে হত্যা করতেও পারে।

কাউকে টেলিফোন করলে হয় না? ইনসান যে সময়ে টেলিফোন করবে সেই সময়ে জগদীশ বা ইনসান না হয় কাছে থাকবে না।

হ্যাঁ, ইনসান তা করতে পারে। তাহলে এখনি টেলিফোন কর। জগদীশ প্রস্তাব করল। ইনসান রাজি হল। টেলিফোনের ঘরে ইনসানকে বসিয়ে ওরা বাইরে থেকে ঘর বন্ধ করে দিল।

ইনসান প্রায় দশ মিনিট কথা বলল। দরজা খোলার পর সে বলল, জগদীশের জন্যে দল একটি মাত্র কথাই বলেছে

—কি বলেছে, জগদীশ জিজ্ঞাসা করে

—দল বলেছে যে জগদীশ যদি মেরি কাপুরকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে তাকে দল আড়াই লাখ নয় দু'লাখ টাকা দেবে এবং যখন জগদীশ তাদের টাকা ভারতের বাইরে বার করে দেবে তখন তাকে আরও পঁচিশ হাজার দেবে।

জগদীশ রাজি থাকলে যেন কাল বেলা বারোটার মধ্যে জানিয়ে দেয়। না জানালে ওরা কি করবে এখনও বলে নি। সঠিক জবাব শুনে বলবে ওরা কি করবে।

—ঠিক আছে, তুমি আজই জানিয়ে দাও যে আমরা রাজি আছি, হ্যাঁ, মেরিকে আমরাই হত্যা করব, আমরা যদি হত্যা না করি তাহলে তোমার দল ত ওকে মারবেই, তুমি জানিয়ে দাও যে আমি তোমার দলের প্রস্তাবে রাজি আছি

—ঠিক আছে আমি জানিয়ে দেব

—তাহলে কোথায় টাকা দেবে এবং অন্যান্য কথাবার্তা হবে সে সব তুমি জেনে নিও। জেনে নিও কেন? তুমি এখনই ফোন কর

—এখন হবে না, আসল লোক বেরিয়ে গেছে, আমি রাত্রে ফোন করব।

জগদীশ বুঝল যে ইনসানের দল মানে যারা ব্যাটল প্ল্যান চুরি করেছিল তারা বিপদে পড়েছে। টাকা হজম করতে পারছে না, অবশ্য ও টাকা তারা কোনোদিনই হজম করতে পারবে না কারণ সব নোটই জাল।

নোট জাল হক আর যাই হক, ওরা মেরিকে খুন করবার চেষ্টা করুক বা না করুক এমন কি ইনসানকে হাতে পেলেও হয়ত খুন করবে, সে ওরা কি করবে না করবে সে পরের কথা, দলের কোনো লোককে ধরতেই হবে। জগদীশ যে ফাঁদ পাততে যাচ্ছে আশা তার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

চট করে একটা কথা জগদীশের মনে উদয় হল। ইনসানকে কোথায় রাখা হয়েছে সে কথা ও যদি ফোন করবার সময় তার সেই দলকে কিছু বলে থাকে? ওকে এখনি সরানো দরকার।

—তানবীর তুমি ত এখানকার লোক। ইনসানকে এখান থেকে এখনই সরাতে হবে আর তাছাড়া আজই রাত্রে মেরি কাপুরকেও লুকিয়ে রাখতে হবে। দুটো বাড়ি চাই।

অনেকক্ষণ ভেবে তানবীর বলল: দুটো বাড়ি নেই। কলকাতার পাশেই বেহালাতে একটা বাড়ি আছে। বড় বাড়ি, সেকালের কোনো জমিদারের বাগানবাড়ি। সেই বাড়িতে দুজনকেই লুকিয়ে রাখা যেতে পারে

—সে বাড়িতে টেলিফোন আছে কি

—হ্যাঁ, টেলিফোন আছে

—কার বাড়ি? বাড়িতে লোক থাকে?

—বাড়ি আমার এক বন্ধুর, সে ওখানে একটা ওষুধের কারখানা করবে, তারই প্রস্তুতি চলছে

—বেশ ভালই হবে, আমি মনে করছি আর দু তিন দিনের মধ্যেই ব্যাপারটার ফয়শালা হয়ে যাবে, তাহলে তুমি এখনই তোমার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে ফেল। তোমাকেও সেখানে থাকতে হবে, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, আমি স্যাড-এর সিকিউরিটি অফিসারকে বলে জনকতক গার্ডের ব্যবস্থা করছি, ওরা সাদা পোশাকে গার্ড দেবে, পাড়ার লোকে যেন বুঝতে না পারে

—বেশ আমি এখনি ফোন করে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

সেদিন বিকেলেই একটি মিলিটারি অ্যামবুল্যান্স তানবীরের বাড়ি থেকে একটি ঘুমন্ত রোগীকে নিয়ে গিয়ে বেহালার একটি বাড়িতে নামিয়ে দিল।

ঘুমন্ত রোগীটি ইনসান ওমর। ইঞ্জেকশান দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বুঝতেও পারল না তাকে কোথায়

নিয়ে যাওয়া হল। তাকে যে ঘরে রাখা হল সেখান থেকে বাইরের কিছুই দেখা যায় না।

এই ত গেল ইনসান পর্ব। মেরির কি ব্যবস্থা হল ?

দুপুরে জগদীশ মেরি কাপুরকে ফোন করছিল :

—হ্যালো মিসেস কাপুর কথা বলছেন

—হ্যাঁ আমি মেরি কাপুর কথা বলছি, কে আপনি

—আমি জগদীশ, মিসেস কাপুর, চিনতে পারছেন

—ও জগদীশ, কি খবর

—কেমন আছেন, ফোনে কথা বলতে কেমন লাগছে

—ভালই লাগছে ত, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, আমার চিকিৎসা শেষ হয়ে গেছে

—তাই নাকি ? কবে ?

—পরশু, তুমি ত এ কদিন খবর নাওনি, আমার যেন পুরনো কথা একে একে মনে পড়ছে

—খুব ভাল কথা ; আচ্ছা এইবার যা বলছি মন দিয়ে শুনুন, আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার কোয়ার্টারের কাছেই যে উইণ্ডসর কাফে আছে তারই সামনে একখানা সবুজ গাড়িতে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, আপনি কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি এসে গাড়িতে উঠে বসবেন। মনে রাখবেন কাউকে কিছু বলবেন না, ঠিক দুদিন আপনাকে লুকিয়ে রাখব

—ব্যারির কানে যদি ওঠে

—জানেন না ওরা সাতদিনের জন্যে রামগড়ে যাচ্ছে ? তাছাড়া আপনার ঐ 'সাজানো মৃত্যুর খবর' যাতে ওর কানে না ওঠে তার ব্যবস্থা আমি করেছি

—কি বলেছ ওদের ? তাহলে সব ত ফাঁস হয়ে যাবে

—সে আমি ঠিক ম্যানেজ করেছি, আপনি ভাববেন না, কিছুই ফাঁস হবে না, ওরা রামগড়ে যেখানে থাকবে সেখানে খবরের কাগজ পৌঁছতে তিন দিন লেগে যাবে, ততদিনে আপনি বাড়িতে ফিরে আসবেন

— ঠিক আছে, আমি ঠিক সাতটার সময় উইণ্ডসর কাফের সামনে যাব, সুকুমারীও জানতে পারবে না, খবরটা যেদিন কাগজে ছাপা হবে সেইদিন বিকেলেই আপনি বাড়ি ফিরে আসবেন এবং আমি আশা করছি যে এরই মধ্যে আমরা সব রহস্যের সমাধান করতে পারব

—বল কি ? আর শোনো, জয় আমাদের বাড়ি থেকে শেষ যেদিন চলে যায় সেদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে একটা নাম বলেছিল সেই নামটাও আমি তোমাকে বলব আর অন্য যে সব কথা আমার এখন মনে পড়ছে তাও বলব

—তাহলে আমি আপনার জন্যে উইণ্ডসর কাফের সামনে ঠিক সাতটায় ওয়েট করব

—ঠিক আছে।

জগদীশ চলে যাবার পর রুবি মনে মনে বিরক্ত হল ও পরে চিন্তিত হল। বিরক্ত হবার কারণ হল এই যে অমন একটা পুরুষকে হাতে পেয়ে সে ছেড়ে দিল। ডিনারে যাবার ত আরও দেরি ছিল। না, ওকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি।

হাসিনা বোধহয় সরবতটা আজ ঠিক করতে পারে নি। সে নিজেও ত উত্তেজিত বোধ করছে না। কিছু একটা গোলমাল করেছে, এই হাসিনা শোন

—কি বলছ রুবি বহিন, হাসিনা রুবিকে ঐ নামেই ডাকে, রুবিই শিখিয়েছে

—হ্যাঁরে অন্যদিন যে রকম সরবত করিস আজও কি সেই রকম করেছিস

—কেন বলত ?

—আজ ত আমার শরীর গরম হল না, সাহেবও তাড়াতাড়ি চলে গেল, আর এক গেলাস চাইল না, কি হয়েছে ঠিক করে বল ত

—তুমি ঠিক ধরেছ দিদিমণি, আমার সেই পুরিয়া ফুরিয়ে গেছে, গুঁড়ো করা হয় নি

—তাই বল, ঠিক আছে এখন যা, পুরিয়া তৈরি করে রাখ। ছেলেমানুষ ভুল করে ফেলেছে, কি আর করা যাবে কিন্তু ঐ জগদীশ আসলে কে ? ঠিক ডিটেকটিভ নয় অথচ কে ও ? ওর কাছে ত দুম করে বলে বসল যে ইনসানকে ও চেনে না, এখন জগদীশ যদি বার করে ফেলে যে ইনসানের সঙ্গে ওর খুব চেনা আছে তখন ? আর বার করা ত শক্ত নয়, মেরিই ত বলে দেবে। মেরিকে জিজ্ঞাসা করলেই ত জানতে পারবে। তাহলে এক কাজ করা যাক। ইনসানকে সাবধান করে দেওয়া যাক। ইনসানকেও কদিন থেকে দেখা যাচ্ছে না। সে ত সুইমিং ক্লাবেও আর আসছে না ? লোকটা মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

রুবি অ্যাডেলফি হোটেলে ফোন করল। না, ইনসান অ্যাডেলফিতে নেই, সেখানকার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে।

—কোনো ঠিকানা রেখে গেছে ?

—কে ? রুবি বলছ ? অপারেটর রুবিকে চেনে। তার কণ্ঠস্বর চিনতে কখনও ভুল করে না।

—হ্যাঁরে সুরজিত আমি রুবি, ইনসানের কোনো খবর জানিস ?

—কি ব্যাপার ? তুমি খুঁজছ, আরও কেউ কেউ খুঁজছে

—আর কে খুঁজছে

—ক্যাপটেন জগদীশ চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক খুঁজছেন

—তাই নাকি ? আরে ঐ জগদীশ কে বলত ?

—তোমার কাছেও গিয়েছিল নাকি ?

—হ্যাঁরে, ইনসানের কথা জিজ্ঞাসা করছিল

—জগদীশ বেশ লোক, আমাকে একদিন ডিনারে নিয়ে গিয়েছিল তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যেন আমার বড়দা, ছোড়দা হলেও কথা ছিল, যেই দুটো রসের কথা বলতে যাই অমনি সেটাকে চাপা দেয়

—যা বলেছিস, তা শোন তোর সঙ্গে যদি ইনসানের কোনো যোগাযোগ হয় তাহলে আমাকে খবর দিবি

—ইনসান কি কিছু গোলমাল করেছে নাকি, সে লোকটাও ত মিস্টিরিয়স্, সুরজিত বলে

—ঠিক জানি না

—আমার মনে হচ্ছে ইনসান কিছু একটা করেছে নইলে ক্যাপটেন জগদীশ দিল্লী থেকে এসে তার খোঁজ করত না, আচ্ছা ভাই লাইনটা এখন ছেড়ে দিচ্ছি

—একদিন আসিস

লাইন কেটে গেল। হোটেলে বোধহয় কেউ সুরজিতকে অন্য কোথাও লাইন দিতে বলছিল।

রুবির মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। সেদিন ডিনারে ভাল জমল না। ইনসানকে খুঁজে বার করতে হবে কিংবা জগদীশকে বলতে হবে যে সে ইনসানকে চেনে কিন্তু তার বিষয়ে কিছু জানে না, সেদিন অন্যমনস্ক ছিল তাই ভুলে বলে ফেলেছিল ইনসানকে চেনে না ইত্যাদি ইত্যাদি একটা কিছু বলতে হবে।

জগদীশ আবার কোথায় থাকে? তাও ত সে জানে না। আরে, সুরজিত ত জানে। ওকে ত ডিনারে নিয়ে গিয়েছিল।

রুবির সারারাত্রি ভাল ঘুম হল না। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল,

উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। বারান্দা রোদে ভর্তি হয়ে গেছে। হাসিনা চা দিয়ে গেল।

চা খেয়ে বাথরুম থেকে এসে সবে দাঁড়িয়েছে, টেলিফোন বেজে উঠল। আরে এ যে জগদীশের গলা! আর জগদীশকেই সে খুঁজছিল। রুবি উৎসাহিত হয়ে উঠল। তার মেজাজ ফিরে এল কিন্তু জগদীশের কণ্ঠস্বর তাকে নিরাশ করল

—মিস রুবি? আমি জগদীশ

জগদীশের গলা অত গম্ভীর কেন? তার যে ভয় করছে!

—হ্যাঁ আমি রুবি কথা বলছি জগদীশ, কি হয়েছে, সামথিং সিরিয়স?

—ভেরি, ভেরি সিরিয়াস, তুমি একবার এখনি বালিগঞ্জ থানায় আসতে পারবে?

—বালিগঞ্জ থানায়! থানায় আবার কেন? আমি ঐ সব থানা পুলিস্ বড় ভয় করি

—তোমার কোনো ভয় নেই, তোমাকে কিছু আইডেনটিফাই করতে হবে

—কি আবার আইডেনটিফাই করতে হবে। সেই ইনসানকে ধরেছ বুঝি? সে বুঝি বলেছে আমাকে চেনে, চিনি ত কি হয়েছে, না জগদীশ, আমাকে বাদ দাও

—ও সব কিছু নয়, শোনো আজ শেষ রাত্রে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে এক অ্যাকসিডেন্টে মিসেস মেরি কাপুর মারা গেছেন....

কথা শেষ হবার আগেই রুবি আর্তনাদ করে উঠল

—সে কি? জগদীশ তুমি বলছ কি, শেষ রাত্তিরে মেরি ওখানে কি করছিল?

—সে সব এখনও কিছু জানা যায় নি, তবে কাল সন্ধ্যা থেকেই মিসেস কাপুরের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না

—তাহলে শেষ পর্যন্ত সে কি সুইসাইড করল?

—সুইসাইড নয় বোধহয়, যারা মিঃ কাপুরকে খুন করেছে তাদের হাত আছে বলে মনে হয়। যাই হক তুমি একবার এসো, কারণ মিসেস কাপুরের বডি এমন ভাবে মিউটিলেটেড হয়ে গেছে যে তাঁকে চেনা যাচ্ছে না, কাজেই ওর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে জানা গেল যে মৃতার নাম মিসেস মেরি কাপুর। সুকুমারী থানায় এসে তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ ও পরিধেয় পোশাকগুলি আইডেনটিফাই করে দিয়ে গেছে। আরও একজন আইডেনটিফাই করলে ভাল হয়। তোমার নাম মনে পড়ল তাই তোমাকে ডাকলাম, আসছ ত ?

—হ্যাঁ যাচ্ছি

পরদিন সকালে খবরের কাগজে দুটি খবর ছাপা হল। একটি বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতায় আর অপরটি ভেতরের পাতায়।

প্রথম খবরটিতে বলা হয়েছে যে কাশ্মীর ভ্যালির কেরান সেকটরে এবং হাজি পীরের বিপরীতে বাঘ এলাকায় পাকিস্তান বিপুল পরিমানে সৈন্য সমাবেশ করেছে, সেখান থেকে তারা জম্মু প্রদেশের পুঞ্চ এলাকায় গোলা বর্ষণ করছে।

শ্রীনগর থেকে অভিজ্ঞ মহল বলছেন যে পাকিস্তান কেরান সেকটরে একটি এবং ছাম্বের বিপরীত এলাকায় একটি ইনফ্যান্টি, ব্রিগেড পাঠিয়েছে। খৈরনে ওরা হেডকেয়ার্টার স্থাপন করেছে এবং যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর পাকিস্তান পাঠান, মাগুদ, তোচি স্কাউট, গিলগিট স্কাউট এবং মুজাহিদদের বিশেষ বিশেষ ঘাঁটিতে মোতায়েন করেছে। এছাড়া পুরো ডিভিসন সৈন্য ঐ সব বিশেষ ঘাঁটিতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান হালে টিথওয়াল সেকটরে ও খৈরান সেকটরেও ভারত প্লেটুন পোস্ট আক্রমণ করেছিল। টিথওয়াল সেকটরে পাকিস্তানের চারজন অফিসার নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে একজন কর্নেল আর একজন মেজর। ভারতেরও একজন মেজর নিহত হয়েছে।

পুঞ্চ এলাকাতেও পাকিস্তান সৈন্যরা তৎপর রয়েছে, মাঝে মাঝে তারা গোলাবর্ষণ করছে ও কাছাকাছি গ্রামে ঢুকে ভেড়া তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে সফর করে গেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। সংবাদে আরও প্রকাশ যে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অপেক্ষা চীনা পরামর্শদাতাদের নির্দেশ মানতে অধিকতর উৎসাহী।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পাকিস্তান আজ পর্যন্ত যে কটি গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ চালিয়েছে সেগুলি সবই শুক্রবারেই আরম্ভ হয়েছে।

এটি হল প্রথম পাতার বড় খবর। আর ভেতরের পাতার ছোট খবরটিতে বলা হয়েছে যে:

গতকাল শেষ রাত্রে আলিপুরস্থিত ন্যাশনাল আরকাইভস অ্যাণ্ড ডকুমেন্টস-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীজয়শংকর কাপুরের পত্নী শ্রীমতী মেরি কাপুর বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের কাছে এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বজবজ থেকে আগত শিয়ালদহগামী এক ট্রেনের তলায় কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মাত্র কয়েক দিন আগে শ্রীকাপুর আত্মহত্যা করেছেন।

শ্রীমতী কাপুরের মৃতদেহ এতদূর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে তা সনাক্ত করা খুবই দুরূহ হয়েছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঘটনার পূর্বদিন থেকেই শ্রীমতী কাপুর নিজের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন। পুলিস অনুমান করছেন যে কোনো দুষ্কৃতকারীর দল শ্রীমতী কাপুরকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অন্যত্র হত্যা করে রেললাইনে দেহটি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। পুলিস অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

ওদিকে তখন মেরি কাপুর বেশ আরামেই রয়েছেন। তাঁর কোনো অসুবিধে নেই। একমাত্র অসুবিধা হল স্বামীর জন্য শোক

আর একমাত্র সন্তান ব্যারির জন্য দুশ্চিন্তা। তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তবুও এখন থেকে চিন্তা করছেন। এখন তিনি একা হয়ে গেলেন। একা কি করবেন? ব্যারিকে নিয়ে অ্যামেরিকায় চলে যাবেন? আলিপুরে কোয়ার্টারের কর্তৃপক্ষ আর বেশি দিন থাকতে দেবে না। কাপুরের জায়গায় লোক এসে গেলে ওঁকে কোয়ার্টার ছাড়তে হবে।

জগদীশ এসে জানিয়ে গেল আর একটা দিন মাত্র অপেক্ষা করুন মিসেস কাপুর, আপনার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত, আশা করছি আমরা আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিঃ কাপুরের হত্যাকারীকে সদলে ধরতে পারব। আপনি বেশ সুস্থ বোধ করছেন ত? কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি?

—অসুবিধে বলতে এমন কিছু নেই তবে আমার মানসিক ব্যালান্স এখনও ঠিক ফিরে পাইনি, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সেটা হয়ত ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমার এখন কিছু কিছু দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে

—দুশ্চিন্তা? কিসের?

—এই যেমন ধর আমাকে আজ না হয় কাল কোয়ার্টার ছাড়তে হবে, তখন কোথায় থাকব? কলকাতা আমার কাছে নতুন। কিছুদিন আমাকে কলকাতায় থাকতেই হবে। জয়ের প্রাপ্য টাকা পয়সার হিসেব বুঝে নিতে হবে

—ওর জন্যে দেরি হবে না বোধহয়

—না, দেরি হবে, আমাকে হয়ত এর জন্যে কলকাতা দিল্লি ছুটোছুটি করতে হবে

—সে সব মিটে গেলে তারপর কি করবেন?

—তারপর মনে করছি ব্যারিকে নিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাব

—এ প্রস্তাব ভাল, সেখানে আপনার বাবা মা আছেন, ব্যারিরও ভবিষ্যত দেখতে হবে ত

—তবে মিসেস কাপুর একটা কথা আছে, আমারও মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় যত তাড়াতাড়ি মনে করছেন তত তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না।

—কেন ?

—ধরুন আসামীরা দু এক দিনের মধ্যে ধরা পড়ল, তারপর পুলিস ইনকুয়ারি আছে, কোর্টে কেস আছে, এসব কি এক আধ বছরে মিটবে ? নিশ্চয় দেরি হবে, ততদিন আপনি কি করবেন

—ঠিক, এ কথা ত আমি চিন্তা করি নি, তাহলে ?

—সে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, যাতে আপনি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে। কারণ আপনি আমাদের প্রধান সাক্ষী। আচ্ছা আপনার ঐ বান্ধবী রুবি, ওর সঙ্গে কি ইনসানের আলাপ ছিল না ?

—কি জানি কেন ইনসানের কথাগুলো আমি এখনও ঠিক মনে করতে প্যারছি না, ওকে ভুলে যেতে চাই বলেই হয় ত, আমি ঠিক বলতে পারছি না রুবি ইনসানকে চিনত কি না।

—আচ্ছা রুবি মোটা টাকা পেলে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে ?

—টাকা কি বলছ জগদীশ ? ও যদি কোনো পুরুষকে পছন্দ করে, এই যেমন তুমি, তুমি যদি ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও, ওকে নিয়ে রাত্রি কাটাও, তারপর ওকে যা বলবে ও তাই করবে। মোটা টাকা পেলে ত কথাই নেই, ও সব পারে

—আচ্ছা আর একটা কথা, আপনি বলেছিলেন যে মিঃ কাপুর আপনাকে কি একটা কথা বলে গিয়েছিলেন সেটা আপনি আমাকে পরে বলবেন বলেছিলেন, এখন কি সেটা বলবেন

—হ্যাঁ বলব, যদি ভুলে যাই সেই জন্যে কথাগুলো আমি লিখে রেখেছি, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি, আমার ঐ ব্যাগটা দাও ত.... হ্যাঁ, এই যে এই নাও পড়ে দেখ

একটা ক্যাশমেমোর উল্টোপিঠে মিসেস কাপুর কয়েকটা লাই পেনসিল দিয়ে লিখে রেখেছেন। জগদীশ লাইনগুলি পড়ে কাগজখানি আবার মেরি কাপুরকে ফিরিয়ে দিল।

—কি তোমার কাজে লাগবে না ?

—এতে যার নাম লেখা আছে তাকে আমি সন্দেহ করি, আমি সে বিষয়ে খোঁজ খবর করছি, তবে আপনি যা লিখে রেখেছেন সেটা একটা অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু ঘটনাটা কি হয়েছিল আপনি কি মনে করে বলতে পারেন

—হ্যাঁ পারি, জয় বুঝি কি জন্যে ইনসানের বাড়িতে গিয়েছিল, ইনসান তখন নরেন্দ্রপুরে ফিলিপ নাম নিয়ে লুকিয়েছিল। জয় যখন ইনসানের সঙ্গে কথা বলছিল তখন টেলিফোন বেজে ওঠে, টেলিফোনটা বোধহয় জয়ের হাতের কাছে ছিল, সে ফোন ধরে কিন্তু ফোনে যার গলা শুনল তাকে ও চিনতে পেরেছিল। এই চিনতে পারাটাই বোধহয় জয়ের কাল হয়েছিল

ঠিক আছে, আমি এখন যাই মিসেস কাপুর। আজ আমার অনেক কাজ। আমি ঠিক সময় এসে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

এবার ইনসানের খোঁজ নেওয়া দরকার। ইনসান নাকি গতকাল রাত্রে তার দলকে টেলিফোন করেছিল, তানবীর বলল। জগদীশ তখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় বেহালার এই বাড়িতে থাকতে পারেনি। তবে কি কথা হয়েছে সে কথা সে তানবীরকে বলে নি।

ইনসান বেশ সুস্থই আছে। তার ঘরে খবরে কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে দুর্ঘটনায় মেরি কাপুরের "মৃত্যু" সংবাদ সে কাগজে পড়েছে।

তার আগে একবার জেনে নিলে হয় বীরেন্দ্র সোনপাল খবরটা

কাগজে পড়েছে কিনা। তার বৌদির মৃত্যু সংবাদে তার মনে কি প্রতিক্রিয়া হল ?

এয়ারফোর্স স্টেশনের লাইন আবার সরাসরি পাওয়া যায় না। প্রথমে ডাকতে হয় ফোর্ট উইলিয়মের একটি লাইন। সে লাইন থেকে তারা ব্যারাকপুরে এয়ারফোর্স স্টেশনে লাইন দেবে।

এয়ারফোর্স স্টেশনের অফিসার কমাণ্ডিং স্কোয়াড্রন লিডার দত্তকে জগদীশ চাইল

—গুড মর্নিং মিঃ দত্ত। আমি চৌধুরী বলছি। ক্যাপ্টেন চৌধুরী অফ সি বি আই দিল্লি

—হ্যাঁ বলুন, আপনি শুনেছেন না|ক ?

—কি শুনেছি ?

—সোনপালের কথা ? বীরেন্দ্র সোনপাল ?

—না, শুনিনি ত, কেন কি হয়েছে ?

—তাঁকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না

—সে কি ? জগদীশ বিস্মিত ও হতাশ! কোথায় গেল!

—ও বোধহয় কাল রাত্রেই পালিয়েছে, ওর বিছানাপত্তর দেখে মনে হয় না যে ও রাত্রে বিছানায় ঘুমিয়েছিল

—কিন্তু কি করে তা সম্ভব ?

—বিরাট এরিয়া ত এই এয়ারফোর্স স্টেশনের। ওর ওপর নজর রাখা হত ঠিক কিন্তু কোনো কড়া গার্ড ত ছিল না

—তা ঠিক। আচ্ছা, কি আর বলব

—আমি সবাইকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি। মিলিটারি পুলিসকে জানিয়েছি, বীরেন্দ্রর অফিসারদেরও জানিয়েছি। আপনাকে আমি আপনার হোটেলে ফোন করেছিলাম। অপারেটর বলল যে আপনি ভোরে বেরিয়ে গেছেন। তার কাছে আমার নাম জানিয়ে বলে রেখেছিলাম যে আপনি ফিরে এসেই যেন ফোন করেন, আপনি কি এখন হোটেল থেকে ফোন করছেন ?

—না, মিঃ দত্ত, ঠিক আছে। আমি আপনাকে আবার পরে ফোন করব

—ভেরি সরি মিঃ চৌধুরী

জগদীশ ভাবল দত্ত সরি হয়ে আর কি করবে। বীরেন্দ্র পালাল কেন? ভয়ে? বীরেন্দ্রকে এখনই খুঁজে বার করা একান্ত দরকার। এই ব্যাপারে প্রধান দুজন সাক্ষী হল মেরি কাপুর আর বীরেন্দ্র। প্রশ্ন হল বীরেন্দ্র পালিয়ে গেছে না কি তার দলের লোকেরা তাকে অপহরণ করেছে?

আশ্চর্য নয়। কারণ ইনসান ওমরকে তারা পাচ্ছে না। তারা বুঝতে পেরেছে যে ইনসানকে সি বি আই-এর লোকেরা গ্রেফতার করেছে। বীরেন্দ্রকেও আটকে রেখেছে। যে কোনো সময়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলে ভরতে পারে অতএব তাকে কিডন্যাপ কর।

এখনও একজন বাইরে আছে। সে হল রুবি। রুবির সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। মেরির কাছে জগদীশ শুনেছিল যে সে আর রুবি এক সময়ে প্রায় রোজই বিকেলে সুইমিং ক্লাবে যেত। জগদীশ সুইমিং ক্লাবে খোঁজ নিয়ে যেটুকু জানতে পেরেছে তাতে রুবিকে তার সন্দেহ হয়েছে। রুবি হয়ত ইনসানকে চিনত।

মেরি কাপুরকে আর একবার জিজ্ঞাসা করা যাক। সে মনে করে আরও কিছু বলতে পারে কি না—বিশেষ করে রুবি ইনসানকে চিনত কি না।

ইনসান বেশ খুশি। সে খবরের কাগজ পড়েছে এবং মেরি কাপুরের 'মৃত্যু' সংবাদ সে বিশ্বাসও করেছে।

জগদীশ তার ঘরে ঢুকে দেখে যে সে যোগ ব্যায়াম করছে। নীচের দিকে মাথা ওপর দিকে পা তুলে নিশ্চল অবস্থায় রয়েছে।

জগদীশকে ঘরে ঢুকতে দেখে আস্তে আস্তে যোগাসন ত্যাগ করে বলল এক মিনিট স্যার

তারপর দু এক মিনিট শবাসন করে উঠে পড়ল। সে মেঝেতেই বসে রইল।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করল ঃ খবরের কাগজ পড়লে ?

—পড়লাম ত, আপনাদের আর খুন করতে হল না

—তা ত হল না, রিপোর্ট পড়ে দেখা যাচ্ছে যে আগের দিন বিকেলে তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তার মেড সুকুমারী বলে যে বৌদি একটা টেলিফোন পেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আর ফেরেন নি। জগদীশ একটা ব্লাফ দিল

—আপনি তাহলে গিয়েছিলেন ?

—নিশ্চয়

—আচ্ছা এই যে কাগজে লিখছে যে বডি এতদূর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে মিসেস কাপুরকে আইডেনটিফাই করা যায় নি, কেবল তাঁর ড্রেস আর হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতরের কাগজ দেখে তাঁকে আইডেনটিফাই করা হয়েছে, তাহলেও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে ; কেসটা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে না

—কি সন্দেহ ? যত সব বাজে কথা, মিসেস কাপুরকে মারবার আগেই খুনীরা তার মুখ বিকৃত করে দিয়েছিল কিন্তু একটা অকাট্য প্রমাণ তারা মুখে ফেলতে পারে নি। জানলে নিশ্চয় তাও করত

—অকাট্য প্রমাণটা কি ?

—সুকুমারী ও তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী দুজনেই সেটি দেখেছে, সেটি হল মিসেস কাপুরের ডান পায়ের উপর ভেতর দিকে একটি লাল জরুল আছে, একটা আধুলির আকারে

—কই আমি ত দেখতে পাইনি

—তুমি দেখবে কি করে ? তুমি সে সুযোগ পেলে কি করে ?

—কেন লেক সুইমিং ক্লাবে আমি ত মিসেস কাপুরকে বিকিনি পরা অবস্থায় দেখেছি। রুবিও ত থাকত।

জরুলের কথাটা অবশ্য জগদীশ পুরোপুরি ব্লাফ দিল। কিন্তু

একটা জিনিস সে জানতে পারল যে ইনসান রুবিকে চিনত। ইনসানকে আগেই জিজ্ঞাসা করতে পারত কিন্তু করে নি

—আরে উরুর ভেতরে ছোট্ট একটা জরুল আছে, তাও লাল রঙের, সে কি করে চোখে পড়বে ?

—তা বটে

—তুমি রুবিকে চেন নাকি ?

—চিনি না ? খুব চিনি, ঐ ত আমাকে মিসেস কাপুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল

—ঠিক আছে। এদিকে তুমি কি করলে ? শুনলাম তুমি কাল রাত্রে টেলিফোনে কথা বলেছ

—হ্যাঁ, বলেছি, সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। তবে চন্দননগরে যেতে হবে। সেখানে গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে ওরা আপনাকে টাকা দেবে কিন্তু স্যার আমার একটা খটকা লাগছে ?

—তোমার আবার কি খটকা লাগছে ?

—আপনি কে ?

—আমি কে মানে ?

—আপনি কি গভরনমেণ্টের লোক, না কি পুলিসের লোক ?

—কেন ?

—নইলে আপনি মেরি কাপুরের এইসব খবর জানলেন কি করে ? জগদীশ হো হো করে হেসে উঠল।

—এই কথা ? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিসস্যু নেই। আরে এটা বুঝলে না যে আমাদের স্মাগলারদের মধ্যে গভরনমেণ্টের লোকের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রাখতে হয় নইলে আমরা কাজ করব কি করে ? এই ত তোমার দল আমাকে আড়াই লাখ টাকা দেবে এর সবই কি আমার পেটে যাবে নাকি ? ওদের ভাগ দিতে হবে না ?

—বুঝেছি

ওদেরই একজন আমাকে মেরি কাপুরের খোঁজ দিয়েছিল। তারই কাছে শুনলাম, তুমি চন্দননগরের সেই বাড়ি চেন ?

—চিনি কিন্তু তুমি ভাই যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর ?

—সে ত তোমরাও করতে পার। তবে তোমাদের ভয় নেই। বেশ ত তোমাদের যদি সন্দেহ হয় তাহলে টাকা সমেত একজনকে আমি এদেশের বাইরে বার করে দিচ্ছি তারপর তোমরা আমাকে টাকা দিও

—এ প্রস্তাব ভাল। আমি আর একবার ফোন করব ?

—কর

—একটা কথা বলবেন ?

—কি কথা ?

—আপনারা আমাকে কোথায় আটকে রেখেছেন ?

—এখন বলব না। আর একটা খবর জান ?

—কি খবর ?

—বীরেন্দ্র সোনপালকে চেনো

—চিনি না তবে জানি

জগদীশ মনে মনে বলল : চেনো না আবার। তোমার বাংলোয় ত সে ফোন করেছিল, আর সেই ফোন ধরেছিল জয়শংকর !

—হ্যাঁ, সে কে ?

—ঐ ত ন্যাশানাল আরকাইভসের লোক। ওরই কাছ থেকে ত মেরি কাপুর কৌটোটা চুরি করেছিল।

—তার কি হয়েছে ? সেও কি খুন হয়েছে নাকি ?

—সে খুন হয় নি তবে তাকে যেখানে বদলি করা হয়েছিল সেখানে তার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, পালিয়েই গেল না তাকে তোমাদের দলের লোকেরা কিডন্যাপ করল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তুমি আর একবার ফোন করব বলছিলে না ?

—হ্যাঁ, আর একবার ফোন করা দরকার

—বেশ ফোন কর, চন্দননগরে যাবার সময়টাও জেনে নেবে

জগদীশের এখন দুর্ভাবনা রুবিকে নিয়ে। রুবির সঙ্গে ইনসানের আলাপ আছে একথা রুবি নিজে স্বীকার করে নি। মেরি কাপুরও মনে করে বলতে পারে নি কিন্তু ইনসান বলেছে।

আরও একটি সমস্যা রয়েছে। বীরেন্দ্র কোথায় গেল? নিজে পালাল নাকি ওকে ওর দলের লোকেরা কিডন্যাপ করল? সে কোথায় থাকতে পারে?

চন্দননগরে কোথায় দেখা হবে? নিশ্চয় কোনো বাড়িতে। তাহলে সেই বাড়িতে কিছু রহস্যের সমাধান হতে পারে। জয়-শংকরকে ত চন্দননগরেই হত্যা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে রুবির খবরটা নেওয়া দরকার। রুবিকে এখন বাড়িতে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তানবীরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে, গোপন গার্ডদের সতর্ক করে দিয়ে জগদীশ তানবীরের গাড়ি নিয়ে চলল রুবির সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে

গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ভাবছে, বীরেন্দ্রটা কোথায় গেল? হাওড়া, শিয়ালদা ও কাছাকাছি সব রেলওয়ে স্টেশন, সমস্ত চেক পয়েন্ট, দমদম ও এয়ারপোর্ট, বাসস্ট্যাণ্ড সব জায়গায় লোক মোতায়েন করা হয়েছে। কলকাতায় মুশকিল হয়েছে কি এখানে জনসংখ্যা প্রচুর। সব স্টেশনে বা অন্যত্র প্রচুর ভিড়। ঐ প্রচুর ভিড়ের ভেতর থেকে বিশেষ লোকটিকে খুঁজে বার করা অন্ধকার ঘরের ভেতর ছুঁচ খুঁজে বার করা অনেক সোজা।

রাস্তায় একটা প্রসেশন বেরিয়েছে, প্রচুর ভিড়, ট্র্যাফিক জ্যাম। বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল।

রুবির বাড়ি পৌঁছে বাইরে গাড়ি রেখে জগদীশ রুবির ফ্ল্যাটের

দিকেই চলল। আজ কিন্তু বারান্দায় বা জানালায় কৌতূহলী মেয়েদের ভিড় নেই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ নয়। ঈষৎ ফাঁক। কি ব্যাপার? দরজা খোলা। ভেতর থেকে এক ঘেয়ে একটা কান্নার সুর ভেসে আসছে। কে কাঁদছে? হাসিনাকে রুবি বকেছে বোধহয় তাই কাঁদছে।

জগদীশ আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল যাতে জুতোর শব্দ না হয়। দু-তিন পা ভেতরে ঢুকে ডাকল "হাসিনা"।

হাসিনা ডুকরে কেঁদে উঠল তারপর ছুটতে ছুটতে এসে জগদীশের দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল

—কি হয়েছে রে হাসিনা

হাসিনা কোনো উত্তর দিল না। ওর জামা ধরে টানতে লাগল। জগদীশ আবার জিজ্ঞাসা করল

—কি হয়েছে রে? তবুও কোনো উত্তর নেই

জগদীশ হাসিনার সঙ্গে চলল। জগদীশ অনুমান করল সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

ওরা রুবির শোবার ঘরে ঢুকল। রুবি গদি আঁটা এক চেয়ারে সাজগোজ করে বসে রয়েছে। কোথাও বেরোচ্ছিল বোধ হয়, মাথাটা একদিকে হেলে পড়েছে। ফর্সা রুবির গলায় কালসিটের দাগ।

জগদীশকে আর কিছু বলতে হল না। কেউ ঘরে ঢুকে গলা টিপে রুবিকে মেরে ফেলেছে।

—কে মেরেছে হাসিনা জানিস কিছু। কিছু বলতে পারিস? নিশ্চয় চেনা লোক কেউ তা নইলে তাকে রুবি ঘরে ঢুকতে দিল কেন?

এতক্ষণে হাসিনার মুখে কথা ফুটল। পরনের ফ্রকটা তুলে চোখ মুখ মুছে বলল:

—আমি কিচেনে ছিলাম হুজুর, রুবিমেম বেরোবেন আমি ওঁর জন্যে আণ্ডা ভাজছিলাম। দরজায় কে ঠকঠক করল, রুবিমেম নিজেই উঠে দরজা খুলে দিল তারপর কি হল আমি জানি না। লোকটা বোধ হয় রুবিমেমকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকেই গলা টিপে ধরেছিল। কাজ শেষ করে সে কখন বেরিয়ে গেছে তাও আমি জানিনা

—কখন জানতে পারলি

—আমি জিজ্ঞাসা করতে এলাম ব্রেকফাস্ট টেবিল লাগাবো কি না, ঘরে ঢুকে দেখি রুবিমেম চেয়ারে ঐ অবস্থায় রয়েছেন। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি, যখন বুঝতে পারলাম তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম

—তা তুই চেঁচামেচি করলি না। পাশের বাড়ি বা ফ্ল্যাট থেকে কাউকে ডাকলি না কেন?

—আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম সাহেব

—লোকটাকে তাহলে তুই একেবারেই দেখিসনি?

—না সাহেব, আমি লোকটার কিছুই দেখিনি

—তুই কটার সময় দেখলি? মানে দিদিমণিকে তুই কখন লি তিনি ওইভাবে বসে রয়েছেন?

—তখন বেলা আটটা হবে সাহেব

—এখন ত আটটা বেজে গেছে, পুলিসকে খবর দেওয়া দরকার। জগদীশ মনে মনে ভাবল এখন থানায় খবর দিলে পুলিস এক ঘন্টার আগে আসতে পারবে না, তার চেয়ে পুলিস কমিশনারকে সব বলা যাক। তিনি নিশ্চয় সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে দেবেন। স্থানীয় থানার পুলিস এসে তাকে সহজে ছাড়বে না অথচ বিকেলে তার জরুরী কাজ রয়েছে। পুলিস কমিশনারকে সেইরকম অনুরোধ করে রাখা ভাল যাতে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়।

পুলিস কমিশনারের লাইন সহজে পাওয়া যায় না, দুতিন বার

চেষ্টা করতে হল। জগদীশ তাকে ঘটনা বলল এবং তার অনুরোধও জানাল। পুলিস কমিশনার জগদীশকে আশ্বস্ত করে বলল: যাতে আপনাকে অযথা আটকে না রাখে আমি সে রকম বলে দেব, ঠিক আছে?

—হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংকস।

পুলিস আসবার আগে একটা স্টেটমেন্ট লিখে রাখল। স্টেটমেন্ট লেখা শেষ হবার পর রুবির ঘরখানা ভাল করে দেখতে লাগল কোথাও কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা। না কোনো সূত্রই পাওয়া গেল না। কোনো জিনিসপত্রও খোয়া যায় নি। হাসিনাও বলল বাইরে যেখানে যা থাকবার সবই ঠিক আছে। রুবির ভ্যানিটি ব্যাগ কেউ খোলেওনি। ভেতরে গোটা পঞ্চাশেক টাকা, একটা ঘড়ি আর একটা আংটি রয়েছে।

তাহলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে চুরি ডাকাতির উদ্দেশ্যে কেউ রুবিকে হত্যা করেনি। চোর ত দিনের বেলায় আসে না তারা আসে রাত্রে।

এ আর কেউ নয়। নিশ্চয় বীরেন্দ্র সোনপাল। ব্যারাকপুর থেকে সে বোধ হয় সোজা এখানে চলে এসেছে। রুবি ইনসানকে চিনত এবং ইনসানকে যখন চিনত তখন বীরেন্দ্র ছোকরাকেও নিশ্চয়ই চিনত। শুধু চেনা নয় কিছু গোপন ও সম্ভবতঃ মারাত্মক তথ্যও তার জানা ছিল, তাই বীরেন্দ্রর হাতে তাকে মরতে হল।

বীরেন্দ্র এখন আরও হত্যা করবে। একজনকে মারলেও যে শাস্তি দুজন বা তিনজনকে মারলেও সেই শাস্তি। পরবর্তী লক্ষ্য নিশ্চয় মেরি এবং ইনসান এবং আরও কেউ আছে কিনা জগদীশ জানে না। সেই পাঁচলাখ টাকাই বা কার কাছে আছে?

আপাততঃ মেরি ও ইনসান নিরাপদ। তাদের জগদীশ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে আর তানবীর ছাড়া আর কেউ জানে না।

পুলিস এসে পড়ল। পুলিস কমিশনারের অর্ডার ছিল জগদীশকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার। জগদীশ তার স্টেটমেণ্ট লিখেই রেখেছিল। সেটি সে ইনস্পেক্টরের হাতে তুলে দিল এবং তার বক্তব্য সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

পুলিস নিশ্চয় রুবির ফ্ল্যাটে সার্চ করবে। ইনসান বা বীরেন্দ্র সম্বন্ধে যদি কিছু পায় তাহলে সেগুলি যেন জগদীশকে দেখানো হয়! হাসিনা সম্বন্ধেও জগদীশ তার মতামত জানিয়ে বিদায় নিল।

কিন্তু সে এখন যাবে কোথায়?

একটা জায়গা আছে। বীরেন্দ্র সেখান লুকিয়ে থাকতে পারে। একবার নরেন্দ্রপুরে ঘুরে দেখে আসবে? ক্ষতি কি? হাতেও ত এখনও অনেক সময় রয়েছে।

জগদীশ নরেন্দ্রপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

গাড়িতে যেতে যেতে জগদীশের মনে পড়ছে সেই একটি নাম। কলকাতায় যে সব ভারতীয়কে সি আই এ-এর এজেণ্ট বলে সন্দেহ করা হয় তাদের যে তালিকা দিল্লী থেকে আর ডি শেঠী পাঠিয়েছিল তাতে সেই নামটি ছিল রণবীর ডুগল।

রণবীর ডুগল কে সে? কোথায় থাকে? কি রকম দেখতে? তানবীর কি তাকে খুঁজে বার করতে পারবে?

হোটেলের টেলিফোন অপারেটর সুরজিতকে সেদিন ডিনারে নিয়ে গিয়েছিল। রুবির বিষয় কিছু কিছু কথা হয়েছিল। তাও সে নতুন কথা কিছুই বলতে পারে নি। রুবির বাইরের জীবনটাই বলতে পেরেছিল।

কিন্তু রুবি এখন খুন হয়েছে। খুনের কোনো উদ্দেশ্যও এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য সন্দেহ হচ্ছে যে তার আর একটা জীবন ছিল যেটার বিষয় কিছু জানা যায় নি।

সবই রহস্য থেকে যাচ্ছে। রুবি, রণবীর ডুগল, বীরেন্দ্র

সোনপাল, ইনসান ওমর এমনকি মেরি কাপুর স্বয়ং। ইনসান মেরির নাম করেছে। সে নাকি পাঁচ লাখ টাকার ভাগীদার।

সত্যিই কি ভাগীদার নাকি তাকে সরাবার উদ্দেশ্যে ইনসান প্রস্তাব করেছিল যে তাকে সরালে টাকার ভাগ বাড়বে। কারণ মেরি হল প্রধান সাক্ষী। ব্যাটলপ্ল্যানটা আসলে মেরি কাপুর সরিয়েছিল।

আপাততঃ বীরেন্দ্র সোনপালকে এখনি ধরা দরকার।

জগদীশের সন্দেহ রুবিকে বীরেন খুন করেছে এবং নিশ্চয় মেরি ও ইনসানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইনসানকে খুন করবে কিনা বলা যায় না তবে মেরিকে বীরেন ছাড়বে না বলে মনে হচ্ছে।

আজ ইনসান তাকে চন্দননগরে তার দলের কার কাছে তাকে নিয়ে যাবে। সেখানে কি বীরেন্দ্রকে পাওয়া যাবে?

চন্দননগরেই জয়শংকর কাপুরের বডি পাওয়া গিয়েছিল। চন্দননগরে ওদের একটা ঘাঁটি আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এসে পড়েছে। যে বাড়িতে ইনসান থাকত সেই বাড়ির ছাদের ওপর মূর্তিগুলি দেখা যাচ্ছে।

আচ্ছা ইনসান যে এই বাড়িতে লুকিয়ে আছে সে খবরটা সে কোথায় পেল? কোথায় পেল? তার সব গোলমাল হয়ে গেছে। সে তার নোটবুকে যা নোট করেছিল সেগুলি সাজান হয়নি। আজ চন্দননগরের হাঙ্গামা আছে। সেখানকার কাজ যদি সুষ্ঠু-ভাবে শেষ হয় তাহলে কাল সকালে নোট বই দেখে ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে হবে।

আরও একটা জিনিস আর ডি তাকে বলে নি। ওদের হাতে টাকাটা কিভাবে দেওয়া হয়েছিল। জগদীশ ভেবেছিল যে আর ডি তাকে যে ফাইল দিয়েছে তার মধ্যে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাতে টাকা দেওয়ার ঘটনার কোনো উল্লেখ সে পায় নি।

বাড়িটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটু দূরে সে গাড়িখানা রাখল, একটা

গাছের নীচে। রাস্তা ফাঁকা। গাড়ির ভিড় নেই তবে সাইকেল রিক্সা কিছু কিছু যাওয়া আসা করছে।

বাড়ির গেটের সামনে সে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। দরবারা সিংকে সে আশা করছিল। গেটের সামনে নরম রাস্তায় মোটর গাড়ির চাকার দাগ লক্ষ্য করল। গেট খোলা ছিল। আর একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে গাড়িটার চাকার দাগ ঐ বাংলোর ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

গাড়ির চাকার ডবল দাগ কোথাও নেই। মানে একটা গাড়ি ভেতরে গেছে এবং সেই গাড়িটাই আবার বেরিয়ে এসেছে এরকম কোনো দাগ পাওয়া গেল না।

মনে হচ্ছে বাংলোর গ্যারাজে যে পুরনো মডেলের অ্যামেরিকান গাড়িটা ছিল সেইটেই নিয়ে কেউ বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু দরবারা সিং গেল কোথায়?

সে আশা করছিল কোথাও থেকে দরবারা এখনি ছুটে এসে তাকে খটাস করে একটা স্যালুট দেবে। তার ত কোনোই পাত্তা নেই।

জগদীশ আস্তে আস্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকল। প্রথমে গেল গ্যারাজের কাছে। গ্যারাজের দরজা খোলা। গাড়ি নেই। গাড়ি নিয়ে কেউ বেরিয়ে গেছে।

গাড়ি নিয়ে কে বেরিয়ে গেল? দরবারা নিজে?

তাহলে ত গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে যেত নিশ্চয়। নিশ্চয় অন্য কেউ। দরবারা সিং ত এমন অবহেলা করবে না। সে ফৌজীতে ছিল। তার একটা কর্তব্যজ্ঞান আছে।

গ্যারাজ থেকে সে বাংলোর দিকে যেতে আরম্ভ করল। কিন্তু একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে একটা কুকুর এক নাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে কেন? গাছটার ওপারে কতকগুলো কাকই বা কেন ননস্টপ কা কা করে চলেছে।

ওখানে কি ব্যাপার?

জগদীশ চৌধুরী সেই দিকে এগিয়ে চলল। খানিকটা এগোতেই দেখতে পেল বুটপরা একজোড়া পা, না দাঁড়িয়ে নেই, শুয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে দরবারেরই পা!

জগদীশ গাছতলায় চলে এল। আরে সর্বনাশ! এই ত দরবারা মাটিতে পড়ে রয়েছে কিন্তু ও আর কোনোদিন উঠবে না, খটাস করে স্যালুটও করবে না। তারই কৃপাণ দিয়ে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। রক্তমাখা কৃপাণ তার পাশেই পড়ে রয়েছে।

এই রকম একটা চেহারা, গায়ে নিশ্চয় জোর আছে। একে কে হত্যা করতে পারে? কোনো বাধা দিয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না?

মাথার পাগড়ি যথাস্থানেই রয়েছে। ওর কৃপাণ দিয়ে ওরই ঘাড়ে কেউ বেশ কয়েকটা কোপ মেরেছে।

বীরেন্দ্রের মতো একজন ছোকরার এমন লম্বাচওড়া বলশালী দরবারা সিংকে হত্যা করা কি সহজ? নাকি আর কেউ? দেখে ত মনে হচ্ছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দরবারাকে খুন করা হয়েছে। খুন করে হত্যাকারী পুরনো মডেলের অ্যামেরিকান গাড়িখানি নিয়ে সড়ে পড়েছে।

বাংলোর বারান্দায় উঠে দেখল দরজায় তালা দেওয়া। হত্যাকারী তাহলে সম্ভবতঃ বাংলোর ভেতরে ঢোকে নি।

এখন তার কর্তব্য কি? নিশ্চয় পুলিসে খবর দেওয়া।

এবারও পুলিশ কমিশনারকে সেই অনুরোধ। কাছের পোস্ট-অফিসে গিয়ে সে পুলিস কমিশনারকে ফোন করল?

—স্যার অ্যানাদার মার্ডার

—অ্যানাদার মার্ডার? কোথায়? আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই মার্ডার? কোথায়?

জগদীশ সমস্ত বিবরণ জানাল। পুলিস কমিশনার জানালেন

যে ওটা ক্যালকাটা পুলিসের জুরিসডিকশনের বাইরে। তবুও আমি আই জি-এর সঙ্গে কথা বলে এখনি স্কোয়াড পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আপনি লোক্যাল থানায় একটা খবর দিন

—তাহলে ত স্যার এরা আমাকে আটকে দেবে। বলবে আপনি তো মার্ডারার নন আপনি কি করে জানলেন। অথচ স্যার আজকের দিনটা আমার কাছে ভাইটাল। আমাকে এখনি চন্দননগরে যেতে হবে। সেখানে হয়ত কালপ্রিটদের ধরতে পারব।

—বডিটা ওখানে বেশিক্ষণ পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। কি করা যায় ?

—আপনি স্যার এক কাজ করুন। আমি ঐ বাংলোর কাছেই আমার গাড়িতে বসে আছি, সেখান থেকে বডিটা ওয়াচ করব

—তাতে কি হবে

—আপনি লোক্যাল থানায় ফোন করে খবরটা দিয়ে বলুন বডিটা গার্ড দেবার ব্যবস্থা করতে। আমি ওদের আসতে দেখলেই চলে যাব

—তা যাবেন কিন্তু কাজটা ঠিক রেগুলার হল না, ঠিক আছে তাই হবে। আমিই সব ব্যবস্থা করছি।

জগদীশকে ছুটো সিগারেটও শেষ করতে হল না। সে দেখল সাইকেলে করে একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর একজন এল সি মানে লিটারারি কনেস্টবল আসছে। ওদের গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকতে দেখে জগদীশ আর অপেক্ষা করল না।

নরেন্দ্রপুর থেকে জগদীশ বেহালায় ফিরবে কিন্তু তার দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। সেই সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছে, মাঝে আর কিছু খাওয়া হয় নি। এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত নয়।

তার ওপর দু দুটো খুন। আরও দু একটা হবে কি না কে

জানে ? খুনী যদি একজন লোকই হয় তাহলে সে একবার খুন করতে শুরু করলে ধরা না পড়া পর্যন্ত আর থামে না। তাকে খুনের নেশায় পেয়ে বসে। সে পর পর খুন করে এমন কি নির্দোষ লোকও বাদ যায় না। অসহায় নারীও তার শিকার হয়।

এই রকম খুনী খুবই বিপজ্জনক। অথচ জগদীশ খুনীকে অনুমান করলেও বাস্তবিক সেই লোকটাই খুনী কি না তার কোনো প্রমাণ দূরের কথা কোনো সূত্রই সে পাচ্ছে না।

জগদীশ নিজেকে খুব অসহায় মনে করতে লাগল। তবুও দমে গেলে চলবে না। আজ চন্দননগরে যেয়ে যদি কোনো ফয়সালা না হয় তাহলে ইনসান ও মেরি কাপুরের ওপর খুব চাপ দিতে হবে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় তাহলে ওদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। আর সেই সঙ্গে খোঁজ করতে হবে রণবীর হুগলের।

নরেন্দ্রপুর থেকে বেহালা যাবার রাস্তা সে চেনে না। বেহালা যাবার যে রাস্তা সে চেনে সে হল তার হোটেল থেকে।

জগদীশ তার হোটেলে ফিরল না কিন্তু হোটেলের কাছে এসে ভাল একটা রেস্তরাঁ দেখতে পেল। সেইখানে সে কিছু খেয়ে নিল।

এখান থেকে বেহালা যাবার রাস্তা সে চিনতে পারবে। ময়দান পার হয়ে জগদীশ ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরল। যাবার সময় গাড়িতে পেট্রল ভর্তি করে নিল। চন্দননগর যেতে হবে, ফিরতে হবে।

বেহালার বাড়িতে যখন পৌঁছল তখন বাড়িখানা খুবই শান্ত মনে হল। ভেতরে কোনো লোক আছে বলে মনেই হল না। একটা যেন থমথমে ভাব। তার উচিত ছিল পথে কোথাও থেকে তানবীরকে একবার ফোন করে খবর নেওয়া। সব ঠিক আছে ত ? নাকি ওদেরও আবার কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেল ?

গাড়ি ভেতরে ঢোকালো। একটা ঝোপের আড়ালে সাদা

পোশাকে সিকিউরিটির একজন লোক বসে ছিল। রাস্তা থেকে তাকে দেখা যায় নি। তাকে দেখে জগদীশের দুশ্চিন্তা দূর হল। তাহলে মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে।

গাড়িখানা সে এমন জায়গায় রাখল যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তানবীর কোথা থেকে বেরিয়ে এল।

—এভরিথিং ও কে ?

—ও কে, তানবীর জানাল

—সময় হয়ে গেছে। এবার আমাদের স্টার্ট করতে হবে। তুমি সব ঠিক করে রেখেছ ত তানবীর?

—সব ঠিক আছে। তানবীর উত্তর দিল

—ইনসান কি করছে ?

—একটু আগে দেখে এসেছি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ত বই পড়ছিল

—আর মিসেস কাপুর ?

—তিনি মাঝে মাঝে কি লিখছেন। মাঝে মাঝে ঘরে পায়চারি করছেন, কিংবা হয়ত শুচ্ছেন, তিনি বোধহয় কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন

—তাই নাকি ?

—তাহলে চলত তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করে আসি। তুমি ততক্ষণে ইনসানকে বলে এস আমরা এখুনি বেরোব। সে যেন রেডি হয়। আর তুমি তোমার রিভলভার নেবে। একটা টর্চ নেবে, কিছু দড়ি আর একটা ছুরিও কাছে রাখ। আমি মিসেস কাপুরের সঙ্গে দেখা করে আসি

মেরি কাপুর তখন ঘরে পায়চারি করছিল। জগদীশকে দেখে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল

—আমাকে আর কতক্ষণ আটকে রাখবে জগদীশ ?

—আশা করছি আজ রাত্রেই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র ধৈর্য ধরে থাকুন

—তা ত রয়েছি কিন্তু ছেলেটার জন্যে খুব মন খারাপ হয়েছে

—সে ত রামগড়ে গেছে ভালই আছে নিশ্চয়

—তা হয়ত আছে কিন্তু কি জান জগদীশ মায়ের মন ত, আমার এখন চারদিকেই বিপদ চলেছে, সেই জন্যে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে আছি। সব কিছুতে সন্দেহ হচ্ছে

—সেটা আপনি ঠিক বলেছেন মিসেস কাপুর কিন্তু আমাদেরও ত উপায় নেই। কাল সকালেই আমি নিজে আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেব।

—অতটা তোমাকে করতে হবে না। আমি বাড়ি ফিরে টেলিফোনে ব্যারি ফিরল কি না তার খোঁজ নিতে পারব। তারপর হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বললে তিনিই বিকেলে ওকে এসকর্ট দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ব্যারি যদি ফিরে থাকে

—তাহলে ত বেশ ভালই হয়। আপনি আর কয়েক ঘণ্টা ওয়েট করুন

—অগত্যা তাই করতে হবে

—তাহলে এখন আমি চলি। আপনি এটুকু সময় খুব সাবধানে থাকবেন। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ পর্যন্ত বাড়াবেন না। আচ্ছা গুডবাই

খানিকটা আত্মসমর্পণের মতো ভাব নিয়ে মেরি কাপুর বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার মুখে তখন জল টল টল করছে।

জগদীশ আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

তানবীর তার দিকেই আসছিল। বলল:

—ইনসান তোমাকে ডাকছে

—চল শুনে আসি

ইনসানের ঘরে এসে দেখল সে বাইরে যাবার জন্যে রেডি। বেশ খুশি খুশি ভাব। শিস দিচ্ছিল

—কি খবর মিঃ ইনসান ওমর

—এখনই বেরোচ্ছ ত ?

—নিশ্চয়। আমরাও রেডি

—সঙ্গে একটা বড় সুটেকেস কিংবা একটা স্যাক নিও

—বড় সুটকেস ? স্যাক ?

—কেন ?

—বাঃ টাকার ভাগ নেবে না ?

—ও, তাই বল ঠিক আছে তাই নেব কিন্তু শোনো মিঃ ইনসান

—আবার কি শুনব

—তোমাকে এখান থেকে যে গাড়িতে তোলবার ব্যবস্থা করব তার আগে তোমার চোখ বেঁধে দেব। সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডে যেয়ে চোখ খুলে দেব। কিন্তু ইউ প্রমিস যে গাড়িতে তুমি কথা বলতে পার কিন্তু চিৎকার করতে পারবে না

—আই প্রমিস

—তোমাকে প্রমিস করতেই হবে কারণ পিছনের সিটে আমার পার্টনার এই ছোকরা বসে থাকবে। তার হাতে থাকবে রিভলভার, সেই রিভলভারের নল ঠেকানো থাকবে তোমার গায়ে এবং জেনে রাখ যে সেই রিভলভারটিতে সাইলেনসার লাগানো আছে। চিৎকার করেছ কি মরেছ। পরে আমাদের যা হয় হবে তুমি ত মরবে, এইসব বুঝে গাড়িতে মুখ বুজে বসে থাকবে। মুখ খুলেছ কি মরেছ তাহলে মুখ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে

—তোমাদের কোনো ভয় নেই। আজ টাকা ভাগ হয়ে গেলে ওদের সঙ্গেও আমার সব সম্পর্ক শেষ। আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। আচ্ছা মিসেস কাপুরের খবরটা তাহলে সত্যি ?

—মিথ্যা হবার কোনো কারণ ঘটেছে নাকি ?

—সে আমরা কি করে জানব ? তবে জেনে রাখ পুলিস এখন নিশ্চিত যে ঐ বডি মিসেস কাপুরের এবং এটা সুইসাইড নয়। অবশ্য মিসেস কাপুর আগে কয়েকবার সুইসাইড করবার চেষ্টা করেছিল তবে এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। আগে খুন করে মুখের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বডিটাকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে ওরা রেললাইনে ফেলে দিয়েছিল

—কাজটা কি তোমরাই করলে নাকি টাকার লোভে ?

—যদি করে থাকি তোমাকে বলতে যাব কেন ?

—তা নয়। শুধু কৌতূহল মাত্র

—আর দেরি নয়, লেট আস স্টার্ট তাহলে ইনসান যা বললাম মনে রেখ।

তানবীরের দিকে চেয়ে বলল ; নাও চোখটা বন্ধ করে দাও, দিয়েছ ? বেশ এবার চল।

বাড়িখানা একেবারে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার দিকে ঘাটও আছে। তবে বাড়িখানা খুবই পুরনো এবং পরিত্যক্ত। ভূতের বাড়ি বলেও একটা দুর্নাম আছে।

দিনের বেলায় কয়েকটা ডানপিটে ছেলেমেয়ে বাড়িটার বাগানে ঢুকলেও সন্ধ্যার পর কেউ এদিকে আসে না।

বাড়িটা দোতলা। বাড়িখানা নাকি কোনো এক ফরাসী সাহেবের ছিল। সাহেব নাকি ঐ বাড়িতে তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছিল। তারপর নিজেও নাকি আত্মহত্যা করেছিল।

মাঝে মাঝে আজও নাকি রাত্রে সেই ফরাসি দম্পতির বিবাদ, মাঝে মাঝে নাকি ফরাসি বিবির আর্তনাদও শোনা যায়।

সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তা দিয়ে কেউ নাকি হাঁটে না। বাড়িটা ঘিরে

চারদিকে বড় বড় বিলিতি গাছ। সন্ধ্যার আগেই বাড়ির ভেতরটা বেশ অন্ধকার হয়ে যায়।

—এই সেই হণ্টেড হাউস। ইনসান বলল। হাওড়া ব্রিজেই তার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিল। সে কোনো গোলমাল করে নি। সারা রাস্তা গল্প করতে করতে এসেছে। বলল

—হ্যাঁ, ভেতরে ঢোকো, চল চল, গাড়িবারান্দা আছে, তার ভেতরে গাড়ি রাখবে। বাইরে থেকে কাক-পক্ষীও টের পাবে না।

গাড়ি থেকে নামবার সময় ইনসান বলল :

—আমি ত আমার কথা রেখেছি কিন্তু তোমাদের পিছনে পিছনে পুলিস আসেনি ত ?

—পুলিস কি করে আসবে !

—তোমরাই যদি খবর দিয়ে থাক ?

—আমরা খবর দেব ? তুমি পাগলের মত কি সব বলছ ? আমরা পুলিস থেকে শতহস্তে দূরে থাকি আর আমরা কিনা পুলিসে খবর দেব ? পাগল নাকি ?

গাড়ি থেকে নেমে ওরা তিনজনে বাড়ির দরজার দিকে চলল। দরজা খোলা ছিল। বিরাট দরজা। বহুকাল রং পড়ে নি। আসল রং কি ছিল বলা খুবই শক্ত। জায়গায় জায়গায় উই লেগেছে। মেঝেতে ধুলো। বাড়ির ভেতরটা ঢুকেই বেশ ঠাণ্ডা মনে হল, সেই সঙ্গে নাকে ঢুকল স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ, মাথার ওপর দিয়ে দু'চারটে চামচিকিও উড়তে লাগল। জগদীশ টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভেতরে কার্নিসে পায়রা বক বকম করে উঠল।

ইনসানকেও একটা ছোট টর্চ দেওয়া হল। সে টর্চ জ্বেলে বলল :

তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর আমি ওদের ডেকে আনি

—তারা কি কেউ এসেছে ? কিছুত বুঝতে পারছি না। বাইরে ত কোনো গাড়ি দেখতে পেলাম না।

—ওরা প্রাইভেট গাড়ি করে আসে নি, তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি

ইনসান তার ছোট টর্চ জ্বেলে বড় ঘরটা পার হয়ে ভেতরে কোথায় চলে গেল।

তানবীর বলল, ফাঁদ নয়ত?

—না, আমার তা মনে হয় না। তবে টর্চ সরিয়ে নাও, তুমি ঐখানটা মানে যে দরজা দিয়ে ইনসান ভেতরে গেল ওর একধারে দাঁড়াও

—আর তুমি?

—আমি অপর ধারে দাঁড়াচ্ছি

—রিভলভার রেডি রাখি?

—নিশ্চয়, বলে জগদীশ তার স্পেশাল রিভলভার রেডি রাখল। তানবীরও।

ওরা হঠাৎ আক্রান্ত হতে চায় না।

ইনসানের জুতোর আওয়াজ কিছুক্ষণ শোনা গিয়েছিল, তারপর কোনো শব্দ নেই।

এরা দুজন দরজার দু'পাশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল অনেক দূরে দুজন লোক যেন খুব আস্তে চাপা গলায় কথা বলছে। মনে হল এইমাত্র আর কিছু নয়।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। কাছেই গঙ্গায় মাঝি মাল্লাদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। বাইরে কি ঝড় উঠল নাকি? হতে পারে। ওরা আসবার সময় আকাশে মেঘ জমতে দেখছিল। হ্যাঁ, ঝড়ই উঠল। বৃষ্টিও পড়ছে বোধহয়!

ইনসান গেল কোথায়? কোনো সাড়া শব্দও ত নেই? পালাল নাকি? আর দু'মিনিট অপেক্ষা করা যাক।

জগদীশ তার রেডিয়ম ডায়ালের ঘড়ি দেখল। দু'মিনিটের জায়গায় তিন মিনিট হয়ে গেল।

তাহলে কি ইনসানের দলের লোক আসে নি? ওরা কি জানতে পেরেছে যে ওদের পাঁচলাখ টাকার জাল নোট দেওয়া হয়েছে? ওর নিজের অবশ্য আড়াই লাখ টাকার জাল নোটের দরকার নেই। ও এসেছে অপরাধীকে ধরতে।

অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করা যায় না।

—তানবীর চল আমরা ভেতরে যাই।

—ঠিক আছে, তাই চল

দু'জনেই বাঁ হাতে টর্চ জ্বালল, ডান হাতে রিভলভার। ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখল ডান দিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ি।

ইনসান কি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছিল? সে রকম ত কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় নি?

—তানবীর আমরা কি আগে ওপরটা দেখে আসব?

—কেন? ওপরে আগে যেতে চাইছ কেন?

—ওপরে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে?

—সে ত নীচেও থাকতে পারে? আমরা ওপরে উঠলে নীচের লোক যদি পালিয়ে যায়?

—ঠিক বলেছ

—ইনসানকে নাম ধরে ডাকা যাবে না কেন?

খুব জোরে না হলেও নেহাত আস্তেও নয়, জগদীশ ডাকতে লাগল

ইনসান ইনসান কোথায় গেলে তুমি?

কোনো সাড়া নেই। প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

—তাহলে এক কাজ করি, জগদীশ বলল

—কি কাজ? তানবীরের প্রশ্ন

—তুমি নীচে অন্ধকারে ঐ কোনটায় দাঁড়িয়ে থাক, আমি ওপরটা দেখে আসি

--তার চেয়ে তুমিই নীচে দাঁড়িয়ে থাক আমি ওপরটা দেখে আসি।

এ প্রস্তাব ভাল। ঠিক আছে তানবীর আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি ওপরটা দেখে এস

জগদীশ সেই কোনে দাঁড়িয়ে রইল। তানবীর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ফাঁকা বাড়িতে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আওয়াজ বেশ জোরেই হতে লাগল। কিছু পরে সে আওয়াজ থেমে গেল।

ওপরের মেঝে দিয়ে তানবীরের হাঁটার আওয়াজও শোনা গেল। কিন্তু দুপা হাঁটার পরই আওয়াজ বন্ধ হল কেন? আলোও ত নিবিয়ে দিয়েছে? কি হল?

জগদীশ নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করতেও পারছে না। তাতে যদি আবার হিতে বিপরীত হয়।

প্রায়, দু'মিনিট পরে আবার হাঁটার আওয়াজ পাওয়া গেল। টর্চও জ্বলল।

ওপরের ঘরে তানবীর হাঁটছে জগদীশ তার স্পষ্ট আওয়াজ পাচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে তানবীর একটা দরজা খুলল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, সে সব আওয়াজও পাওয়া গেল।

তানবীর পর পর আরও কয়েকটা দরজা খুলল, দু একটা জানালাও খুলল বোধহয়। সবশুদ্ধ সাত আট মিনিট। তারপর ও নেমে এল।

জগদীশ টর্চ জেলে ওর মুখ দেখল। তানবীর যেন উত্তেজিত।

—কি তানবীর? ওপরে কিছু নেই ত?

—মানুষ নেই ঠিকই কিন্তু আমি প্রথম যে ঘরটাতে ঢুকলাম সেই ঘরটার মেঝেতে পুরু ধুলোর ওপর শুকনো রক্ত। সিঁড়ি পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তা ছাড়া ঘরটার মেঝেতে ধুলোয় বেশ কিছু পায়ের মানে জুতোর ছাপও আছে

—বল কি তানবীর ?

—হ্যাঁ, ঐ ঘরে নিশ্চয় কয়েক দিনের মধ্যেই খুন হয়েছে

—তাহলে জয়শংকর কাপুরকে ঐ ঘরে খুন করে গঙ্গার ধারে বডি ফেলে দিয়েছিল

—নিশ্চয় তাই হবে

—ঠিক আছে, ওপরে পরে যাব, চল এখন ইনসানের খোঁজ করি।

দুজনেই টর্চ জ্বালল। সামনের দরজার সবটাই প্রায় উই খেয়ে ফেলেছে। উই মাটিও জমে গেছে। পাশের দরজাটা ভাল, বেশি জীর্ণ নয়। অর্ধেক খোলা।

দরজা খুলে দুজনে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বেশ বড় একটা ঘর। ঘর পার হয়ে ওরা এল একটা বারান্দায়। বারান্দায় বড় বড় জানালা। তারপরই বাগান।

বারান্দার একদিকে বাইরে যাবার দরজা। বারান্দার অপরদিক বন্ধ। তাহলে ইনসান কি ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে ঐ দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল নাকি ?

—চল ত তানবীর বাইরে গিয়ে দেখি আমার মনে হচ্ছে আমাদের বোকা বানিয়ে ইনসান সরে পড়েছে

—আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে

—তাহলে চল দেখা যাক

দুজনের হাতেই টর্চ জ্বলছে। দরজাটা বন্ধ ছিল। ভেতরের দিকের কড়া ধরে জগদীশ টানল। দরজা খুলল না। বাইরে থেকে বন্ধ।

—ইনসান পালাবার সময় দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে বোধ হয়

—তাহলে চল বাড়িটা বাইরে থেকে ঘুরে গিয়ে দেখি

—বেশ তাই চল। বাগানেই যাই

বৃষ্টির প্রকোপ তখন বেশ কমে গেছে। তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার জোর বেশ আছে।

বাড়ির বাইরে এসে দেখল গাড়িখানা ঠিক আছে। গাড়ি লককরা ছিল না। জগদীশ তানবীরকে গাড়িটা লক করে দিতে বলল। তানবীর তার ত্রুটি স্বীকার করল। গাড়ি থেকে নেমেই এদের গাড়ি লক করা উচিত ছিল। যে কেউ গাড়ি নিয়ে পালাতে পারত। ইনসান নিজেই ত পারত।

জগদীশ গাড়ি লক করতে বলল এবং তানবীরও ভাবল লক করে দি কিন্তু সেই মুহূর্তে তানবীর হোঁচট করে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল, পড়তে পড়তে বেঁচে গেল কিন্তু গাড়ি লক করতে ভুলে গেল। লক করলে ভাল করত।

বাইরে এসে জগদীশ বলল—তানবীর সাবধানে চল, লক্ষ্য রাখবে কারও পায়ের ছাপ দেখতে পাও কি না।

দুপুরে হয়ত গোরু ছাগল চরতে আসে কিংবা স্থানীয় লোকেরা তাদের গৃহপালিত পশুদের খাওয়াবার জন্যে বাগান থেকে ঘাস বা আগাছা কেটে নিয়ে যায়। আজেবাজে অনেক গাছ জন্মালেও ঘাস মোটেই বড় হতে পারে না।

ওরা দুজনে সাবধানে টর্চ ফেলে এগোতে লাগল। ওরা বাড়ির পিছনে এল। জগদীশ লম্বা করে টর্চ ফেলল।

দূরে কি যেন একটা মাটিতে পড়ে রয়েছে?

তানবীরও সেটা লক্ষ্য করেছে। কাছে এগিয়ে এসে দেখল বৃষ্টিতে ভিজলেও ইনসানের দেহ তখনও গরম রয়েছে কিন্তু দেহে প্রাণ নেই, শরীরে কোথাও বুলেটের চিহ্ন বা রক্ত নেই।

যে দড়ি দিয়ে ফাঁস দিয়েছে সে দড়িটা তখনও ইনসানের গলায় আটকে রয়েছে। মাটিতে ধ্বস্তাধ্বস্তির বিশেষ চিহ্ন নেই। ইনসান দরজা খুলে বাইরে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় তার গলায় ফাঁস দেওয়া হয়েছে।

আসামী কি তাদের ছুজনকে মারবার জন্যে গাছের আড়ালে কোথাও পিস্তল হাতে নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে ?

জগদীশ নিজের টর্চটা নিবিয়ে দিয়েই তানবীরেরটা নিবিয়ে দিতে বলল। একটু সরে ছুজনে বসে পড়ল। ছুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

ঝড় বৃষ্টির ফলে গঙ্গার জল আলোড়িত হচ্ছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে গাছের আন্দোলিত শাখার শব্দ।

অন্ধকার ঘোর নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে গেল। কোনো লোক কোথাও লুকিয়ে আছে বলে মনে হল না।

—ইনসানকে যে মেরেছে সে বোধ হয় নৌকো করে পালিয়ে গেছে, তানবীর ফিস ফিস করে বলল

—খুবই সম্ভব, লোকটা বোধ হয় ইনসানকে বলেছিল যে সে পিছনের দরজায় তার জন্যে অপেক্ষা করবে। এদিকে নিজের পালাবার পথ ঠিক করে রেখেছিল, ইনসান আসার সঙ্গে সঙ্গেই গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে

—একদিনে তিন তিনটে খুন !

—তানবীর তুমি এই দিকে আর আমি এই দিকে হঠাৎ টর্চ জ্বেলে খানিকটা ঘুরিয়ে দেখি, আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকলে সে হয়ত বাইরে বেরিয়ে এসে থাকতেও পারে

ছুজন ছুদিকে টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগল। কোনো লোক ওদের চোখে পড়ল না

—তাহলে ওঠো তানবীর, চল ঘাট পর্যন্ত দেখে আসি।

ঘাটে নামবার সিঁড়ির আগে ঘাস বেশ পাতলা। সেইখানে দেখা গেল কয়েকটা পায়ের ছাপ, জুতোর ছাপ নয়, বেশ স্পষ্ট কিন্তু একজন লোকের নয়, ছু-তিনজনের।

—তানবীর আমাদের অনুমান ঠিক। লোকটা ইনসানকে খুন করে গঙ্গা দিয়ে নৌকো করেই পালিয়েছে মনে হচ্ছে।

পঞ্চাশ ষাট গজের মধ্যে কোনো নৌকো নেই। এই বাগানবাড়ির ঘাটে একটা নৌকোই বাঁধা ছিল মনে হয়। সেই নৌকো করেই আসামী পালিয়েছে। ঐ পায়ের ছাপ কি আসামীদের ?

—এখন কি করবে

—কি আর করব, ফিরে যাব

—কিন্তু ইনসানের লাস ? তানবীর জিজ্ঞাসা করে

—এখানকার থানায় খবর দেব এছাড়া আর কি করতে পারি। তাছাড়া থানায় খবর দেওয়া আমাদের কর্তব্য

—তা ত বুঝলাম কিন্তু থানায় খবর দিলেই ত দেরি হবে

—যাতে না দেরি হয় ব্যবস্থা আমি করব, জগদীশ বলে

—কি আর ব্যবস্থা করবে, কিছুটা নিরাশ হয়েই তানবীর উত্তর দিল

—কলকাতা ছেড়ে আসবার আগেই আমি কলকাতার পুলিস কমিশনারের চিঠি ত এনেছিই তাছাড়া এখানকার থানার ও সি-এর কাছে পুলিস কমিশনারকে দিয়ে ফোন করিয়ে রেখেছি, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না

—বেশ তবে তাই করা যাক কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা যে ওখানে লাস ফেলে রেখে চলে যাব আর ইতিমধ্যে যদি কেউ লাস সরিয়ে ফেলে, সন্দিগ্ধ তানবীর প্রশ্ন করে

—সে একটা কথা বটে

—তাহলে একটা কাজ করা যাক, তুমি একটু আড়ালে থেকে পাহারা দাও, আমি কাছেপিঠে কোথাও থেকে থানায় ফোন করে আসি, পুলিশ এলে তাদের সব এক্সপ্লেন করে আমরা চলে যাব এখন।

তানবীর নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে একা থাকতে রাজি হল।

জগদীশ থানায় ফোন করে এসে প্রথমেই লক্ষ্য করল তার গাড়ি নেই।

তানবীর কোথাও গেল নাকি ?

টর্চ জ্বেলে সে বাড়ির পিছন দিকে গেল। চারদিকে আলো ফেলে দেখল তানবীর নেই, ইনসানের লাসও নেই, তার গাড়ি ত নেইই। তখন সেই হোঁচট খেয়ে তানবীর নিশ্চয় গাড়ি লক করতে ভুলে গেছে। আমিও ভুলে গেছি, জগদীশ ভাবল।

জগদীশ দেখল এখানে এই নির্জনে একা দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তার সব কাজ পণ্ড হয়ে গেল। খুব সম্ভব ওরা টের পেয়ে গেছে যে সব নোট জাল অতএব টাকা ভাগাভাগির আর প্রশ্ন ওঠেই না।

শত্রুপক্ষ প্রবল। বীরেন্দ্র সোনপাল নিঃসন্দেহে একজন সাসপেক্ট কিন্তু সে একা নেই। তার পিছনে অনেক লোক আছে। অনেক লোক বললে সব বলা হয় না। পিছনে আছে আমেরিকার সি আই এ, পৃথিবীজোড়া বিরাট চক্র আর সেই চক্রের পিছনে হিমালয় প্রমাণ মার্কিন ডলার।

রাস্তায় এসে গেটের মুখে টর্চ জ্বেলে জগদীশ টায়ারের দাগ লক্ষ্য করতে লাগল। একজোড়া দাগই সে দেখতে পেল। সে দাগ হল যখন তারা গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল তখনকার। তাহলে গাড়ি বেরোল কোন দিক দিয়ে ?

হয় তাকে ধোঁকা দেবার জন্যে তানবীর সমেত গাড়ি বাগানের ভেতরে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়োছ আর নয়ত বেরোবার অন্য কোনো রাস্তা আছে।

পুলিস আসুক তখন অন্ততঃ বাগানটা সার্চ করে দেখা যাবে। গাড়ি যাক আবার গাড়ি হবে কিন্তু তানবীরকে মেরে ফেললে ত তাকে আর বাঁচানো যাবে না।

জগদীশকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। চন্দননগর থানার ও সি স্বয়ং একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও সাদা পোশাকে তুজন কনস্টেবল এসে হাজির।

গাড়ি থেকে ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ নিজের পরিচয় দিয়ে পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীক চিহ্ন দেখাল। চন্দননগর থানার ও সি-ও তাঁর নাম বললেন আর কে দাস।

কাহিনী শুনে ও সি বললেন :

—আমি চুঁচূড়ায় পুলিস স্টেশনে ফোন করেছি। আমি আজই রাত্রে সমস্ত বাড়িটা সার্চ করতে চাই, কাল হয়ত আরও দেরি হয়ে যেতে পারে

—কিন্তু আপনি কি সার্চ করবেন মিঃ দাস? আমি আপনাকে ফোন করে ফিরে এসে দেখি লাস নেই, আমার লোক তানবীর নেই এমনকি আমার গাড়িটাও নেই অথচ দেখুন মিঃ দাস আমার গাড়ি বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার ও টায়ার ট্র্যাকও নেই, আমার সন্দেহ হচ্ছে যে গাড়ি এবং লোকজন এই বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে

—তাহলে ত মিঃ চৌধুরী আজ রাত্রেই আমাদের সার্চ করা দরকার।

—আমিও অবশ্য তাই মনে করি তবে চুঁচুড়া থেকে আপনার রি-ইনফোর্সমেণ্ট আসবার আগে অন্ততঃ এইটুকু খুঁজে দেখা দরকার যে এই বাগানবাড়ি থেকে পালাবার আর রাস্তা আছে কি না। জগদীশ বলল

—বেশ আমি রাজি আছি, আর কে দাস সায় দিল।

ওরা সার্চ আরম্ভ করল। বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে মাটিতে টায়ারের দাগ অনুসরণ করতে অসুবিধে হল না।

জগদীশ তার গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করতে করতে এসে একটা বড় রেন ট্রি-এর তলায় এসে থেমে গেল। ওর

গাড়ির চাকার দাগ হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তারপর চাকার আর কোনো দাগ নেই, কোনো দিকেই নয়। না আগে না পিছন দিকে। গাড়ি ঘোরানোও হয় নি।

আর কে দাস ত অবাক। গাড়ি গেল কোথায়?

জগদীশ কিন্তু লক্ষ্য করল। তার গাড়ির চাকার দাগ যেখানে শেষ হয়েছে তার কয়েক ফুট দূরে ভারি লরির চাকার দাগ।

—অবাক হয়ে চেয়ে দেখছেন কি মিঃ দাস? বুঝতে পারলেন না?

—না, মিঃ চৌধুরী আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মোটরগাড়ির চাকা কি করে লরির চাকা হয়ে গেল এবং মাঝখানে খানিকটা দাগ গেল কোথায়?

—বুঝতে পারলেন না?

—না, সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।

—তাহলে শুনুন, ওরা একটা লরি জাতীয় গাড়ি এনেছিল। আমার বিশ্বাস যে সেই লরির পিছন দিকে একটা হেঁলান কাঠের পাটা দিয়ে গাড়িটা লরিতে তুলে নিয়েছে। গাড়িতে ছিল ইনসানের লাস আর তানবীর। ওরা সবশুদ্ধ নিয়ে কেটে পড়েছে

—কিন্তু একটা লরিতে গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে গেলে নিশ্চয় পথচারীদের চোখে পড়বে, চলুন আমরা টায়ার ট্র্যাক ফলো করি

—তাহলে হয়ত ওরা খোলা লরি আনে নি। চারদিক ঢাকা দেওয়া বিরাট একটা ভ্যান এনেছিল। যার মধ্যে একটা মটর বেশ ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু মিঃ দাস টায়ার ট্র্যাক ফলো করা যাবে না। কারণ রাস্তাগুলি পিচের মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছে, আর রাস্তা দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক গাড়িও গেছে

—সেটা ঠিক তবে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে আপনার অনুমান মতো কোনো লরি বা ওয়াগন কেউ দেখেছে কি না।

—নিশ্চয়। সেটুকু ভার আপনার ওপর দিয়ে আমি আজ কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। আপনার রি-ইনকোর্সমেণ্ট এলে আপনি ভাল করে সার্চ করুন তবে দোতলায় একটা ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ আছে। সেই শুকনো রক্ত আমার চাই, আমার বিশ্বাস সে রক্ত মিঃ জয়শংকর কাপুরের। তাকে এই বাড়িতে খুন করে বডি গঙ্গার ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল

—তাহলে আপনি বলতে চান কেসটা সুইসাইড নয় ?

—মোটেই না। এই সমস্ত ঘটনার ব্যাকগ্রাউণ্ডে বিরাট একটা চক্রান্ত আছে। কাল সকালে আমি আসছি তখন আপনাকে আমি সব বলব

—ক্যালকাটার পুলিস কমিশনার আমাকে হিণ্টস দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন এটা ইণ্টারন্যাশ্যানাল কেস, আমি যেন স্পেশাল অ্যাটেনশন দি

—তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনি একটা কাজ করবেন মিঃ দাস ?

—কি কাজ ?

—আমার মনে হচ্ছে এই পুরনো বাড়িটায় কোথাও কোনো একটা গোপন অংশ আছে যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না, সেখানে ওদের আড্ডা আছে। আপনি খুঁজে দেখুন আমি এখন চলি

—যাবেন কিসে ? এখানে তো সাইকেল রিকশাও পাবেন না। আমার ড্রাইভার আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুক

—তাইত আমার ত এতক্ষণ খেয়াল হয়নি

জগদীশের তখন দুশ্চিন্তা মেরি কাপুরের জন্যে। ওরা ত সবাইকেই কব্জা করেছে। বাকি আছে শুধু মেরি। ওরা যদি মেরিকে একবার পায় তাহলে আর ছাড়বে না। কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করে নি যে রেল অ্যাকসিডেণ্টে মেরির মৃত্যু হয়েছে ?

আমেরিকার ওয়াশিংটন শহর।

সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির হেডকোয়ার্টার।

ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেন্টের একজন মহিলা রিসার্চার নাম জেন ওয়েলস কয়েকটি নাম পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা ঠিক নয়। উপযুক্ত একটা নাম খুঁজছিলেন।

একটা নাম পাওয়া গেল। নামটা অর্থাৎ লোকটিকে তাঁর বেশ মনঃপুত হল। নামটি হল মনসুর আলি সিদ্দিক। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দেশ বিভাগের পর চলে গিয়েছিল রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পরে আজাদ কাশ্মীরে। মুজঃফরাবাদে বড় পোস্টে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র এই সিদ্দিক, ইংরিজি, উর্দু, হিন্দি আর ফরাসি উত্তমরূপে জানে। নামকরা ক্রিকেটার। ডিবেটিং-এ ওর জুড়ি মেলা ভার। চৌকস ছেলে।

মুজঃফরবাদে এখন নিজের চাকরী ছাড়া আজাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের পত্র পত্রিকায়, প্রবন্ধ লেখে। বিশ্ব-রাজনীতিতে আমেরিকার নীতিই যে ঠিক সেই বিষয়ে সে প্রবন্ধ লেখে। সেই সব প্রবন্ধ ছাপাবার দায়িত্ব সিদ্দিকের। সেই সকল প্রবন্ধ বাবদ যে সম্মান দক্ষিণা আসে তাও সিদ্দিকের প্রাপ্য।

তার আর একটা উপরি লাভ আছে। সেই সকল প্রবন্ধের একটি তালিকা ও সংশ্লিষ্ট পত্রিকা চলে যায় পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাসে। সেখান থেকে আবার আসে মোটা টাকা, নগদে।

আমেরিকা, হাওয়াই, ফিলিপিন, জাপান, ইজরাইল ইত্যাদি যে সব দেশে মার্কিন প্রভাব আছে সেইসব দেশ মার্কিন সরকারের আতিথ্যে সিদ্দিক কয়েকবার ঘুরে এসেছে। ভারতেও সে প্রায়ই আসে।

সিদ্দিক যখন ভারতে আসে তখন তার নাম মনসুর আলী, সিদ্দিক নয়। পাকিস্তানের নাগরিকও নয়। সে আসে ইরানের

নাগরিক রূপে এবং তার নাম হয় তখন সৈয়দ মনসুর আলী। পাকিস্তানের নাগরিক কিভাবে ইরানের নাগরিক হয়ে যায় সে রহস্য সেই জানে।

ওয়াশিংটনের দূতাবাসে সিদ্দিকের একটি পৃথক ফাইল আছে। সিদ্দিক সম্বন্ধে সব কিছু তথ্য সেই ফাইলে পাওয়া যাবে। এই বিশেষ লোকটি সম্বন্ধে জেন ওয়েলসের আগ্রহের কারণ কি?

সি আই এ চাইছিল আজাদ কাশ্মীর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একজন এজেণ্ট কলকাতায় রাখতে, যে উভয় কাশ্মীরেরই সব খবর রাখে। তাকে কি করতে হবে সে সব নির্দেশ তাকে পরে দেওয়া হবে, কিন্তু আপাততঃ এমন একটি লোক চাই, যে কলকাতার উচ্চ সমাজে মেলামেশা করতে পারে। স্থানীয় লোকদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে। এই রকম একটি চৌকস লোক খুঁজে বার করার ভার দেওয়া হয়েছিল জেন ওয়েলসের ওপর।

কয়েকজনের ভেতর থেকে জেন ওয়েলস সিদ্দিকের নাম নির্বাচন করল। সেই নাম গেল নীচের হলে, সেখানে দু নম্বর কিউবিকিলে বসে ছিল রজার্স। রজার্স একজন অ্যানালিস্ট। তার কাজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্দিককে বিচার করা।

রজার যা চাইছিল তা পেয়ে গেল। সিদ্দিককে সে ব্যক্তিগত-ভাবে চেনে। গতবার যখন সিদ্দিক আমেরিকায় এসেছিল তখন তার সঙ্গে রজার্সের কয়েকবার দেখা হয়েছিল।

সিদ্দিক সম্বন্ধে তথ্য সম্বলিত একটি মেমোরাণ্ডাম রজার্স পাঠাল ইণ্ডিয়া ডিপার্টমেণ্টের চিফের কাছে। বাকি কাজ চিফ ঠিক করবেন অর্থাৎ সিদ্দিকের সমস্ত কার্যসূচী তিনিই ঠিক করে দেবেন।

তখনও মনসুর আলী সিদ্দিক জানে না যে সুদূর ওয়াশিংটনে তার ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। সিদ্দিক তখনও মুজঃফরাবাদে।

একদিন সন্ধ্যায় সিদ্দিক যখন ক্লাবে যাবার উপক্রম করছে সেই সময় একজন দীর্ঘদেহী পেশীবহুল মার্কিন ভদ্রলোক এসে হাজির।

সে বলল তার নাম ডনোভান। সে থাকে পাকিস্তানে অ্যাবোটাবাদে। সেখান থেকেই সে সোজা নিজের গাড়ি চালিয়ে আসছে। সার্কিট হাউসে গাড়িখানা তুলে পোশাক পালটে সে সোজা মিঃ সিদ্দিকের বাংলোয় চলে আসছে, জরুরী কথা আছে।

ডনোভান একজন সি আই এ এজেন্ট। রাওয়ালপিণ্ডি, মুরি ও অ্যাবোটাবাদের মধ্যে তাকে ঘোরাঘুরি করতে হয়। ওয়াশিংটন থেকে তার ওপর নির্দেশ এসেছে সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করে কিছু বলবার। সি আই এর প্রস্তাবে সিদ্দিক রাজি থাকলে ডনোভান তা ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেবে। ওয়াশিংটন তখন চূড়ান্তভাবে তাদের সম্মতি জানিয়ে দেবে।

—কি প্রস্তাব? সিদ্দিক প্রশ্ন করে

ডনোভান সংক্ষেপে প্রস্তাব জানাল। সিদ্দিককে কলকাতায় সি আই এ এজেন্ট হয়ে কাজ করতে হবে। কলকাতায় ন্যাশনাল আরকাইভস ও ডকুমেন্টসের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। আজাদ কাশ্মীর বরাবর কয়েকটি সেকটরের ভবিষ্যৎ ব্যাটল প্ল্যানের মাইক্রো-ফিল্ম এই আরকাইভসে রক্ষিত আছে। সেই ব্যাটলপ্ল্যানগুলি একে একে সরাতে হবে। এই জন্যে যা কিছু করা দরকার সিদ্দিককে

—আমি রাজি কি না কখন, কবে ও কাকে জানাতে হবে

—আমি এখানে কাল পুরো দিনটাই আছি। পরশু ভোরে আমি অ্যাবোটাবাদ ফিরব। আপনি আমাকে কাল রাত্রি নটার মধ্যে আপনার সম্মতি জানিয়ে দেবেন।

—আমি রাজি না হলে আমি যে কাজ করে যাচ্ছি সে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে না ত?

—না তা হবে না তবে সি আই এ হেডকোয়ার্টার আপনাকেই চান। আপনি এই দায়িত্ব নিলে হেডকোয়ার্টার নিশ্চিন্ত হবে

—আচ্ছা কলকাতায় কি আপনাদের নিজস্ব কোনো এজেন্ট আছে?

—তা আছে

—অ্যামেরিকান? না ভারতীয়?

—অ্যামেরিকান যে এজেন্ট আছে তা সরাসরি আমাদের এজেন্ট। তাঁরা হয়ত অন্য চাকরী বা কাজ করছেন কিন্তু মূলতঃ তাঁরা সি আই এ-এর কাজই করে। আর ভারতীয় যারা আছে তারা আমাদের ঠিক এজেন্ট নয় তবে তাদের দিয়ে আমরা কিছু কাজ করিয়ে নিই, বিনিময়ে অর্থও দেওয়া হয়। তবে মজা হল যে কলকাতায় এবং পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমাদের এমন লোক আছে যে তারা জানেও না যে পরোক্ষভাবে তারা আমাদের কাজ করছে

—বলেন কি? এমন মূর্খও আছে?

—আছে বই কি। অথচ মজা হল এই যে তাদের আড়ালে তাদের পরিচিত বা অপরিচিত লোকেরা তাদের সি আই এ এজেন্ট বলে বেড়ায়

—বেশ মজা ত

ইতিমধ্যে ভেতর থেকে পানীয় আসে। দুজনে পানীয়র গেলাস তুলে নেয়।

সিদ্দিক প্রশ্ন করে বর্তমান কলকাতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারেন

—আপনি ত গত বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা গিয়েছিলেন। দু মাস ছিলেন এবং এই সুযোগে দার্জিলিং ও শান্তিনিকেতনে টেগোরের ইনস্টিটিউশন দেখে এসেছেন না?

সিদ্দিক ত অবাক। বিস্মিত কণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করে

—আপনারা এ খবরও রাখেন?

—রাখি বই কি। আপনার ওপর সি আই এ বেশ কিছুদিন থেকেই দৃষ্টি দিয়েছে

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে ডনোভান বলে:

—আমার কাছে যতদূর খবর আছে তাতে কলকাতার আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি তবুও আপনি এই কাগজগুলি রাখুন

—কাগজগুলি কি ?

—কলকাতা সম্বন্ধে সি আই এ আপনাকে যা জানাতে চান এবং মার্কিন সরকারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর আপনি এতে পাবেন। আপনি আজ রাত্রেই এগুলি পড়ে নেবেন

কাগজগুলি ডনোভান সিদ্দিকের হাতে দিয়ে তার ব্যাগে আরও কি খুঁজতে লাগল :

—হ্যাঁ এই যে, হিয়ার ইউ আর, এই নিন। কলকাতার আলিপুরে ন্যাশনাল আরকাইভসের ফটোগ্রাফ, বিল্ডিং এবং প্ল্যান। ওখানে কি কি মেটিরিয়েল আছে তার একটা মোটামুটি লিস্ট। কর্মীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং আরও কিছু তথ্য এতে পাবেন

—ঐ বাড়িতে আপনাদের কোনো লোক আছে নাকি ?

—একজন মাত্র আছে। বীরেন্দ্র সোনপাল। তার একখানা ফটোগ্রাফও আছে এই সঙ্গে, দেখে মনে হয় ছোকরা কিন্তু বয়স হয়েছে। বঙ্গের এক প্রভাবশালী রাজনীতিক নেতার রেকমেণ্ডেশনে ওর চাকরী কিন্তু ভারত সরকার জানে না যে সেই রাজনীতিক নেতা আমাদের লোক, তিনি আমাদের আতিথ্যে সারা অ্যামেরিকা বেড়িয়ে গেছেন। সোনপাল অ্যামেরিকায় তিন বছর লেখাপড়া করে গেছে। ধনীর সন্তান। তার বাবা ঐ রাজনীতিক নেতার বন্ধু। দুজনে একই ক্লাবের মেম্বার। একই রকম মদ খায় এবং একই রমণীর বাড়িতে দুজনে যায় তবে বীরেন্দ্র সোনপালকে আমরা এখনও কাজে লাগাইনি, সে ভার আপনার ওপর।

—বেশ আমি এই সব পড়ে দেখি এবং আমি ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় হাতে পাচ্ছি তার ভেতর বিবেচনা করে আপনাদের আমি

আমার মতামত জানিয়ে দেব। এক কাজ করুন, আপনি কাল রাত্রে আমার বাড়ি ডিনারে আসুন তখনই পাকা কথাবার্তা হবে

—তাই হবে কিন্তু একটা কথা মিঃ সিদ্দিক, আমি অ্যামেরিকান বলে কিন্তু অ্যামেরিকান খানার ব্যবস্থা করবেন না, আপনাদের দেশীয় খাবারেরই ব্যবস্থা করবেন, কাবাব আর নান রুটি যেন নিশ্চয় থাকে

—তাই থাকবে

পরদিন ডনোভান ঠিক রাত্রি আটটায় সিদ্দিকের বাড়ি ডিনারে এল। ইতিমধ্যে সিদ্দিক মনস্থির করে ফেলেছিল। হ্যাঁ, সে কলকাতা যাবে। কাঁহাতক আর বসে বসে প্রবন্ধ লেখা যায়। নতুন কাজটা নিয়ে দেখাই যাক না।

ডনোভান সন্তুষ্ট হল। তার ওপর ভার ছিল সিদ্দিককে রাজি করানো তা সে করেছে। সে কবে যেতে পারবে জানালে এখান থেকে করাচি হয়ে টেহেরান ও সেখান থেকে বম্বে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা ডনোভান করে দেবে।

বম্বেতে তাকে একটা ঠিকানা দেওয়া হবে। সেই ঠিকানায় থাকেন প্রফেসর দিবাকর রানে। নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে সিদ্দিক সেখানে যাবে সেই সময় প্রফেসর রানের বন্ধু এডমাণ্ড উইলসন আসবেন। এডমাণ্ড টাকা দেবে সিদ্দিককে এবং কিছু খবর থাকলে জানাবে

—টাকা নিয়ে কি রসিদ দিতে হবে? জিজ্ঞাসা করল সিদ্দিক

—না কোনো রসিদ নয়। কোথাও কিছু লেখাজোখা থাকবে না। সবই ভারবাল, তাহলে মিঃ সিদ্দিক আপনি অ্যাবোটাবাদ ছাড়বার ডেট কবে জানাবেন?

—কবে গেলে আপনাদের সুবিধে হবে?

—নট লেটার দ্যান থার্টিয়েথ অফ দিস মনথ্ কারণ হাতে বেশি সময় নেই

—ঠিক আছে মিঃ ডনোভান আমি আরলি নেক্সট উইক আপনাকে জানিয়ে দেব।

সিদ্দিক যখন বম্বে পৌঁছল তখন থেকে তার নাম সৈয়দ মনস্থর আলী। প্রফেসর রানের বাড়িতে এডমাণ্ড উইলসন এল। পরস্পরকে চেনবার জন্যে অর্থাৎ এরা দুজন যে আসল লোক সেটা জানাবার জন্যে রিডার্স ডাইজেস্টের একটি মলাটের প্রথম পৃষ্ঠার ছেঁড়া অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল সিদ্দিক অর্থাৎ মনস্থরকে আর বাকি অর্ধেক ছিল এডমাণ্ড উইলসনের কাছে। দুই ছেঁড়া খণ্ড মেলানো হল। দুজনে হ্যাণ্ডশেক করল। প্রফেসর রানে তাদের কিছু খাওয়ালেন। এডমাণ্ড উইলসন মনস্থরকে একশ টাকার নোটের পুরু পুরু বেশ কয়েকটা বাণ্ডিল দিলেন আর দিলেন বেশ কিছু ডলার।

তিনি বলে দিলেন কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে ডলারের চাহিদা খুব বেশি। তারা মোটা দামে ডলার কিনে নেয়। জরুরী অবস্থায় পড়লে সিদ্দিক ডলারগুলি ভাঙিয়ে নিতে পারে। ওগুলি রিজার্ভ ফাণ্ড।

সৈয়দ মনস্থর কলকাতায় চলে এল। মনস্থর প্রথমে একটা হোটেলে উঠল। চৌকস ছেলে মনস্থর। চেহারা ভাল। জনতার মধ্যেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানারকম গুণও আছে তার। সেই জন্য কলকাতার প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত এক আরমেনিয়ান ফারমে একটা বড় চাকরী যোগাড় করে নিতে তার পক্ষে অস্থবিধে হল না। যারা চাকরী দিলেন তাঁরা জানলেন যে বোম্বাই প্রবাসী খানদানী এক মুসলমান পরিবারের সন্তানকে তাঁরা চাকরী দিলেন।

রুবি যে ফ্ল্যাটে থাকত সেই ফ্ল্যাটবাড়ির টপ ফ্লোরে সে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিল। রুবির সেই বাচ্চা ঝি হাসিনার মা সালেহা তার রান্না করে দিত আর একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভৃত্য তার বাড়ির কাজকর্ম করত।

এই সালেহার মারফতই রুবির সঙ্গে তার আলাপ এবং সে আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে বিলম্ব হয় নি। রুবি যে মোরিকে বলেছিল সে একজন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আছে সেটা আংশিক সত্য। আবার মনসুর যখন শুনল যে ন্যাশানাল আরকাইভসের চিফ অফিসার জয়শংকর কাপুরের স্ত্রী অ্যামেরিকান এবং রুবির বন্ধু, তখন ত আর কথাই নেই, মেঘ না চাইতেই জল।

রুবি কিন্তু একদিনের জন্যও বুঝতে পারে নি যে মনসুর সি আই এ এজেন্ট। সে অজ্ঞাতে নানাভাবে মনসুরকে সাহায্য করে গেছে। রুবি ত মনের মতো একজন পুরুষ দেখলেই সবকিছু ভুলে যায় এবং রুবির মতো মেয়েদের সবকিছু ভোলাবার গুণ মনসুরের আছে, সুদর্শন, সুরসিক, বাকপটু, সহানুভূতিশীল, সব গুণেই মনসুর গুণান্বিত।

ইনসানের সঙ্গে আলাপ রুবিই করিয়ে দিয়েছিল। তবে ইনসানকে শিখিয়ে পড়িয়ে গড়েপিটে নিতে কিছু সময় লেগেছিল। স্থানীয় একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাড়া কাজ করা অসুবিধা তাই ইনসানকে কাজে লাগাতে হয়েছিল আর তৃতীয় ব্যক্তি ত আগে থাকতেই প্রায় ঠিক ছিল। সে হল বীরেন্দ্র সোনপাল। মনসুর আর লোক বাড়ায় নি। বাড়াবার দরকার হয়নি আর তাছাড়া বেশি লোক বাড়ালে বেশি গোলমাল।

ন্যাশনাল আরকাইভসের স্ট্রংরুম থেকে টি এস. জিরো ওয়ান চিহ্নিত টিথওয়াল সেকটরের ব্যাটল প্ল্যান চুরি করার সমস্ত চক্রান্তটা মনসুর একাই ঠিক করেছিল। এটুকু কৃতিত্ব তার।

কিন্তু হায় চুরি করেছিল ঠিকই তবে শেষরক্ষা হয়েছিল কি?

পুলিসের গাড়িতে চন্দননগর রেলস্টেশনে এসে জগদীশকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। পাঁচ মিনিট পরেই সে একটা

গ্যালপিং ট্রেন পেয়েছিল। মাঝে খালি শ্রীরামপুরে স্টপেজ তারপর হাওড়া।

জগদীশ খুব পরিশ্রান্ত। সকাল থেকেই তার ছোটাছুটি চলছে। ট্রেনে উঠে একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। হাওড়া স্টেশনে এসে যাত্রীরা নামবার গোলমালে তার ঘুম ভাঙল।

ট্যাকসির জন্যে দাঁড়াতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে একটা প্রাইভেট ট্যাকসি নিয়ে সোজা ছুটল বেহালা। বাড়িটার কিছু আগে সে প্রাইভেট ট্যাকসি ছেড়ে দিল।

সে মেরি কাপুরের জন্যে রীতিমতো চিন্তিত। কিন্তু মেরি কাপুরকে যে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা ত কেউ জানে না। তানবীরকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। তানবীর যদি চাপে পড়ে বলে দিয়ে থাকে?

বলে দিয়ে থাকলেও চারিদিকে ত সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে মেরি কাপুরকে অপহরণ করা শক্ত।

এখানে এসে অপহরণ না করতেও পারে। তানবীরকে দিয়ে হয়ত টেলিফোন করাল যে ব্যারির খুব বিপদ, আপনি এখনি চলে আসুন। তারপর মেরি কাপুর যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাকসির খোঁজ করবে তখন একটি ট্যাকসি মেরির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কোথায় যাবেন? মেরি কাপুরের তখন অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করবার সময় কোথায়? আর সেই গাড়িতে ওঠা মানেই ত ফাঁদে পা ফেলা।

অবশ্য জগদীশ যাবার আগে সিকিউরিটি গার্ডদের সাবধান করে দিয়েছিল যে মেমসায়েবকে তারা যেন বাইরে যেতে না দেয়। মেরি নিজে কি তা জানে? জেনেও কি বেরোবার চেষ্টা করবে? বেরোতে পারবে?

তবে কথা হচ্ছে যে মেরি অ্যামেরিকান। এখন তার স্বামী জীবিত নেই, স্বামীর প্রতি তার কোনো দায়দায়িত্বও নেই, স্বামীর

দেশের জন্যেও তার কোনো মায়ামমতা আর থাকতে পারে না। টিথওয়াল সেকটরের ব্যটল প্ল্যান সে নিজে চুরি করেছে, এ কথা ত মেরি স্বীকার করেছে।

সে অবশ্য মুখে বলেছে যে স্বামীকে বাঁচাবার জন্যেই এ কাজ করেছে কিন্তু সে কথা ত ঠিক না হতেও পারে। সে হয়ত বীরেনের সহযোগিতায় জেনেশুনেই চুরি করেছে। তাহলে?

সরকার বাহাদুর কি যে করেন? যার অ্যামেরিকান স্ত্রী তাকে অর্থাৎ জয়শংকর কাপুরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাবার যুক্তিটা কি? সরকারবাহাদুর হয়ত বলবেন যে এইসব কাজে দক্ষ অফিসারের সংখ্যা কম তাই অনেক সময়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই তাদের লোক নির্বাচন করতে হয়।

জগদীশ বাড়ির গেটে পৌঁছে গেল। তার মনে হল সবই ঠিক আছে, যেমন সে রেখে গিয়েছিল সবই সেই রকম আছে। সিকিউরিটি গার্ডরাও কেউ কিছু বলল না। জগদীশ আশ্বস্ত হল। তাহলে মেরি কাপুর এখনও আছে।

তবুও ওপরে উঠে সে প্রথমেই গেল মেরি কাপুরের ঘরে। একি! ঘরের দরজা খোলা। মেরি নেই। না, বাথরুমেও নেই। দোতলার কোথাও নেই। তাহলে কোথায় গেল?

চন্দননগরের অভিযানটা পুরো ব্যর্থ হয়েছে। মনমেজাজ খুবই খারাপ। শেষ রক্ষা দূরের কথা এখন বুঝি ভরাডুবি হয়।

জগদীশ নীচে নেমে এল। গার্ডদের কাউকে ডেকে পাঠাল না, তাদের কাছে গিয়ে একে একে জিজ্ঞাসা করল, তারা কাউকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখেছে কি না?

একজন ছাড়া সকলেই বলল তারা কাউকে বাইরে যেতে দেখে নি। শুধু একজন বলল যে, সে একজন ছোকরাকে বাইরে যেতে দেখেছে, ছোকরা ঠিক নয়, বালক, পরনে ডোরাকাটা পাজামা আর ডোরাকাটা শার্ট। সে কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল। গার্ড ভাবল যে

ছেলেটা কোন ফাঁকে বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, গাছপালা চুরির মতলব আছে বোধ হয়। তখন সন্ধ্যাবেলা। এই বাড়িতে ত কোনো বালক নেই? তাই সে কোনোরকম সন্দেহ না করে দূর থেকে দু'একটা হাঁক দিতেই সে সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

বালক? ডোরাকাটা পাজামা আর ডোরাকাটা শার্ট পরে বাগানে ঢুকেছিল গাছ চুরি করতে? গাছ চুরি করতে যে ছোকরা ঢুকবে সে কি ডোরাকাটা পাজামা আর শার্ট পরে ঢুকবে? হতে পারে না।

এ মেরি ছাড়া ত আর কেউ নয়। সে ত ডোরাকাটা পাজামা আর শার্ট পরেই থাকত। সেই পরেই চলে গেছে। কিন্তু সে একা গেল কোথায়? ফোন করে সে কাউকে খবর দেবে তাতেও অসুবিধে আছে। ফোন করা তার কাছে অসুবিধে ছিল না কিন্তু কোথায় আছে তাই ত সে জানে না। ফোন করে সে কাউকে এখানে আসতে বলবে তা ত হতে পারে না। যাকে আসতে বলবে তাকে ত ঠিকানা দিতে পারবে না।

তাহলে কি মেরির সঙ্গে সি আই এ-র সরাসরি যোগাযোগ আছে। তাদের চোখ সব দিকে। মেরিকে যে এই বাড়িতে আনা হয়েছে তা হয়ত তারা লক্ষ্য করেছিল।

তবে মেরি সন্ধ্যাবেলায় এখান থেকে চলে গেলে যেখানেই থাকুক এখনও হয়ত বেঁচে আছে। কারণ তানবীর যখন বীরেন্দ্রদের হাতে ধরা পড়েছে তখন ত মেরি এখান থেকে চলে গেছে।

তবুও একবার আলিপুরে ন্যাশানাল আরকাইভসে গুলজারা সিংকে ফোন করে দেখা যাক মেরি ওদিকে মানে তার কোয়ার্টারে গেছে কিনা। মেরি কোথাও সরে পড়লে তার ছেলেকে কিছু না জানিয়ে কি যাবে? ছেলে অবশ্য এখন নেই এখানে তবে তার ফেরবার সময় হয়েছে।

জগদীশ আর চিন্তা না করে আলিপুরে গুলজারা সিংকে ফোন· করল

---হ্যালো কে ? গুলজারা ? আমি জগদীশ চৌধুরী কথা বলছি

—জগদীশ ? গুড গড

—কেন কি হল ?

—আরে ম্যান আমি ত তাজ্জব

—আরে কি হল তাই বল না ? জগদীশ জোরে বলে

—আরে ভাই আমি সবে কোয়ার্টারে ফিরে কফি নিয়ে বসেছি আর একটা অরডারলি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল যে একটা ট্যাক্সি থেকে মেরিমেম নেমে নিজেব কোয়ার্টারের দিকে গেল। স্লিপিং পাজামা পরে মিসেস মেরি কোথা থেকে এল ? তখনি অরডারলিকে ধমকে তাড়িয়ে দিলাম। স্বপ্ন দেখছিস নাকি ? মেরিমেম অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল, খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল আর তুই বলছিস যে তিনি ফিরে এসেছেন ? কিন্তু অরডারলি যখন বলল যে সে মেরিমেমকে ঠিকই দেখেছে, তিনি তাঁর কোয়ার্টারে ঢুকলেন, কি ব্যাপার বলত চৌধুরী ?

—ঠিকই ত দেখেছে তোমার অরডারলি, মেরিমেম তার কোয়ার্টারে যাবে না ত কি তোমার কোয়ার্টারে যাবে ?

—তুমি ত আমাকে আরও তাজ্জব বানিয়ে দিলে, ব্যাপারটা খুলেই বল না কারণ এই একটু আগে আমি মিসেস কাপুরকে তাঁর কোয়ার্টারে ফোন করেছিলাম,

—তারপর ?

—তিনি বললেন হ্যাঁ, তিনি মারা যাননি, বেঁচেই আছেন

—হ্যাঁ, গুলজারা তিনি বেঁচেই আছেন, কোনো উদ্দেশ্যে অ্যাকসিডেন্ট সাজানো হয়েছিল। তোমাকে পরে বলব এখন....

ফোন নামিয়ে রেখে দু মিনিট পরে জগদীশ মেরি কাপুরকে ফোন করল

—আরে কি ব্যাপার মিসেস কাপুর আপনি এখান থেকে চলে গেলেন কেন? ভেরি ব্যাড

—এক্সকিউজ মি জগদীশ, মায়ের প্রাণ, আমার মনে হল ব্যারি যেন বাড়ি ফিরে এসেছে, আমাকে খুঁজছে, হয়ত কোথাও কাগজে পড়েছে বা শুনেছে আমার ঐ অ্যাকসিডেণ্টের কথা

—বুঝেছি, তাহলেও আপনি কি জানেন না যে আপনার বিপদের ভয় আছে, আমাকে না জানিয়ে এভাবে চলে যাওয়া ঠিক হয় নি।

—সরি জগদীশ

—ব্যাপার খুব সিরিয়স, আজ তিনটে খুন হয়েছে জানেন কি!

—না, জানিনা ত, কারা খুন হয়েছে?

মেরি কাপুরের মুখ শুকিয়ে গেল, সে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। আলিপুরে এসে পর্যন্ত কি সব কাণ্ড ঘটছে। তার নিজের ত সর্বনাশ হয়ে গেছে আর কার সর্বনাশ হল কে জানে।

জগদীশ জবাব দিল: প্রথম খুন রুবি

—অ্যাঁ? রুবি খুন হয়েছে! মেরি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাবে

—তারপর দরবারা সিং নামে একজন দারোয়ান, নরেন্দ্রপুরে যে বাড়িতে ইনসান থাকত সেই বাড়ির কেয়ারটেকার

—বেচারী, তাকে কে মারল? তার কি দোষ

—আর সব শেষে ইনসান

ইনসানও খুন হল?

হ্যাঁ, আর আমার অ্যাসিস্ট্যানটকে ধরে নিয়ে গেছে, জানি না সে এখনও বেঁচে আছে কিনা

—তাহলে কি বলতে চাও নেক্সট টার্গেট আমি?

—আমিও হতে পারি, জগদীশ হাসতে হাসতে বলল, যাই হক মিসেস কাপুর আপনি খুব সাবধানে থাকবেন, বাড়ির বাইরে কোথাও যাবেন না, কাউকে টেলিফোন করবেন না

—ব্যারিকে ?

—তার খবর পেয়েছেন ?

—ওরা কাল বিকেলে ফিরবে, হস্টেলে ফোন করেছিলাম কিন্তু আমার যে একা থাকতে ভয় করছে, কি যে করব

—ঠিক আছে, আলিপুরে কোয়ার্টারের ভেতর ভয় কিসের ? চারদিকে কড়া পাহাড়া রয়েছে ত, আমি লাইন ছাড়ছি

—জগদীশ রিসিভার নামিয়ে রেখে গুলজারা সিংকে ফোন করল

—হ্যাঁ, গুলজারা বলছি, ও জগদীশ ? আবার কি হল ?

—কিছু হয় নি, শোনো, মিসেস কাপুরের কোয়ার্টারে স্পেশাল ওয়াচের ব্যবস্থা কর, ইমিডিয়েটলি, লক্ষ্য রাখবে কেউ যেন ওর কোয়ার্টারে ঢুকতেও না পারে বেরোতেও না পারে। মিসেস কাপুরও যেন বেরোতে না পারে

—ঠিক আছে আমি এখনই ব্যবস্থা করছি

—আমি আরও একটা আশঙ্কা করছি

—কি আশঙ্কা

—বীরেন্দ্র সোনপালকে জান ত ?

—জানি বইকি ? তার কি হয়েছে ?

—তার এখনও কিছু হয় নি। আমার আশঙ্কা সে আজই রাত্রে গোপনে মিসেস কাপুরের লাইফের ওপর একটা অ্যাটেমপ্ট করতে পারে

—বল কি : :

—হ্যাঁ সে সব পরে শুনবে, আজই তিনটে মার্ডার হয়েছে এবং আমার অনুমান তিনটে মার্ডারই বীরেন্দ্র একা করেছে

—বীরেন্দ্রকে পেলে কি করব ?

—যেভাবে হক তাকে আটকে রাখবে

—রাইট ও কে, রাত্রে দরকার হলে আমাকে তুমি পাবে অ্যাডেলফি হোটেলে, ঠিক আছে ?

—ঠিক আছে, তাহলে যা বললাম মনে রেখো, মিসেস কাপুরকে তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেরোতে দেবে না আর বীরেন্দ্রকে পেলে ধরে রাখবে, কথাগুলি বলে জগদীশ লাইন কেটে দিল।

বেহালার এই বাড়িতে থাকার আর মানে হয় না। জগদীশ অ্যাডেলফিতে ফিরল। পুলিস কমিশনারের সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার, দেখা করা দরকার চন্দননগর থানার ও সি-এর সঙ্গে, রুবি আর দরবারা হত্যারও রিপোর্ট নিতে হবে। আজ আর কিছু করা যাচ্ছে না। সে ভীষণ ক্লান্ত।

জগদীশ গেল টেলিফোন করতে আর তানবীর অন্ধকারে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গাছের সর সর শব্দ, গঙ্গার জলের ছপ ছপ শব্দ, দূরে হয়ত মোটরের হর্ন কিংবা রেল এঞ্জিনের সিটির শব্দ। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠছে। মানুষের গলার আওয়াজ নেই, ভীষণ নির্জন। তানবীর শহরের ছেলে। এইরকম আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত নয়। তার গা ছম ছম করতে লাগল।

কিন্তু ঐ আওয়াজটা কিসের ? মানুষের আওয়াজ না ? আওয়াজ আসছে কোন দিক থেকে ? না, ওর মনের ভুল। টর্চ জ্বেলে চারদিকে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখল, কেউ কোথাও নেই। শুধু একটা শেয়াল পালিয়ে গেল।

তানবীর আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে বিরাট একটা চিড় খেয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল আর সেই আলোয় তানবীর দেখল সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে, হাতে কি যেন রয়েছে। ভাল দেখতে পেল না কিন্তু বাজটা পড়ার সঙ্গে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। বাজ কি তার মাথাতেই পড়ল নাকি ? তানবীর সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

ইনসানের লাস আগেই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছিল। গাড়িখানা

অবশ্য জগদীশদেরই। এবার তানবীরকে গাড়িতে তোলা হল। কিছু দূরে গাছের আড়ালে লুকানো ছিল বিরাট একটা ভ্যান। ভ্যানটা এসে গাড়ির সামনে থামল। পিছন দিকের এক-পাল্লার বিরাট দরজাটা আস্তে আস্তে নীচে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হল। দরজাটার ভেতর খাঁজ কাটা। সেটা ঠিক দরজা নয়। গাড়ির পিছন দিকের ঢাকা। তানবীরের হাত পা ও মুখ বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল। মৃত ইনসান ও তানবীরকে নিয়ে মোটরগাড়ি সেই বিরাট ভ্যানের ভেতর ঢুকে গেল। দরজা ওপর দিকে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। বাগান-বাড়ির একদিকের পাঁচিল ভেঙে সমভূমি হয়ে গিয়েছিল। সেই দিক দিয়ে ভ্যান বেরিয়ে গেল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে নানা ধরনের লরি, ট্রাক, ভ্যান যাওয়া আসা করে অতএব বিরাট এই ভ্যানটা দেখলেও কেউ বিশেষ কোনো মনোযোগ দিল না।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ভ্যান এসে উঠল বিবেকানন্দ ব্রিজের ওপর। সেখান থেকে ভ্যান এসে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরল। বরানগরে এসে একটা বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে ভ্যান থামল। ভ্যান চালাচ্ছিল রণবীর দুগল তার পাশে বসেছিল বীরেন্দ্র সোনপাল। এই বাড়িতে রণবীর থাকে। ভ্যানটাও কম্পাউণ্ডেই থাকে। পাড়ার লোকে জানে রণবীর দুগল একজন বিজনেসম্যান, বিশেষ ধরনের মাল বইবার জন্যে ঐ ভ্যানটা তার দরকার হয়।

দোতলার ফ্ল্যাটে রণবীর থাকে। তানবীরকে নিয়ে সেখানে তোলা হল। ইনসানের ডেডবডির কি হল তখন জানা গেল না। তানবীর ত কিছুই জানে না।

তানবীরের তখন জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তার সমস্ত বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য তার রিভলভার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার মাথায় খুব জোরে কিছু লাগে নি কিন্তু সে ভান করছিল মাথায় আচমকা আঘাত পাওয়ার জন্যে তার যেন শ্যক

লেগেছে যার ফলে সাময়িকভাবে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তার হাত ও পা সর্বদা কাঁপছে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রণবীর আর বীরেন্দ্র সোনপাল। বিশেষ এই চক্রান্তের মধ্যে রণবীর নেই, এ বিষয়ে সে কিছু জানেও না। সাময়িকভাবে তার সাহায্য চাওয়া হয়েছে মাত্র এবং তাও তার ঐ বিরাট ভ্যানটার জন্যে।

বীরেন্দ্র রণবীরকে বলল: তুমি তোমার রিভলভার তাক করে ছোকরাকে পাহারা দাও আমি তোমার পাশের ঘর থেকে মনসুরকে ফোন করে আসি তারপর দেখব ছোকরা কথা বলে কি না।

মনসুর নামটা তানবীর শুনে ফেলেছিল। সে আবার কে? মনে হচ্ছে কোনো ইম্পর্টান্ট লোক নইলে এত তাড়াতাড়ি তাকে ফোন করতে ছুটবে কেন? এই রণবীর লোকটাকে ত সে চৌরঙ্গি অঞ্চলে প্রায়ই দেখতে পায়। এর নাম রণবীর নাকি? চেহারা দেখে ত মনে হয় ইটালিয়ান। এটা কোন জায়গা?

ওদিকে তখন মনসুরের সঙ্গে বীরেন্দ্রর কথা হচ্ছে। বীরেন্দ্র বলছে: রুবির ফ্ল্যাটে কি পুলিস ইনকুয়ারি হয়ে গেছে?

—সে ত সকালেই হয়ে গেছে

—আর দরবারা সিং-এর কোনো খবর পেয়েছ?

—হ্যাঁ, ওখানেও ইনকুয়ারি হয়ে গেছে

—ঠিক আছে, চন্দননগরে নাম্বার থ্রি শেষ, এখন বাকি রইল নম্বর ফোর, আমি এখন সেখানে যাচ্ছি

—চন্দননগরেও ত পুলিস ইনকুয়ারি হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি তাহলে আজই এই রাত্রে আলিপুরে যাচ্ছ? মনসুর জিজ্ঞাসা করল

—তা নইলে আর কখন যাব? অদ্য রজনী, শেষ রজনী কিন্তু তুমি আর কতক্ষণ আছ?

—আমি এখনও আছি

—কিন্তু তুমি সাংঘাতিক রিস্ক নিচ্ছ মনসুর

—নো রিস্ক নো গেন, কিন্তু আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি যে অ্যাট মোমেন্টস নোটিস আই মে লিভ এমন কি তোমার ঐ জগদীশ যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠবে আমি ততক্ষণে অন্যদিক দিয়ে কেটে পড়ব। এখানে আমার কোনো মাল পত্তর নেই, সবই আমি অলরেডি ডেসপ্যাচ করে দিয়েছি

—জাল নোটগুলো

—ওগুলো? আমি চলে যাবার পর দিল্লিতে আর ডি শেঠির নামে একটা রেলওয়ে পার্সেল পৌঁছবে, অ্যাণ্ড হি উইল বি পেড বাই হিজ ওন কয়েনস, হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি কখন যাচ্ছ?

—আমি? আমি আলিপুরের কাজ শেষ করে ফিরে আসব। জগদীশের তল্পিদারকে ধরে এনেছি না, ওটার যাই হক একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত তারপর আর্লি মর্নিং আমি যাচ্ছি অ্যাণ্ড উই উইল মিট অ্যাট করাচি, সো লং

—গুড লাক

ক্লিক

ক্লিক

দুজনেই রিসিভার নামিয়ে রাখল

মেরি কাপুরের ঘুম আসছে না। কতক্ষণ আর শুয়ে থাকা যায়। সে উঠে পায়চারি করতে লাগল। পাখার স্পিড একটু কমিয়ে দিল। সুকুমারী কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কি সুখে আছে সুকুমারী!

টেলিফোন বেজে উঠল। এতরাত্রে আবার কে ফোন করে? নিশ্চয় জগদীশ নয়ত গুলজারা। জ্বালিয়ে মারল। কিছুক্ষণ আগে ঠিক যখন ঘুমটি এসেছে তখনি জগদীশ একবার ফোন করেছিল। তারপর খাটে শুতে না শুতেই গুলজারা। তারপর থেকে ওর আর

ঘুমই আসেনি। ওরা ওকে পেয়েছে কি? দাঁড়াও ত, এবার কড়া কথা শুনিয়ে দেব। মেরি সত্যিই রেগে গেছে। বেশ রাগত সুরেই সে জিজ্ঞাসা করল

—হ্যালো কে? এত রাত্রে বিরক্ত করছ কেন?

—কি তোমাদের বন্ধু আমাদের ধোঁকা দিতে পারল না ত? এটা অবশ্য ফিলিপেরই বোকামি

—কে? বীরেন্দ্র? এত রাত্রে কেন? আমাকে তোমরা একটু ঘুমোতেও দেবে না?

—তুমি ত জেগেই ছিলে দেখা যাচ্ছে

—হ্যাঁ, তোমাদের উৎপাতে। কি দরকার বল, তাড়াতাড়ি শেষ কর, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না

—তুমি একবার নীচে আসতে পারবে? আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, তুমি গাড়িতে উঠে আসবে

—কেন? এত রাত্তিরে কেন?

—আরে আমি ত আর তোমার বেডরুমে যাচ্ছি না, কিছু করছিও না শুধু একবার নীচে নেমে আসবে, তোমাকে একটা জিনিস দেব, মানে····

—বুঝেছি কিন্তু নীচে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব কারণ গুলজারা আজ বোধহয় স্পেশাল গার্ড বসিয়েছে

—তবুও চেষ্টা কর না, তুমি ত অনেক ছলাকলা জান, গার্ডদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারবে না।

—দেখি, তুমি কতক্ষণ পরে আসছ

—আমি কাছেই আছি। সে হাফ অ্যান আওয়ার

—আর আমি যদি নীচে নামতে না পারি?

—তাহলে আমিই যাব। তোমার ফ্ল্যাটের দরজায় তিনবার নক করব

—ভেতরে ঢুকতে পারবে?

—কি করে ঢুকতে হয় সে আমি জানি, ওনলি এ ফিউ কয়েনস উইল ডু দি ট্রিক, মাত্র কয়েকটা টাকা

—ঠিক আছে, তাই হবে। মেরি রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বীরেন্দ্র ফোন করে মারাত্মক ভুল করল: বীরেন্দ্র টেলিফোনে মেরির সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন তার প্রতিটি কথা শুনল গুলজারা সিং। বীরেন্দ্রর জানা উচিৎ ছিল যে আলিপুরের ঐ বাড়িটিতে টেলিফোন লাইন ট্যাপ করার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয় উভয় পক্ষের কথোপকোথন টেপরেকর্ড করেও রাখা যায়। যদি কেউ জেনে শুনে ফাঁদে পা দেয় তার জন্যে আর দায়ী কে হবে।

গুলজারা সমস্ত গার্ড সরিয়ে নিল যাতে বীরেন্দ্র বিনা বাধায় কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকতে পারে। সমস্ত গার্ড সরিয়ে নিল বললে ঠিক বলা হবে না। মেন গেটে যথারীতি দুজন রইল আর একজন রইল মেরির কোয়ার্টারের নীচের গেটে। তারা যেন সোনপাল সাহেবকে দেখে চিনতে পেরে ছেড়ে দেবে। একেবারে গার্ড না থাকলে বীরেন্দ্রর সন্দেহ হবে।

মেরির ফ্ল্যাটের দরজায় অপেক্ষা করবে দুজন সহকারী নিয়ে স্বয়ং গুলজারা।

ছোকরা কথা রেখেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাশনাল আরকাইভসের গেটে এসে হাজির।

রাত্রিবেলা গেট যথারীতি বন্ধ ছিল। গাড়িতে বীরেন্দ্রকে দেখে স্যালুট দিয়ে গার্ড গেট খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল

—এত রাত্রে সাব। জরুরী কাজ আছে বুঝি, কদিন আপনাকে দেখি নি যে?

—হ্যাঁ, জরুরী কাজ আছে, না, আমি কলকাতায় ছিলাম না। জরুরী কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। তুমি কিন্তু গেট লক কোরোনা, আমি এখনই আসছি।

কম্পাউণ্ডের ভেতরে একদিকে গাড়ি রেখে বীরেন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে জয়শংকর কাপুরের কোয়ার্টার যে বিল্ডিং-এ সেই বিল্ডিং-এর গেটের কাছে আসতেই একজন সিকিউরিটি গার্ড তার গতিরোধ করল। তাকে আগে থাকতেই এইরকম নির্দেশই দেওয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল

—কোথায় যাবেন স্যার

—ওপরে মিঃ কাপুরের ফ্ল্যাটে

—কিন্তু যাবার ত হুকুম নেই স্যার

—জানি, কিন্তু তুমি ত আমাকে চেন, জমাদার

—চিনি ত হুজুর, কিন্তু....

—কিন্তু আবার কি, আমি ত এখনই চলে আসব। শুধু মিসেস কাপুরকে জরুরী একটা কথা বলব, এই ত একটু আগে তাঁর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছিল

—তবুও স্যার....

বীরেন্দ্র পকেট থেকে নোট বার করবার জন্যে হাত ঢুকোল। গার্ড বুঝতে পেরে বলল: ওর দরকার হবে না স্যার তার চেয়ে আপনার কাছে যদি হাতিয়ার থাকে ত সেইটা আমার কাছে রেখে যান

বীরেন্দ্র ভাবল ক্ষতি কি? মেরিকে মারতে রিভলভার বা ছোরা-ছুরি কিছুই লাগবে না। শুধু হাতেই গলা টিপে তাকে মেরে ফেলবে কিংবা বিছানায় ফেলে বালিস দিয়ে মুখ চেপে ধরবে। সেইটেই ভাল তাহলে আর গলায় কালসিটের দাগ পড়বে না। সে গার্ডকে আর কিছু না বলে তার রিভলবারটি গার্ডের হাতে তুলে দিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে গুলজারার একজন লোক বীরেন্দ্রর গাড়ির ব্যাটারির কনেকসানটি খুলে রেখে দিল। বীরেন্দ্র যদিই পালিয়ে আসে তাহলে আর গাড়িতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে পারবে না।

—সাবধানে রেখ জমাদার আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি, বলে বীরেন্দ্র কোনো কিছু সন্দেহ না করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

গুলজারা সিং দুজন গার্ডকে নিয়ে দু ধাপ ওপরের সিঁড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ল্যাণ্ডিং-এ উঠে বীরেন্দ্র যেই দরজায় নক করতে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গুলজারা তার পিছনে এসে পড়ে তার ঘাড়ে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ঠিক মুহূর্ত আগে পায়ের আওয়াজ পেয়ে বীরেন্দ্র চমকে উঠেছিল। গুলজারার কণ্ঠস্বর শুনেই সে বুঝল খেলা শেষ। খুব ধূর্ত ত! গুলজারা বলল

—ডু নট মুভ মিঃ সোনপাল, সোনপাল নোড়োনা, আমাদের সঙ্গে চল। তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

—ঠিক আছে চল কিন্তু তোমরা আমাকে অন্যায়ভাবে আটকাচ্ছ।

—বেশ ত, ন্যায় কি অন্যায় সে সব তুমি কোর্ট মার্শালে তোমার বিচারের সময় বোলো, আমি শুধু ওপরওয়ালার আদেশ পালন করছি।

বীরেন্দ্র বুঝল এখন তর্ক করা নিরর্থক। কিন্তু মনসুরকে সাবধান করারও সময় পেল না। বীরেন্দ্র জানতে পারল না যে মনসুরও প্রায় সেই সময়েই পুলিসের হেফাজতে আটক পড়েছে।

হাসিনাকে জেরা করতে জানা গেল যে তার মা সালেহা তিনতলায় মনসুর সাহেবের বাড়িতে কাজ করে। কে মনসুর সাহেব? কি করে?

পুলিস তখনই খোঁজ নিতে আরম্ভ করল। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ওয়ারলেস ট্রানসমিশন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সন্ধ্যার সময় জানা গেল যে মনসুর সাহেব সন্দেহজনক ব্যক্তি। ইরানের

নাগরিক বলে পরিচিত এই ব্যক্তিটি যে-সব জায়গায়, যে ভাবে চলাফেরা করছিলেন তা সন্দেহের অতীত নয়। সাব্যস্ত হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তাঁকে থানায় আনা হক।

পুলিস যখন তার ফ্ল্যাটে ঢুকল মনসুর সাহেব তখন সরে পড়বার উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। ফ্ল্যাট সার্চ করে এমন কিছু কাগজপত্র পুলিসের হস্তগত হল যার বলে মনসুরকে পুলিস তখনই গ্রেফতার করল।

ওদিকে বরানগরে রণবীর ভুগলের বোকামিতে তানবীর পালিয়ে এল। বীরেন্দ্র ত ফোন করে কোথায় যেন চলে গেল। রণবীর তার রিভলভার নিয়ে তানবীরকে পাহারা দিতে লাগল।

পাঁচ মিনিট কাটবার পর তানবীরের যেন কথা ফুটল। অতি কষ্টে সে বলল :

—একটা সিগারেট

রণবীর বুঝতেই পারল না যে তানবীর একটা মতলব ভেঁজেছে।

—সিগারেট? ঠিক আছে দিচ্ছি

—থ্যাংক ইউ, কিন্তু আমার হাতটা একবার খুলে দাও যতক্ষণ না সিগারেটটা শেষ হয়

রণবীর ভাবল তার হাতে ত রিভলভার রয়েছে। ও ছোকরা কি আর করবে? বাঁধন খুলতে খুলতে তবুও বলল :

—খুলে দিচ্ছি কিন্তু খবরদার, কোনো চালাকি করেছ কি মরেছ

রণবীর তার বাঁধন খুলে দিয়ে তার হাতে একটা সিগারেট দিয়ে ও লাইটার দিতে দিতে বলল : সাবধান, নো ট্রিক।

তানবীর আরামে বসে সিগারেট টানছে। সে যেন সিগারেটটির জন্যেই সারাজীবন অপেক্ষা করছিল। সে হঠাৎ মাটিতে কি যেন একটা ফেলে দিল। রণবীর সেটা দেখতে গেল আর তানবীর

ত রেডি ছিল। সে চট করে উঠেই কি একটা প্যাঁচ মেরে রণবীরকে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার গলা টিপে ধরল এবং রণবীর যতক্ষণ না অজ্ঞান হল ততক্ষণ তাকে ছাড়ল না। তারপর উঠে রণবীরের হাত পা বেঁধে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল।

নীচে নেমে এল। কম্পাউণ্ডের একধারে একজন বৃদ্ধ বসে বসে কাসছিল। তার কাছেই শুনল জায়গাটা বরানগর, বি টি রোড।

সেই বিরাট ভ্যানটাও তার নজর এড়াল না। চ্যাঁচামেচি করে সে ভিড় জমাল না। কোনোরকমে সে থানায় পৌঁছে সংক্ষেপে কাহিনী বিবৃত করল। পুলিস এসে ভ্যান খুলল। ভেতর থেকে তানবীরের গাড়ি ও ইনসানের লাস বেরিয়ে পড়ল। আর রণবীর ত গ্রেফতার হয়েই ছিল। সেই রাত্রে সারা বরানগরে সে কি উত্তেজনা, তবুও লোকে বিরাট চক্রান্তের কিছুই জানে না।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বিরাট চক্রান্তের তিন প্রধান এবং এই তিনজনই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, এরা তিনজনই বলতে গেলে একরকম নিজেরাই ধরা দিল।

মেরি কাপুরকে একেবারেই নির্দোষ বলা চলে না। তার আত্মহত্যা করতে যাওয়ারও কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। একদিকে নিজের দেশ অপর দিকে স্বামী।

জয়শংকর কাপুরের হস্তাক্ষর নিপুণভাবে নকল করেছিল ইনসান ওমর কিন্তু মেরিকে দিয়ে ব্যাটল প্ল্যান চুরি করানোর মতলবটা মনস্থরের নিজের। সমস্ত প্ল্যানটার জনক মনস্থর আলী স্বয়ং।

সেদিন সেই স্ট্রংরুমের পাশে ফটো ল্যাবরেটরিতে টেলিফোন বাজার রহস্য হল যে টেলিফোন মোটেই বাজে নি। যা বেজেছিল তা হল ফটো প্রসেস করার ডার্করুমের ভেতরে। ডার্করুমম্যানকে সময় জানাবার জন্য অ্যালার্মক্লকের ঘণ্টা। ঘণ্টা শুনে বীরেন্দ্র

বাইরে চলে গেল যাতে সেই সুযোগে মেরি ব্যাটল প্ল্যান চুরি করতে পারে। এবং হলও তাই।

জয়শংকরকে মরতে হল কারণ জয় যখন ইনসানের নরেন্দ্রপুরের বাড়িতে গিয়েছিল তখন টেলিফোনে তার গলা চিনতে পেরেছিল। ইনসানের কাছে এই খবর শোনার পর জয়শংকরকে বাঁচিয়ে রাখা বীরেন্দ্রর পক্ষে নিরাপদ নয়।

তাই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হল চন্দননগরে এবং সেই পুরানো বাগান বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে তার লাস গঙ্গার ধারে ফেলে দেওয়া হল।

টাকাটা কিভাবে ইনসানদের দেওয়া হয়েছিল সেটা জগদীশকে বলা হয় নি, জগদীশও জানবার জন্যে চাপ দেয় নি, তবে ব্যাটল প্ল্যানের সীল না ভেঙে ওরা ফেরত দিল কেন ?

সীল ওরা ভেঙেছিল এবং সীল বা কৌটো যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় করে দেওয়া ও আবার ঠিকমতো সীল করে দেওয়া সি আই এ-এর মতো সংস্থার পক্ষে কিছুই নয়। কিন্তু কৌটোর ভেতর টিথওয়াল সেকটরের ব্যাটল প্ল্যান ছিল না। ছিল কারগিল সেকটরের ব্যাটল প্ল্যান যেটা সি আই এ নাকি আগেই জানত।

এ ভুল কি করে হল সেটা হয়ত জয়শংকরই বলতে পারত কিন্তু আজ আর তা জানা যাবে না। তার এই অকারণ মৃত্যু সত্যিই দুঃখজনক।